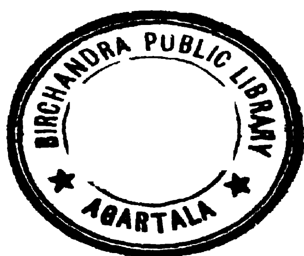
রবীন্দ্র মানস

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য



গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা-৬

পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা :
শ্রীপূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য

চতুর্থ সংস্করণ
শ্রাবণ—১৩৬৩

দুর্বোধ্য বিষয়ে অশেষ রুচিসম্পন্ন

মদীয় অগ্রজ

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্যকে

আমার শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ

এই দুঃসাহসিক উপন্যাস

দিলাম

পৃথ্বীশবাবুর

—অন্যান্য উপন্যাস—

পতঙ্গ (১ম)	২ ৫০
পতঙ্গ (২য়)	২·৫০
কারটুন	২·৫০
স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠগল্প	৪ ০০
দেহ ও দেহাতীত	৪·০০
মরা নদী	৫·০০
নিরুদ্দেশ	৪·০০
সোনার পুতুল	৩·৫০
ওরা কাজ করে	৫·০০
সাহিত্যিক	২·৫০
রূপসী নগরী	৫·২০
শিল্পী	৩·০০
পৃথিবীর প্রেম	৩ ০০
যৌবনের অভিশাপ	৩ ৫০
পতিতা ধরিত্রী	৩·০০

আদিত্যবাবু জমিদার। জমিদার বলিলে সবখানি বলা হয় না—মনে করা যাইতে পারে তিরিশলাখ টাকা ঋণগ্রস্ত একলাখ টাকা মুনাফার জমিদার, কিন্তু তাহা নহে। অক্ষত জমিদারীর আয় বার্ষিক দুইলক্ষ টাকা, তাহা ছাড়া কলিকাতার সম্পত্তির মাসিক আয় দশ হাজার—সুতরাং তিনি জমিদার।

জমিদার হইলেই তথা প্রাচুর্যের অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে নানারূপ ব্যাধি ও বাতিক বিলাসরূপে আসিয়া উপস্থিত হয়। আদিত্যবাবুরও বাতিকের অভাব নাই কিন্তু সাধারণ ভাবে পঞ্চ-ম'কার উপাসনাটা তাঁহার মনঃপুত নয়। তাঁহার বাতিকটা অন্যরূপ। হরেক রকম মানুষের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করাটা তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু।

তাঁহার বাড়ি, ঝি চাকর, দারোয়ান, সোফার, গাড়ি, বাগান, পালিত জীবজন্তু সকলের মাঝেই কিছু না কিছু অভিনবত্ব আছে। যে কেহ কোনরূপ নূতনত্ব দেখাইতে পারিত, সেই তাঁহার পরিবারভুক্ত হইয়া পড়িত। পশুপক্ষীগুলি অভিনব, যথা চড়ুই, শকুন, গাঙশালিক, সজারু, শৃগাল। চাকর বিভিন্ন দেশীয়, কেহ অতিকায়, কেহ ক্ষুদ্রকায়, কেহ তোতলা, কেহ খোঁড়া, কেহ বাতিকগ্রস্ত। ঝিগুলির কেহ নাকী সুরে কথা বয়, কেহ একাকী প্রতিপক্ষ ব্যতিরেকে ঝগড়া করিতে দক্ষ, কেহ কোন একটা বিশেষ শব্দ শুনিলেই ক্ষেপিয়া যায় ইত্যাদি। দারোয়ান একজনকে 'ঘটিমে রাধা কৃষ্ণ' বলিলে সদুগ্ধ ঘটিটা সে ফেলিয়া দেয়। অন্যকে সর্দারজি বলিলে তাহার দ্বারা অসাধ্য সাধন করাইয়া লওয়া যায়। এই বিচিত্র পরিবারের সর্বময় কর্তা আদিত্যবাবু পারিপার্শ্বিক বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়া আপন মনে হাসেন এবং পরম পরিতৃপ্তি বোধ করেন।

বৈকালে যাঁহারা তাস খেলিতে বা বেড়াইতে আসেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার, উকিল, কবিরাজ, ইনসিওরের দালাল, সবাক চিত্রের পরিচালক,

গায়ক, ইঞ্জিনিয়ার, ভবঘুরে, কবি, সাহিত্যিক, জ্যোতিষী প্রভৃতি সর্বশ্রেণীর লোক বর্তমান। সান্ধ্য আসরের খরচটাকে আদিত্যবাবু অত্যন্ত সদ্ব্যয় বলিয়া মনে করেন, কারণ এমন বিচিত্র সভ্য প্রায় দেখা যায় না। সেজন্য যাঁহার যেরূপ খাদ্য, পানীয় বা মৌতাত দরকার তাহা তিনি সযত্নে সংগ্রহ করেন। বিশেষ করিয়া এইজন্যেই দুই জন পৃথক চাকর আছে—তাহারা শিক্ষিত এবং ভদ্র বংশোদ্ভূত; কিন্তু সান্ধ্য সভায় একটি বিশেষ আইন আছে—কেহ কাহারও বৈশিষ্ট্য লইয়া তামাসা করিতে পারিবেন না এবং সেজন্যে যতদূর সম্ভব সহনশীলতা ও ধৈর্য সহকারে সংযত ভাবে চলিতে হইবে।

*

বিলাস বাদ দিলে সংসার তাঁহার ক্ষুদ্র।

স্ত্রী, একটি পুত্র ও একটি কন্যা। কন্যাটি বি, এ পড়ে, ছেলেটি আই, এ ক্লাশে আসা-যাওয়া করে। কন্যার নাম তপতী, পুত্রের নাম তপনকুমার। তাহারা স্বাধীন—আদিত্যবাবু তাহাদের ইচ্ছা ও ব্যয়কে কখনও সংযত করিতে চেষ্টা করেন না।

তপতী কলেজে রূপ ও লেখাপড়ার জন্যে বিখ্যাত। তপনকুমার অর্থ ও বন্ধুবাৎসল্যের জন্যে সর্বজনাদৃত। পড়াশুনা প্রভৃতি ব্যাপারে তাহার আগ্রহ না আছে এমন নয়, তবে অপাঠ্য পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে সে কোনরূপ রস পায় না, কাজেই সে ইচ্ছামত পড়াশুনা করে। তপতী একটা ফার্স্টক্লাশ অনার্সের জন্যে চেষ্টা করিতেছে—পড়াশুনাটা তাহার কাছে কেবল কর্তব্যই নয় তাহা যথেষ্ট লোভনীয়ও বটে।

*

যৌবনে আদিত্যবাবু একবার ব্যাঘ্র শিকার করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু কর্ম অকস্মাৎ কর্তারূপে তাঁহাকেই শিকার করিতে উদ্যত হয়। তখন রাইফেল সহ পলায়নপর আদিত্যবাবু একটা বাঁশের মোথায় বাধিয়া পড়িয়া যান। হাঁটুতে বিশেষ চোট লাগিয়াছিল, এখনও তিনি পা-টা একটু টানিয়া চলেন।

তপতী কলেজে যায় ট্রামে। ইচ্ছা করিলেই নিজের গাড়িতে যাইতে পারে কিন্তু সেটা তাহার পছন্দ নয়। দু'হাতে দু'টো সোনার সরু চুড়ি, কানে হালকা

দু'টি দুল এবং একখানি মোটা মিলের অতি সাধারণ শাড়ি পরিয়া সে কলেজে যায়। এই আত্মগোপন করাটার মাঝে সে বেশ আনন্দ পায়। তাহার অসামান্য দেহ-সৌষ্ঠব ও দরিদ্র বেশ কলেজের সহপাঠিগণের করুণা আকর্ষণ করে—সে মনে মনে বেশ একটা কৌতুক অনুভব করে। অবশ্য বাড়িতে তাহার বেশ ধনীকন্যার অনুরূপই।

কলেজ হইতে ফিরিবার পথে, ট্রাম স্টপের কাছে মাঝে মাঝে তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। অদূরে একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া একটি ছেলে নিত্যই বিড়ি খায়। তপতী ট্রামে উঠিয়া দেখে, ছেলেটা ট্রামের সঙ্গে সঙ্গে নেঙচাইয়া নেঙচাইয়া আসে, তার পরে পিছনে পড়িয়া যায়। ও কোনদিনও ট্রামে উঠে না। যাইবার সময় মাঝে মাঝে তাহাকে বহু দূরে পিছনে ফেলিয়া আসে। সে অনুমান করিয়া লয়—ছেলেটা নিশ্চয়ই এই দুই মাইল হাঁটিয়া কলেজ করে।

সেদিনও ছেলেটি দাঁড়াইয়া ছিল—অন্যদিনের মত নিশ্চেষ্ট ভাবে। তপতী জানে, সে তাহার সহপাঠী কিন্তু বি, এস, সি ক্লাশের। সে মনে মনে ভাবে—ও কেন এখানে এমনি দাঁড়াইয়া থাকে? তপতী কি যেন ভাবিয়া ছেলেটার সামনা সামনি হইয়া বলিল—আপনি দাঁড়িয়ে আছেন যে!

কাছে যাইয়া তপতী দেখিল ছেলেটির মুখে বসন্তের গভীর দাগ, চেহারাটা কুৎসিত। কালো, মুখের কোন ছাঁদ নাই, কাফ্রির মত মোটা চোয়াল, চীনার মত ক্ষুদ্র চোখ, ভাঁলের মত মোটা নাক। হঠাৎ যেন গায়ের মাঝে কেমন করিয়া উঠিল। তপতীর সহিত কোন ছেলের আলাপ নাই—তাহার চাল চলন এমনি যে কেহ আলাপ করিতেও সাহসী হয় নাই।

ছেলেটি বিস্ময়ে সহসা কিছু জবাব দিতে পারিল না। ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া সংক্ষেপে কেবল কহিল—এমনি।

—আপনার নামটা জানতে পারি?

—হরিচরণ দাস।

—এমনিই রোজ দাঁড়িয়ে থাকেন, না কোন কারণ আছে?

—কেন? আপনি বিরক্ত হন?

—বিরক্ত হলেও আপনাকে চল্‌তে বলার ত কোন উপায় নেই। তপতী অনাবশ্যক নৈকট্য প্রকাশ করিতে হাসিয়া ফেলিল।

হরিচরণ কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল—এ রকম প্রশ্ন করার কোন কারণ কিন্তু খুঁজে পাচ্ছি নে। অসম্ভব বলেও ত মনে করা যাচ্ছে না।

—নিশ্চয়ই নয়। আমার কৌতূহল হ'ল—সত্যিই কেন এখানে দাঁড়িয়ে থাকেন?

হরিচরণ তপতীর মুখের দিকে হিংস্র একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল—আপনাকে দেখবার জন্য ব'ললে আপনি খুশি হতেন সন্দেহ নেই কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য তা বলতে পারলাম না।

দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন করিবার পূর্বেই হরিচরণ চলিয়া গেল—ক্ষিপ্র এবং দীর্ঘ পদক্ষেপে রাস্তাটা পার হইয়া সে অন্য রাস্তা ধরিল।

তপতী হাসিতেছিল—ওই ছেলেটির ওই নিশ্চেষ্ট অপেক্ষা ও আঘাত করার প্রবৃত্তি যেন তাহার বেশ লাগিয়াছে! তপতী একটা নূতন কৌতুক পাইয়াছে মনে করিয়া বেশ হৃষ্টচিত্তে ট্রামে উঠিয়া বসিল।

পিছনে চাহিয়া দেখে একদল ছেলে বিস্মিত চোখে গমনশীল ট্রামের পানে চাহিয়া আছে। ওরা রোজই তাহার ট্রামে উঠিবার জন্য ভিড করে কিন্তু একটা আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাহারা যেন পিছাইয়া পড়িয়াছে, আজ আর এই ট্রামটা ধরিতে পারে নাই।

তপতী একটুও ক্ষুণ্ণ হইল না বরং মনে মনে কহিল—বেশ হইয়াছে।

*

আদিত্যবাবু লনে একখানা চেয়ার পাতিয়া নিবিষ্ট মনে কি যেন দেখিতেছিলেন। সজারুটাকে একটা বানরের কক্ষে ছাড়িয়া দিয়া তিনি নানারূপ পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন—বানরটা ভয় পাইয়া ছাতের একটা শিক ধরিয়া ঝুলিতেছে এবং সজারুটা কাঁটা খাড়া করিয়া ভীত ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। বানরের লেজ ঝুলিয়া সজারুর গায়ে লাগিলে সজারুর কাঁটাগুলি ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিতেছে।

পর্যবেক্ষণান্তে তিনি প্রসন্ন মনে ঘরে ফিরিতেছিলেন, অকস্মাৎ দেখেন তাঁহার বড় দারোয়ান রুদ্ধ নিশ্বাসে দৌড়াইয়া গিয়া দেউড়িতে খিল দিল। আদিত্যবাবু কারণ বুঝিলেন না, একটা দুর্দৈব অবশ্যই ঘটিয়াছে। যে রামসিং

বহু বাঘ শিকার করিয়াছে, তদুপরি যুদ্ধ-ফেরত সেপাহী এবং কুস্তিগীর, তাহার পলায়নের এমন কি ঘটিতে পারে?

আদিত্যবাবু তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন—ও রকম পালালে কেন?

—হাঁ হুজুর।

—কাহে ঐসান করতা!

রামসিং এদিক ওদিক ভীতভাবে চাহিয়া কহিল—আপ দেখিয়ে, কোন চিজ্ লে আয়া!

মোক্ষদা ঝি একটা আরসোলা হাতে করিয়া আসিয়া কহিল—ও মুখপোড়া বলে কি শুনেছেন? আমার গোবিন্দের ঘরে নাকি মুরগী ঢুকেছে—ওর গায়ে আমি আরসোলা দেবই দেব।

অত্যন্ত ক্ষুদ্রকায়া মোক্ষদা উদ্ধত হাতে আরসোলা দেখাইবা মাত্রই রামসিং চীৎকার করিয়া উঠিল—উঁহি—বাপ্!

কথা বলিবার কোনরূপ অবসর না দিয়া সে পুনরায় ছুটিয়া দেউড়ির ঘরে দরজা দিল।

—মোক্ষদা, এত থাকতে আরসোলা দিবি কেন ওর গায়ে?

মোক্ষদা মধ্যবয়সী হইলেও দেখিলে মনে হয় তাহার বয়স বাইশ। সে একটু হাসিযা কহিল—ও যে ভয়ঙ্কর ভয় পায়! জানেন না!

আদিত্যবাবু সংক্ষেপে কহিলেন—জানা রইল।

*

সান্ধ্য-আড্ডায় প্রথম আগন্তুক আসিলেন আজ ডাঃ বিশ্বাস। ইনি মনবিজ্ঞান-বিদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। আদিত্যবাবু অভ্যর্থনা করিলেন—আসুন ডাঃ বিশ্বাস। আপনার গবেষণা কতদূর এগিয়েছে?

—কিছুদূর। নতুন একটা জিনিস আবিষ্কার ক'রলাম—মানুষের এমোশান অর্থাৎ ভাবাবেগ বাড়বার একটা শেষ আছে। পঁচিশ বছরের পর সম্ভবত সেটি আর বাড়ে না, যেমন বুদ্ধি আর ষোলো বছরের পর বাড়ে না।

—তার মানে পঁচিশের পরে মানুষ আর ভালবাসে না?

—না। যদি না তার বুদ্ধি ব্যাহত হয়—অর্থাৎ যদি বুড়ো মানুষের মধ্যেও ছেলেমী মনটা রয়ে যায়।

রামসিংএর ব্যাপারটা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া আদিত্যবাবু প্রশ্ন করিলেন—এটা কি বলুন ত?

—নিঃজ্ঞান মনের ভয়। ও যুক্তি দিয়ে ওকে বুঝানো যায় না। আর ঐ ঝিটার হ'চ্ছে একটা প্রবৃত্তি যা আরসোলারূপে উড়ে রামসিংএর গায়ে পড়তে চাচ্ছে।

—বাপ্, এ যে একটা ঘোর রহস্য।

—হ্যাঁ, রহস্যই। আপনার মনটাকে যাঁরা জানে তারা এসব ক্ষেত্রে স্বাধীন, অর্থাৎ বাতিকগ্রস্ত নয়, অর্থাৎ মনোজগতে পঙ্গু নয়। এ কথা বলে রাখা ভাল, জগতে সবখানি insane লোকও যেমন নেই তেমনি সবখানি sane লোকও নেই।

সন্ধ্যার আড্ডা ধীরে ধীরে পূর্ণ হইয়া উঠিল। যাঁহারা আসিবার সকলেই আসিলেন। কাহারও চা, কাহারও সরবৎ, কাহারও হুঁকা, কাহারও সিগারেট সবই প্রস্তুত থাকে। এই আড্ডায় কয়েকজন মহিলাও মাঝে মাঝে আসিতেন—যেমন অধ্যাপিকা মিস্ বসু, মিস্ চক্রবর্তী, গায়িকা ও মহিলা সিনেমাশিল্পী মিস্ দাশ, মিস্ চন্দনা ইত্যাদি।

আলোচনা সেদিন বিবাহ সম্বন্ধে শুরু হইয়াছিল। অকস্মাৎ ডাঃ বিশ্বাস ইনসিওরের এজেন্ট মিঃ ঘোষকে কহিলেন—ঐ ব্যাগটি টেবিল থেকে একটু নামিয়ে রাখুন।

—কেন, থাক না ওখানে। অসুবিধে হচ্ছে?

—না কেমন যেন।

সিনেমা পরিচালক মিঃ লাহিড়ী কহিলেন—বর্তমানের মনীষিগণের মত হচ্ছে বিবাহ ব্যাপারে স্বাধীনতা থাকাটা একান্তই প্রয়োজন, তাছাড়া ইচ্ছামাত্র বিচ্ছেদের ব্যবস্থা থাকা দরকার। কারণ, শিশুকালে আমি যা চাইতাম, আজ তা চাই না, আজ যা চাই কাল তা চাইব না। সকলের যখন এই, তখন আজ যাকে ভালো লাগলো তাকে কাল ভাল না লাগাই স্বাভাবিক—এ ক্ষেত্রে মানুষ তার স্বভাব ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে গেলে সে দুঃখ পাবেই। স্বভাবের টুঁটি চেপে ধ'রেছে বলেই সমাজে আজ শান্তি নেই, সর্বত্র সংঘর্ষ চ'লেছে। বিবাহিত জীবন বিষময় হ'য়ে উঠেছে।

অধ্যাপক ডাঃ সেন বলিলেন—অর্থাৎ একটা স্বৈরাচার চলবে। মানুষের

মনটা যদি পরিবর্তনশীল হয়ই তবে খামকা বার বার বিবাহ না ক'রে একবার করলেই হয়। পরিবর্তন যখন হবেই তখন দুঃখ হবেই, সে ক্ষেত্রে একটা আর্থিক আর পারিবারিক সামঞ্জস্য বজায় রাখাটাই প্রয়োজন। বিশেষত বিচ্ছেদটা যদি সহজলভ্য হয় তবে মেয়েরা আর্থিকজগতে স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত লাঞ্ছিত হবেই। তাদের ফেলে পুরুষেরা পালিয়ে যাবে নতুনের সন্ধানে, ওরা পড়বে ফাঁকে।

ডাঃ বিশ্বাস বলিলেন—আর মন-বিজ্ঞানের মতেও মেয়েরা এক বিলাসী, পুরুষ বহু বিলাসী। বহু বিলাসের প্রশ্রয় দিলে সামাজিক স্থায়িত্ব থাকতে পারে না—তা হ'লে চলবে স্বেচ্ছাচার আর তার ফলে মেয়েরা নির্যাতিত হবে—মিঃ ঘোষ ব্যাগটা দয়া করে নামিয়ে রাখুন না।

মিঃ ঘোষ হাসিয়া, চুরুটে টান দিয়া কাত হইয়া চেয়ারে ভাল করিয়া বসিলেন। লাহিড়ী প্রতিবাদ করিলেন—আর্থিকজগতে মেয়েদের পঙ্গু করে রেখে, সমাজের স্থায়িত্ব চিন্তা ক'রতে গেলে, গৃহকারাগারে তাকে বন্দী ক'রতে হবে; কিন্তু স্বভাবকে স্বীকার করলে, তাদের আর্থিক স্বাধীনতা দেওয়া দরকার, তখন আর এই নির্যাতন চলবে না। তখনই হবে একমাত্র স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ সমাজ—

ডাঃ সেন হো হো করিয়া হাসিয়া কহিলেন—স্বাধীনতা কেউ কাউকে দিতে পারে! সেটা অর্জন করতে হয়। দেখুন না তাকিয়ে যে সব মেয়েরা চাকুরি করে, বিয়ে হ'লে তারা আর চাকুরি করতে রাজি হয় না—পরের ঘাড়ে বসে খাওয়াটা আর নির্যাতিত হওয়াটাই ওদের সবচেয়ে ভাল লাগে।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য বলিলেন—এদিকে হিন্দুবিবাহ প্রথাই সর্বোৎকৃষ্ট। সমাজব্যবস্থা এমনি সুন্দর যে নারীর সাহচর্য সে পায়ই না—বিবাহে রহস্যময় জগতের দুয়ার অকস্মাৎ খুলে যায়। ভালমন্দ সুন্দর অসুন্দর বিচার করবার, বাছাই করবার পূর্বেই সে এমনি জালে জড়িয়ে যায় যে ঐ লাহিড়ী মশায়ের পরিবর্তন আর হয় না। হরেক রকম জিনিস দেখলে তার পছন্দ চলে কিন্তু যেখানে বস্তু একটা সেখানে বাছাই চলে না, আর ভালটা কিনতে পারলুম না বলে মনে ক্ষোভও থাকে না।

দার্শনিক হালদার বলিলেন—থাকে। আমরা কি ভালবাসি কোন মানুষকে? না। মনে মনে আমরা মানসী সৃষ্টি ক'রে তার সন্ধান ক'রে ফিরি

জগতে। মনে হয় এই কলেজের মেয়েটার মাঝে বুঝি সে আছে, ওই অভিনেত্রীর মাঝে বুঝি আছে, কিন্তু পৃথিবীর মানুষের মাঝে কল্পনার সুদুর্লভ সে মনের মানুষ মেলে না, তখন পথপ্রান্তে তাকে ফেলে চলে যাই নতুনের সন্ধানে। মানুষ পৃথিবীর কিন্তু সে চায় অপার্থিবকে, কাজেই বারবার নানালোকের মাঝে তাকে চাইতে যাওয়াটা বিড়ম্বনা মাত্র। একবার বিফল হ'য়েই শিক্ষা পাওয়া উচিত—জগতের সকলেই তাই মনে মনে ব্যভিচারী—

মিস্ চন্দনা একটু হাসিয়া কহিলেন—আপনার কথা মেনে নিলেও মিঃ লাহিড়ীর কথা স্বীকার ক'রতে হয়। পরশপাথর খুঁজে বেড়ানই যদি স্বভাব হয় তবে একের মধ্যে সীমাবদ্ধ মানুষ থাকে কেমন করে? মানুষ তাই নানা ভূমিকায় অভিনয় ক'রবেই—তার স্বভাব সেটা—

ডাঃ বিশ্বাস পুনরায় বলিলেন—মিঃ ঘোষ ব্যাগটা নামিয়ে রাখুন দয়া করে।

আদিত্যবাবু রহস্য করিলেন—ওটা কি আরসোলার মত আপনার গায়ে গিয়ে পড়তে চাচ্ছে?

সাহিত্যিক মলয়বাবু বলিলেন—হালদারমশায় যা বলেছেন তা পুরুষের পক্ষে খাঁটি সত্য। তারা কল্পনাচারী গগনবিহারী কিন্তু মেয়েরা এই মাটির জীব। মাংসস্তূপ। সেখানে পৃথিবীর মেদ মাংস রক্ত ছাড়া কিছুই নেই। কাজেই পুরুষ যতদিন মেয়েমানুষকে বিয়ে করবে ততদিন তার শান্তি নেই, তৃপ্তি নেই। তার কল্পনার মানসীকে সে ত পাবেই না। বরং পুরুষের মাঝে ভালবাসার সেই গগনবিহারী মন আছে।

ডাঃ বিশ্বাস সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—উঠি, কিছু মনে কর'বেন না।

—বসুন, বসুন।

—না না, কাজ আছে। ডাঃ বিশ্বাস ছড়ি ফেলিয়া রাখিয়াই উর্দ্ধশ্বাসে প্রস্থান করিলেন।

অধ্যাপিকা বসু বলিলেন—আপনাদের মতে পুরুষ যদি কল্পনাচারী, বহুবিলাসী ও ব্যভিচারী হয় তবে ত পুরুষমানুষকে বিবাহ করা চলে না। কারণ, নির্যাতন তাঁরা ক'রবেনই। মর্ত্ত্যের মানুষের কাছে মর্ত্ত্যেরই মানুষ দরকার।

আদিত্যবাবু বলিলেন—আলোচনাটা গুরুতর আকার ধারণ ক'রেছে। সাহিত্যিক বলেন মেয়েমানুষ বিয়ে করা চলে না, আপনি বলেন পুরুষমানুষ বিয়ে করা যায় না। এক্ষেত্রে বিবাহটাই নিষিদ্ধ হ'য়ে দাঁড়ায়! পুরুষমানুষ যদি পুরুষকে এবং মেয়েরা যদি মেয়েকে বিবাহ করে তবে ত দুর্দৈব বলতে হবে। সে দুর্দিন বিলম্বিত হোক্।

ডাঃ সেন কহিলেন—এখানে একটা কথা স্মরণে রাখবেন মিস্ বসু। সকলেই আপনারা যদি বিয়ে না করেন তা হ'লেও দুর্ঘটনা নিবারিত হবে না।

চন্দনা কহিলেন—দুর্ঘটনা?

সাহিত্যিক বলিলেন—হ্যাঁ, অর্থাৎ দুঃখটা কম্‌বে না। মেঘদূত ছড়িয়ে যাবে সমস্ত পৃথিবীতে, ফল হবে উল্টো।

মিস বসু জবাব দিলেন—কিন্তু আপনারা যেমন ক'রে তাকান মনে হয় যেন গিলে খাবেন। ভয় হয়—বিয়ে করা আর হয় না।

কবি কহিলেন—আমার এমনি একটা শখ আছে। বেশ সুন্দরী একটি কুমারীর মাংসের কোর্মা কেমন লাগে সেটা একবার দেখতে ইচ্ছে হয়।

চন্দনা কহিলেন—আপনার ত সাংঘাতিক ইচ্ছে!

—আজ্ঞে হাঁ, ইচ্ছেটা অমনি সাংঘাতিক হয় না বলেই ত মিস্ বসু দুঃখ করেন। মিস্ বসু আপনার অ-সুন্দর মুখখানাকে আড়াল করিয়া রহস্য কহিলেন—যেমন ওঁদের হাড়ের ঘণ্ট ক'রে আমরা খাই না বলে ওঁরা দুঃখ করেন।

মিঃ লাহিড়ী বলিলেন—আজ্ঞে, ব্যাপারটি উল্টো, ঘণ্ট ক'রে খান বলেই, ছেলেরা ভয়ে বিয়ে করতে চায় না।

ডাঃ সেন বলিলেন—না, এই ধরুন আটটি সন্তানের পিতা আমি। হাড়ের ঘণ্ট গৃহে দিবারাত্রিই রান্না হচ্ছে, তার মধ্যেই পরম পরিতৃপ্তিসহকারে পড়ে আছি। হালদারমশায়ের সে মানসীর কথা ভাবতে ভুলে যাই।

হালদার বলিলেন—তা নয়, আপনি বুঝলেন না কথাটা। মানুষের চাওয়া ও পাওয়ার রীতি সর্বথা এক নয়। একজন একরকম ভাবে চায়, অন্যে চায় আর একরকম ভাবে, তাতে বাধে সংঘাত। এ সংঘাত চলেছে অনিবার্য ভাবে, অপ্রতিহত গতিতে, অবিরাম—তাই গৃহে সুখ নাই, ব্যভিচারে আনন্দ নাই।

দারিদ্র্যে আনন্দ নাই, স্বচ্ছলতায় আনন্দ নাই, শীতে আনন্দ নাই, গ্রীষ্মে আনন্দ নাই।

সাহিত্যিক বলিলেন—ডাঃ বিশ্বাস থাক্‌লে মন-বিজ্ঞানে কি বলে জানা যেত। তিনি এত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন—

আদিত্যবাবু একটু হাসিয়া ওই চামড়ার ব্যাগটি ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিলেন—ওটার জন্যে।

মিঃ ঘোষ জবাব দিলেন—কেন, এটা পিস্তল, রাইফেল বা বোমা নয়।

—তার চেয়েও বেশি। বাঘকে ভয় যারা করে না তারা আরসোলাকে ভয় করে, বোমার ভয় যারা করে না তারা ব্যাগের ভয় করে, আবার যারা ভিক্টোরিয়া ক্রশ পায় তারাও বিয়ে করতে ভয় পায়।

সাহিত্যিক টিপ্পনী কবিলেন—যেমন মিঃ লাহিড়ী। সিনেমাছবি পরিচালনা করতে ভয় পান না, কিন্তু বিয়ে করতে ভয় পান।

লাহিড়ী প্রতিবাদ করিলেন—ভয় পাই মানে ?

—ওই যাকে বলেন, ইচ্ছে হয় না, পছন্দ হয় না ; তাকেই বলে ভয়।

—ভয় নয়, বিবাহে যেখানে স্বাধীনতা নেই সেখানে বিবাহ করা মানে বঞ্চনা করা—আত্মপ্রবঞ্চনা। 'যাকে ভালবাসবো তাকে প্রবঞ্চনা করা আপনাদের সাজে কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই একনিষ্ঠতার মত আত্মপ্রত্যয় না হ'লে বিয়ে করা চলে না!

—আজ্ঞে সেটা ত আপনার মতে স্বভাব বিরুদ্ধ।

—সেই জন্যেই বিয়ে করাটাই স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ—ওটা করি নে।

ডাঃ সেন বলিলেন—করেন না, না হয় না ?

চন্দনা উষ্মা প্রকাশ করিয়া কহিলেন—হয় না! বাঙালীর ছেলের আবার বিয়ে হয় না! এটা ভয়ঙ্কর গালাগালির কথা। করেন না, আমরা অর্থাৎ যারা সত্যিকার ভালোবাসাকে বুঝতে শিখেছি তারা অর্থাৎ শিল্পীরা এ প্রবঞ্চনা করতে পারে না।

আদিত্যবাবু প্রতিবাদ করিলেন—কিন্তু সকলেই যদি এই আত্মপ্রবঞ্চনা না করেন তবে একশ' বছর পরে পৃথিবী যে জনহীন হয়ে যাবে!

সাহিত্যিক শেষ করিলেন—ওইটেই সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। কেউ প্রবঞ্চনা ক'রবেন না, অথচ জগৎ বঞ্চিত হয়ে ধ্বংস হবে।

আদিত্যবাবু বলিলেন—যে দিক দিয়েই যান, ধ্বংস যে পৃথিবী হবেই এ বিষয়ে বোধহয় আমরা সব একমত ?

মিস্ বসু কহিলেন—অবশ্যই। অবিচার ত চিরদিন চল্‌তে পারে না।

ডাঃ সেন টিপ্পনী করিলেন—মিস্ বসুর রাগটা পৃথিবীর উপর না পুরুষ-মানুষের উপর ?

আদিত্যবাবু প্রতিবাদ করিলেন—ওটা ব্যক্তিগত। ও প্রশ্ন চল্‌বে না—নাকচ।

*

সকালের চা খাবার প্রভৃতি তপতী নিজে হাতেই তাহার বাবাকে খাওয়াইত। আদিত্যবাবু কাগজ পড়িতে পড়িতে শিক্ষিতা কন্যার সহিত আলোচনা করিতেন। তাহার পর নায়েব গোমস্তা প্রভৃতির সহিত জমিদারীর কার্য করিতেন।

তপতী চা ঢালিতেছিল। আদিত্যবাবু কাগজ পড়িতে পড়িতে হঠাৎ উঠিয়া বসিলেন—চশমাটাকে নামাইয়া বলিলেন—তপু, এইটে পড়ে দেখ।

তপতী বিজ্ঞাপনটি পড়িল এবং হাসিয়া কহিল—পাগল আর কি !

আদিত্যবাবু চা পান করিতে করিতে কহিলেন—না না না—সত্যিকার মানুষ, এর সাহসকে প্রশংসা করি। যা খুঁজছি এতদিনে তাই মিলেছে। ত্যাখো বিজ্ঞাপনটি—

বিজ্ঞাপনটা এইরূপ—

জনৈক শিক্ষিত ভদ্রলোক কোন অর্থবান ব্যক্তির গৃহে খাওয়া পরা ও মাসিক পনরটাকা হাতখরচের পরিবর্তে থাকিতে ইচ্ছুক; কিন্তু ইহার বিনিময়ে তিনি কোনরূপ কাজ করিতে পারিবেন না অধিকন্তু তাঁহার ব্যক্তি স্বাধীনতাকে কোনমতেই ব্যাহত করা চলিবে না। বহু জমিদার নানা ভাবে অর্থের অপচয় করেন—এই ভদ্রলোককে রাখিয়া এবং আনুষঙ্গিক অপচয় করিয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়া যাঁহাদের ধারণা তাঁহারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিতে পারেন। অর্থের কিছু প্রতিদান দেওয়া হইবে কিন্তু তাহা স্বেচ্ছাধীন। দেখা হইবে না, পত্রের উত্তর দেওয়া হইবে। বিঃ বিঃ নং ১৭৪৫ ইত্যাদি—

তপতী হাসিয়া কহিল—যে টাকা খরচ ক'রবে সেই উপকৃত বোধ করবে !

—হ্যাঁ, যেমন ধর হাকিম কি দারোগা ঘুস নিলে আমরা উপকৃত বোধ করি। মনে হয় লোকটি বিশেষ গুণী। এঁকে আনতেই হবে, কেমন?

তপতী জানিত পিতাকে কোনমতেই বাধা দেওয়া চলিবে না তাই বলিল—আনো, মন্দ হবে না; কিন্তু থাক্‌বেন কোথা?

—যেখানে খুশি, যত ঘর আছে। তাঁর যেখানে খুশি সেইখানেই থাক্‌বেন। দেখি নিশ্চিন্ত আলস্যেই বা একটা লোক কেমন ক'রে কাটায়।

—কিন্তু লোকটা যদি মাতাল হয়?

—পনর টাকায় তা খাওয়া চলে না, আর খেলেই বা ক্ষতি কি!

—যদি দুশ্চরিত্র হয?

—হোক, ভয় কি।

—যদি চোর ডাকাত হয়?

—হোক্, একদিন চুরি করে আমাকে ফতুর ক'রতে পারবে না।

—তুমি তাহ'লে তাঁকে আনবেই?

—হ্যাঁ। আজই পত্র লিখছি।

তপতী কলেজ হইতে আসিতেছিল। হরিচরণ ঠিক স্থানটিতে তেমনি দাঁড়াইয়া বিড়ি খাইতেছে। খোঁড়া পাখানির উপরই ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

একজন সহপাঠী তাহার নিজের মোটর চালাইয়া কলেজে আসে। কোথাকার কোন জমিদারের বংশধর। চেহারাটা তাহার সুন্দর—টক্‌টকে বর্ণ, কোঁকড়া চুল, সিগারেট ও একটা ফরাসী সুগন্ধ একসঙ্গে তাহার অস্তিত্বকে বিজ্ঞাপিত করে। ছেলেটি কুমারবাবু নামে খ্যাত। তপতী লক্ষ্য করিয়াছে, যে যখন ফিরিয়া আসে তখন সে হঠাৎ পিছন হইতে তিন চারিটা ইলেকট্রিক হর্ন এক সঙ্গে বাজাইয়া তাহাকে সচকিত করিয়া দেয়। তপতী মনে মনে তাহার এই স্পর্ধা ও হ্যাঙলামীকে নিন্দা করে। তথাকথিত কুমারবাবু তেমনি করিয়া চলিয়া গেল—তপতী ফিরিয়াও চাহিল না।

সে ট্রামে উঠিয়া নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়া পড়িল; কিন্তু আজ একটি নূতন ঘটনা তাহাকে খুশি করিল। হরিচরণ ট্রামে উঠিয়াছে।

ট্রামে স্থান ছিল না। সে দাঁড়াইয়াই যাইতেছিল, কেবল একটিমাত্র সিট খালি, সেটা তপতীর পাশে। তপতী হরিচরণের বিমর্ষ মুখের পানে চাহিয়া কহিল—বসুন না এখানে হরিচরণবাবু।

হরিচরণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল—অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করাকে আমি ভীরুতা মনে করি।

—মেয়েদের অনুরোধকে প্রত্যাখ্যান করা?

—পৌরুষ বলে মনে করি।

—মেয়েদের অপমান করা?

—প্রয়োজন বলে মনে করি।

—সহযাত্রী হওয়া?

—দুর্দৈব।

—দাঁড়িয়ে যাওয়া?

—অবিচার।

তপতী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল—আপনার অনার্স অঙ্কে?

—না, ফিজিওলজিতে।

—বড়লোকের সঙ্গে বন্ধুত্বটাকে কি মনে করেন?

—ঘৃণা করি।

—গরীবকে উপেক্ষা করাকে?

—আভিজাত্য মনে করি।

তপতী আবার হাসিয়া উঠিল, হরিচরণ হিংস্র দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে ক্ষণিক তাকাইয়া থাকিয়া নামিবার দরজার দিকে অগ্রসর হইল। তপতী পিছন ফিরিয়া দেখিল, চল্‌তি ট্রাম হইতে খোঁড়া পা লইয়াও সে নির্বিঘ্নে লাফাইয়া নামিয়া পড়িয়াছে। তপতী মনে মনে তাহার এই শারীরিক ক্ষমতাকে তারিফ্ করিয়া প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

হরিচরণের পাশে আর একটি ছেলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যাইতেছিল—সে আশা করিয়াছিল তপতী হয় ত তাহাকেও বসিতে বলিবে কিন্তু তপতী তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

ছেলেটি একটু সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল—যদি কিছু মনে না করেন—

—না, এখানে বসতে পাবেন না।

তপতীর সামনের সিটে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন, তিনি ঘাড় ফিরাইয়া একটু ব্যঙ্গ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কড়া চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে হাসিয়া পাশের ভদ্রলোককে যেন কি বলিলেন।

তপতী হাত দিয়া এবং ফুঁ দিয়া ধোঁয়াটাকে অপসৃত করিতে করিতে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বাহিরে চাহিল।

সে ভ্যানিটি ব্যাগ ব্যবহার করিত না, রুমাল হইতে কয়েকটি পয়সা কণ্ডাক্টরের হাতে ফেলিয়া দিয়া, টিকিটের জন্যে বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া অস্থানেই নামিয়া পড়িল। সে ভাবিতেছিল—

হরিচরণ নামিয়া গেল কেন?

*

সেদিনও সান্ধ্য আড্ডা বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। আজ আলোচনা এখনও কোনো প্রসঙ্গ অবলম্বন করে নাই, অনির্দিষ্টভাবে কথাবার্তা হইতেছিল। আদিত্যবাবু কহিলেন—আপনারা শুনে বোধ হয় সুখী হবেন—আমি একটি ভদ্রলোককে বাড়িতে আশ্রয় দিচ্ছি—বিজ্ঞাপনটা শুনুন। আদিত্যবাবু বিজ্ঞাপনটা পড়িয়া শুনাইলেন।

ঔষধের ডাক্তার মিঃ দত্ত একটি ভৃত্যকে কহিলেন—দরজাটা খুলে দাও হে।

ডাঃ বিশ্বাস বলিলেন—না না, বড্ড ঠাণ্ডা আস্‌বে।

—আসুক, দরজা খোলা থাকা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল।

—কিন্তু ঠাণ্ডা—

আদিত্যবাবু বলিলেন—অর্ধেক বন্ধ কর—আচ্ছা ডাঃ বিশ্বাস বলুন ত এ লোকটি কেমন হতে পারে, এই যে বিজ্ঞাপন শুন্‌লেন—

ডাঃ বিশ্বাস কিছু ভাবিয়া বলিলেন—বোধ হয় eccentric অর্থাৎ বাতিকগ্রস্ত লোক। বেশিদিন থাক্‌বে না—

ডাঃ সেন বলিলেন—কবি-টবি বা শিল্পী হবে। নিশ্চিন্তে সাধনা ক'রতে চায়।

চন্দনা কহিল—চোর ডাকাতও হ'তে পারে।

দেশকর্মী অক্ষয়বাবু বলিলেন—হয় ত পুলিশের গুপ্তচর। এই আড্ডাটার খবর ভাল ক'রে নিতে চায়।

মিঃ লাহিড়ী বলিলেন—রোমাঞ্চকর উপন্যাসে এমন দেখা যায়। ডাকাত বা এমনি কিছু। যাই হোক এমনি লোককে আশ্রয় দেওয়া নিরাপদ নয়।

আদিত্যবাবু হাসিয়া কহিলেন—মহাত্মা পুরুষের দর্শন ত নিরাপদে হয় না।

ডাঃ হালদার মাথার উপরে হাতটা ঘসিয়া লইয়া বলিলেন—হয় ত তান্ত্রিক বা কোন বিশেষ মার্গের সাধক। ভগবত ভক্তও হ'তে পারেন।

ডাঃ বিশ্বাস বলিলেন—একটা কথা লক্ষ্য করবেন। যিনি তাকে খেতে পরতে দেবেন উপকৃতটা তিনিই হচ্ছেন কিন্তু। যে লোকটা এতবড় ধৃষ্ট সে ভগবত ভক্ত হ'তেই পারে না।

ডাঃ সেন বলিলেন—কিন্তু স্বেচ্ছাকৃত কিছু উপকার হয় ত করতেও পারেন ওটা লক্ষ্য করবেন—হয়ত দেবদত্তের মত।

আদিত্যবাবু কহিলেন—হ্যাঁ, দেখুন, এর অর্থ হচ্ছে তিনি কি প্রতিদান দেবেন তা বল্‌তে চান না। সংগোপনে দেবেন—এটা মহত্ব—

মিঃ লাহিড়ী বলিলেন—কিন্তু আপনার অর্থের এমন অপচয় যেমন অন্যায় হবে তেমনি তার পক্ষেও আয়াসে বসে বসে খাওয়াটা অন্যায় হবে। যে লোক নিরঙ্কুশচিত্তে এমনি পরের ঘাড় ভাঙতে চায় সে কখনই মনুষ্য পদবাচ্য নয়। এরাই প্রকৃত শোষক, পরগাছার মত শোষণ করতে চায়—শ্রমের মূল্য বোঝে না।

মিঃ ঘোষ ব্যাগটা টেবিলের উপর রাখিয়া কহিলেন—সংসারে এমনি পরগাছা অনেক আছে। এই ধরুন আপনারা এত টাকা রোজগার করেন কিন্তু যা দিয়ে করেন সেটার কোন প্রয়োজন নেই। আর আমরা বিধবা ও অপগণ্ড শিশুদের রক্ষাকল্পে দিবারাত্রি ঘুরছি, সমাজের কল্যাণে জীবনপাত করছি। সঞ্চয়ের সাহায্য করে স্বামীহীন পুত্রহীন অসহায়দের রক্ষা করছি—এটা জীবিকা হলেও এর কল্যাণশক্তি অমোঘ, কিন্তু সিনেমায়? কিছুই নেই—

চন্দনা কহিল—আপনি সিনেমা দেখেন না?

ডাঃ বিশ্বাস বলিলেন—না, আপনাদের দেখেন। মিঃ লাহিড়ী কি ইনসিওর করেছেন?

—না। করবার প্রয়োজন ত নেই। আমরা বর্তমানকে বিশ্বাস করি, অতীতকে স্মরণ করে অনুশোচনা করি না, ভবিষ্যতের ভয়ে পূর্বেই মরি না। আমাদের কল্যাণ তাই আমাদের হাতের মধ্যে। তার জন্যে মিঃ ঘোষের শরণাপন্ন হতে হয় না।

সাহিত্যিক মলয়বাবু কহিলেন—কিন্তু ঐ ভদ্রলোক তা হলে কি রকম সেটা কি ঠিক হ'ল? ঐ বিজ্ঞাপনদাতা ভদ্রলোক, উনি যে খারাপ লোক এ বিষয়ে তা হলে আর সন্দেহ নেই।

ডাঃ বিশ্বাস বলিলেন—ব্যাগটা নামিয়ে রাখুন মিঃ ঘোষ।

মিঃ দত্ত উঠিয়া গিয়া দরজাটা খুলিয়া দিয়া আসিলেন। মিঃ ঘোষ কহিলেন—ব্যাগটা থাক না এখানে? অসুবিধে—

ডাঃ বিশ্বাস নিজেই দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিয়া বসিলেন। ডাঃ সেন বলিলেন—হ্যাঁ ওই লোকটির সম্বন্ধে—

আদিত্যবাবু বলিলেন—থাক্ এলেই দেখা যাবে। কেমন?

সাহিত্যিক বলিলেন—আর যাই করুন, বাড়ির ভিতরে আশ্রয় দেবেন না, আর ঘড়ি-আংটি এগুলো সাবধানে রাখবেন। মেয়েদের গহনা-টহনা গুলো—

ডাঃ হালদার একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন—অমন হয়, যাঁরা সাধু তাঁদের আপন-পর ভেদাভেদ থাকে না। সুখ-দুঃখ বিভেদ থাকে না, তাঁরা নিজের ব'লে পরেরটা নিতে পারেন তবে সেটা চুরি নয়—সেটা ভুলও নয়। মনটা ওঁদের থাকে পৃথিবীর থেকে বহু উপরে—যেমন সেদিন দেখলুম, আমাদের ডাঃ সাহা চশমা হাতে করে নিয়ে চশমা খুঁজে হয়রান হচ্ছেন—

ডাঃ দত্ত পুনরায় দরজা খুলিয়া দিয়া আসিয়া বলিলেন—আপনার কতবার পকেট মার গেছে ডাঃ হালদার?

—আমার? না, তবে মাঝে মাঝে টাকা হারায় বটে।

সাহিত্যিক বলিলেন—এত লোকের মাঝে ওকথাটা বলে ভাল করলেন না। রাষ্ট্র হয়ে গেলে প্রায়ই হারাতে পারে।

অক্ষয়বাবু বলিলেন—না হে মলয় তা নয়। দেশটা ঠিক অমনি নেই। আজ দেশের মাঝে জাগরণ এসেছে, শিক্ষা এসেছে, ত্যাগ এসেছে। পকেটমারাটা কমেছে।

আদিত্যবাবু কটাক্ষ করিলেন—কেউ কেউ বলেন বেড়েছে। নানা ফন্দি-

ডাঃ বিশ্বাস বলিলেন—বড্ড ঠাণ্ডা লাগছে, উঠি। তিনি উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেলেন।

মিঃ লাহিড়ী বলিলেন—হ্যাঁ দিনটা যেন জানতে পারি।

—অবশ্যই জানবেন। ঘড়ি আংটিগুলো বাড়ি রেখে আসবেন যাতে—

—বলা বাহুল্য মাত্র।

*

তপনকুমার নিজে গাড়ি হাঁকাইয়া কলেজে যায়। আদিত্যবাবুর মতই দীর্ঘ বলবান তাহার দেহ, নিয়মিত শরীর-চর্চায় পৌরুষব্যঞ্জক একটা চেহারা। কলেজে সে প্রফেশর হইতে দারোয়ান মহল পর্যন্ত সর্বত্রই আদৃত।

সেদিন কলেজ যাইবার জন্য দোতলা হইতে নামিবার সময় দেখে, তাহার বাবা তাহার মাকে লক্ষ্য করিয়া কি যেন একটা ব্যঙ্গ করিয়াছেন, তাহার মাতা অত্যন্ত লজ্জিত এবং বিমর্ষমুখে কি যেন একটা জবাব দিতে যাইতেছিলেন, পুত্রকে দেখিয়া থামিয়া গেলেন। কথাটা তাহার কানে আসিয়াছিল—বাবা মাঝে মাঝে তাহার মাতার শীর্ণ ক্ষুদ্র দেহকে ব্যঙ্গ করিয়া লিলিপুট বলিতেন এবং তাহার মাতা তাহার এই অনিচ্ছাকৃত দৈহিক ক্ষুদ্রতার জন্যে লজ্জিত হইয়া নানারূপ দুঃখপ্রকাশ করিতেন।

বাবা বলিলেন—লিলিপুট! আমার কাছে দাঁড়ালে তোমাকে ঝি-চাকরানীর মত দেখায়। একটু স্টাইলে থাকবে, জমিদারগিন্নীর মত মেজাজ থাকবে তা নয় একটা বেড়াল—কাঠ-বেড়াল।

মাতা অনুশোচনায় বিমর্ষ সুরে কহিলেন—একটা বিরাট মেয়ে বিয়ে করে ঘর ভরে রাখো। বেশ জমিদারী করবে, আমাকে না হয় বিদায় দাও।

কথাটা কেবলমাত্র রহস্যই নয়, স্বরে যথেষ্ট বেদনা ছিল তাহা তপনকুমার বুঝিয়াছিল। দৈহিক এই অসৌষ্ঠবের জন্যে বিবাহের পর হইতে তাহাকে বহু লাঞ্ছনা ও বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইয়াছে।

তপন মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়াছিল—তাহার মাতাকে এই বিদ্রূপ করাটা সে পছন্দ করিত না এবং অকারণ একটি লোকের চেহারাকে ব্যঙ্গ করিয়া তাহার

।বা যে পরিতৃপ্তি পাইতেন এটা তাহার কাছে বড় রকমের একটা নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার বলিয়া বোধ হইত।

আদিত্যবাবু ডাকিলেন—তপন।

তপন বিরক্তির সঙ্গে জবাব দিল—কলেজে যাচ্ছি।

—তা হোক্, শুনে যাও।

তপন খাতা বই সহ ঘরের মাঝে যাইয়া দাঁড়াইল। আদিত্যবাবু কহিলেন—আমি ডাক্‌লে অমন বিরক্ত হ'স্ কেনো বল্ ত?

তপন সংক্ষেপে কহিল—বিরক্ত হই বুঝলে কেমন ক'রে?

—ওটা মানুষ বুঝতে পারে। আমি বাড়ির ভিতর আস্‌লে তোর দেখাই মেলে না, কোথায় থাকিস্, কি করিস্। পড়াশুনো কচ্ছিস ত?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা যা কলেজে, বেলা হয়ে যাবে। তপন সঙ্গে সঙ্গে পরিত্রাণ পাইয়াছে এমনি দ্রুততার সহিত বাহির হইয়া আসিল।

আদিত্যবাবু বলিলেন—দেখলে, তোমার ছেলের কাণ্ড। যাও ব'ল্‌লে এমন ভাবে গেল যেন বাঘের সাম্‌নে থেকে পালাচ্ছে।

—তুমি ত আর ওদের দিকে তাকাবার অবসর পাও না। যত বানর আর বাদুড় এই নিয়ে কাটাও।

আদিত্যবাবু কহিলেন—তবে কি তোমার মত এতটুকু একটু টুনটুনি সাম্‌নে ক'রে বসে থাক্‌বো?

*

কলেজের সাম্‌নে একটা রেস্তোঁরা ছিল। ক্লাশের পরে বন্ধুবান্ধবসহ সেখানে খাওয়া তপনের একটা দৈনন্দিন কার্য। সেদিন তাহার মনটা অকারণেই যেন উত্যক্ত হইয়াছিল। সকলকে এড়াইয়া কেবলমাত্র একটি বন্ধু লইয়া সে দোকানে ঢুকিল। বন্ধুটির নাম শৈলেন বসু, অতি ক্ষুদ্র এবং শীর্ণ চেহারা। চোখে মুখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও একটা নারী সুলভ কমনীয়তা। দুইজনে খাইয়া যাইতেছিল—তপন কোন কথা কহে নাই।

শৈলেন বলিল—কি হে তপন এত চুপচাপ যে!

—মনটা ভাল নেই।

—কলেজ করার পরে অমন হয়। ওই যে ওঁরা বেরিয়েছেন—

দাখকাব বলিষ্ঠ চেহারার একটি মহিলা ছাত্রী ও তৎসহ তপনের মাঙাব মত ক্ষুদ্রকায়া আর একটি ছাত্রী রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছিল।

শৈলেন ব্যঙ্গ করিল—পিঁপড়েয় যেন ভাত টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

—তার মানে ?

—মণিকার সঙ্গে রেণুকায় দেখলে অমনি মনে হয়।

তপন তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল—হ্যাঁ, মণিকা ত মনুষ্যপদবাচ্যই নয়, ক্ষুদ্র একটু প্রাণী। টিপ দিলে গলে যায়। হ্যাঁ, রেণুকার মধ্যে রানী দুর্গাবতী অহল্যা-বাঈএর মত একটা তেজ ও শক্তি আছে—বিয়ে ক'রতে হ'লে অমনি মেয়ে বিয়ে করতে হয়। ওর সগর্ব পদক্ষেপ আর একটা দম্ভ ও স্পর্ধা আমার বেশ লাগে।

—বাপ্ স্টিমরোলার! তোমার ভয় না করতে পারে কিন্তু ওকে দেখলে ত্রাসে আমার সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে। বাপ্ মেয়েমানুষ অতবড় আর প্রকাণ্ড হয় এটা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

তপন গম্ভীরভাবে চা পান করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আড্ডাটাকে হঠকারিতার সঙ্গে সংক্ষেপ করিয়া দিয়া বাড়ি আসিল। অন্যান্য দিন মোক্ষদা ঝি চা-জলখাবার দিত আজ সারদা আসিয়াছে।

চা'য় একটু মুখ দিয়াই তপন রাগিয়া উঠিল—এত বড় একটা শরীর তোমার, কোন কাজ করতে পারো না! চা কি ছাই ক'রেছ· যাও মোক্ষদাকে পাঠিয়ে দাও।

সারদা বাহির হইয়া গেল। বিড় বিড় করিয়া ঝগড়া করিতে করিতে কহিল—বাবুর ত আমার হাতের চা না হ'লে খাওয়াই হয় না। মোক্ষদা মুখপুড়ী তুক্-তাক্ ক'রেছে নইলে দাদাবাবু এমন কথা বলতে পারে···ইত্যাদি।

মোক্ষদা আসিয়া দাঁড়াইল। তপন উষ্মা সহকারে কহিল—দিবারাত্রি বাড়িতে থেকে তোমাদের ত হুকুম করি নে। সকাল বিকেল একটু চা দিতে হয়, তাও কি পারো না ? না পারো ত ব'লো—এমন বুড়ো ত নয়, বয়স ত কুড়িও হয় নি এরই মধ্যে দোতলায় উঠতে কষ্ট হয় ?

—আজ্ঞে না। আমি রোজই দেব, আজ ও ইচ্ছে করে আনলে কিনা—

মোক্ষদা তাহার বয়সের এই প্রসঙ্গ ও দাদাবাবুর অভিমান মিশ্রিত কথা কয়েক-

টায় বিশেষ খুশি হইয়াছিল। সে হাসিয়া পুনরায় কহিল—আপনি রাগ করবেন জানলে দিবা-রাত্রি আপনার দোর গোড়ায় বসে থাকতে পারি।

—অত কাজ নেই। দয়া করে চাটা দিয়ে গেলেই খুশি।

মোক্ষদা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

*

আজ রবিবার।

বিজ্ঞাপনদাতা ভদ্রলোকের আজ আসিবার কথা। তপতী সকালে চা ঢালিতে ঢালিতে প্রশ্ন করিল—বাবা, আজ ত তাঁর আসবার কথা, নয়?

—হ্যাঁ, দশটায় আসবেন লিখেছেন।

তপতী চা পান করিতে করিতে কহিল—আর যাই হোক তিনি যে অদ্ভুত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, নইলে বিজ্ঞাপন দিয়ে এমন আতিথ্য গ্রহণ করার ইচ্ছা—

আদিত্যবাবু হাসিয়া ব'লিলেন—অদ্ভুত ব'ললে গালাগালি দেওয়া হয়। তাঁকে বরং অসাধারণ বলা যায়। আপনার খরচ চালাবার মত ক্ষমতার অভাব আছে বলে তিনি আশ্রয় নিশ্চয় নিতে চান নি। নিশ্চয়ই এমন কোন কাজ আছে—উদ্দেশ্য আছে যার জন্যে তিনি এমনি একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় খুঁজছেন।

তপনকুমারের কানেও কথাটা না গিয়াছিল এমন নয়। সে আসিয়া প্রশ্ন করিল—তোমার সে অতিথি কখন্ আস্‌বেন? মা ত আগে থেকেই ভেবে সারা, কি জানি কেমন লোক—

তপনের মাতাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন—সে ভদ্রলোক কি রকম খান—আমিষ না নিরামিষ সে সমস্ত কিছু লিখেছেন? তার একটা ব্যবস্থা করা ত দরকার, শেষে অযত্ন হ'তে পারে।

আদিত্যবাবু হাসিয়া বলিলেন—আমি যা কিছু ডেকে আনি তাতেই ত তোমার বিরক্তি; কিন্তু এর বেলা এমন আগ্রহ, অবাক করলে? তোমার সাথে জানা শোনা আছে নাকি?

তপনের মা একটু বিমর্ষ হাসি হাসিয়া কহিলেন—তোমার শেয়াল শকুন বানরের ঝক্কি যদি এত সহ্য ক'রতে পেরে থাকি তবে এটা আর এমন বেশি কি? মানুষ ত! খাওয়ালেও পুণ্য।



—যাক্, নিশ্চিন্ত হ'লাম।

আদিত্যবাবুর কথার মাঝে একটা শ্লেষ লক্ষ্য করিয়া তপন মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সে কহিল— মা কথা বললেই অমন চটো কেন তুমি?

আদিত্যবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া কহিলেন—শেষে ছেলের শাসনাধীনে থাকতে হবে? তোর মা বটে কিন্তু আমার সঙ্গেও একটু সম্পর্ক না আছে এমন ত নয়!

তপনের মা হাসিয়া বলিলেন—গুরুজনের সঙ্গে অমনি ক'রে কথা বলে বুঝি! তুই কি দিন দিন ছোট হচ্ছিস্?

তপন মনে মনে অসন্তুষ্ট হইল। তাহার মা বাবার এত শ্লেষ ব্যঙ্গকে কেন সহ্য করিবেন? অন্যে প্রতিবাদ করিলেও তাহার সহ্য হয় না। দুর্জ্ঞেয় তাহার মাতার হৃদয়।

তপতী হাতের ঘড়ি দেখাইয়া বলিল—দশটা ত বাজে বাবা। পাঁচ মিনিট আছে—

—বাঙালীর দশটা মানে বারোটা নাগাদ আসবেন।

অকস্মাৎ একখানা লরি তাঁহার গেটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তপন, তপতী ও আদিত্যবাবু গেটের নিকটে উপস্থিত হইলেন। একটি দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ শীর্ণকায় লোক লরির সম্মুখ হইতে নামিয়া প্রশ্ন করিল—এইটেই আদিত্যবাবুর বাড়ি?

—হ্যাঁ। আসুন—আপনিই মানবেন্দ্রবাবু?

—হ্যাঁ।

লরির পিছনটা দুই একটা বাক্স ও অনেকগুলি বই খাতাপত্র ও খবরের কাগজে বোঝাই। সেগুলি তাড়াতাড়িতে বাঁধা নাই, ইঁট শুরকির মত স্তূপাকার করিয়া লইয়া আসা হইয়াছে।

মানবেন্দ্র কহিল—আমার ঘরটা দেখিয়ে দিন।

আদিত্যবাবু কহিলেন—ঘরটা আপনার পছন্দে ঠিক হবে। চলুন যে ঘর খুশি—

মানবেন্দ্র ইঙ্গিতে একতলার কোণের ঘরটা দেখাইয়া দিয়া কহিল—ঐটে হলেই হবে। জিনিসপত্র সব তুলে দিতে বলি।

—হ্যাঁ। সে ব্যবস্থা আমিই ক'রছি। এই আমার ছেলে তপন আই, এ পড়ে, আমার মেয়ে তপতী বি, এ পড়ে। চলুন—

মানবেন্দ্র তপন ও তপতীর মুখের দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া কহিল—চলুন ঘর-দোর আমিই গুছিয়ে নেব। তার জন্যে চাকর দরকার নেই।

—সেটা কি—

মানবেন্দ্র হাসিয়া বলিল—ব্যক্তি স্বাধীনতায় বাধা দিতে পারবেন না, পূর্বেই—

—আচ্ছা থাক—আপনার যেমন ইচ্ছা—

—হ্যাঁ, আর একটা কথা। আমার খাবারটা ঘরেই পাঠিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করবেন। খাদ্যের বাদ বিচার কিছু নেই, যা হয় পাঠালেই চলবে। জাতি বিচারও অনাবশ্যক বোধে করি নে, অতএব চাকর কি যে কেউ দিয়ে আসলেই হবে।

তপতী কহিল—আচ্ছা সে ব্যবস্থা হবে।

—হবে? না আপনি ক'রবেন? হওয়াটা ভাববাচ্য—ভাববাচ্যের বাক্য সর্বদাই দূরত্ব জ্ঞাপন করে।

তপতী হাসিয়া কহিল—ক'রবো।

—হ্যাঁ, ক'রবেন। মানবেন্দ্র হাসিয়া উঠিয়া আদিত্যবাবুকে কহিল—আমার ঘরে যখন তখন কেউ যায় এটা আমি পছন্দ করি নে। দরজা দেওয়া থাকলে অন্তত কেউ যেন কড়া না নাড়ে, এমনি একটা আদেশ প্রচারিত করে দেবেন।

তপন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল—তাহাদেরই আশ্রিত হইয়া আসিয়া লোকটি যে এমনি নির্লজ্জের মত হুকুম চালাইতেছে তাহার মধ্যে এতটুকু সঙ্কোচ নাই। হঠাৎ সেই যেন বাড়ির মালিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মানবেন্দ্র হাসিয়া তপনকে কহিল—রাগ হ'চ্ছে হুকুম চালানো দেখে? কিন্তু পূর্বেই জানানো আছে উপকৃত আমি হব না, হবেন তোমার বাবা। অর্থাৎ আমার উপস্থিতি দ্বারা তাঁকে কৃতার্থ ক'রবো।

মানবেন্দ্র তপনের কাঁধের উপরে হাত রাখিয়া হাসিয়া উঠিল, যেন সে তপনকে মুহূর্তে বুঝিয়া ফেলিয়া আপনার করিয়া লইয়াছে।

তপতী কহিল—চলুন, ঘরটা দেখবেন। খাট পালঙ্ক চেয়ার টেবিল কি কি দরকার দেখে নেবেন ত?

—হ্যাঁ, চলুন, দুটো টেবিল, দু'খানা চেয়ার, একটা খাট হ'লেই চ'লবে।

—সে ত আছেই। সোফা কি, ইজিচেয়ার—

—প্রয়োজন নেই। দরকার হ'লে হুকুম ক'রবো—তবে চেয়ার টেবিলের ফরমাস্ করার এক্তিয়ার নেই—কারণ ওটা সম্বন্ধে কোন শর্ত নেই।

*

ডাঃ দত্ত অল্প কয়েকদিন হইল বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার বিবাহের একটু ইতিহাস আছে। বাপ মা'য়ের অমতে নিজে ইচ্ছা করিয়া তিনি তাঁহার এক বন্ধুপত্নীর ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বন্ধুর ওখানেই ভাবী পত্নীর সহিত পরিচয় হয়, এবং তখন অন্তত তাঁহার মনে হইয়াছিল এই নারীটি ব্যতীত তাঁহার জীবন চলিবে না।

আজ সবেমাত্র তাঁহার নব পরিণীতা বধু তাঁহার কলিকাতার বাসায় আসিয়া গৃহস্থালী শুরু করিয়াছেন। মলিনার সাহত পরিচয় তাঁহার ছিল কিন্তু নানা দুর্যোগের মধ্যে বিবাহ হওয়ায় বধু মলিনার সহিত ভাল করিয়া পরিচয় হয় নাই। মিঃ দত্ত বিবাহের পূর্বে বলিতেন—এমনি ধীর, শান্ত ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মেয়ে তিনি আর কখনও দেখেন নাই। ধৈর্য, সহনশীলতা ও ত্যাগের প্রতীক।

রাত্রির আহারান্তে দত্ত একটা সিগারেট টানিতে টানিতে সিঁড়ির মাঝে মলিনার পদশব্দের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন এবং মনে মনে এতদিনের সঞ্চিত আশা ও আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হইতে যাইতেছে মনে করিয়া পরম আনন্দ বোধ করিতেছিলেন।

নীচের টুকটাক্ শব্দ শেষ হইয়া গেল। মলিনা যথারীতি পদশব্দ করিয়া দত্তের ঘরে ঢুকিল। দত্ত অভিযোগ করিলেন—বাবা, এত কি কাজ! রাত্রি যে দুপুর হ'য়ে গেল।

মলিনা হাসিয়া কহিল—বাসাটা ত আঁস্তাকুড় ক'রে রেখেছিলে, সেটাকে ভদ্রস্থ ক'রতে হবে ত। কাজ ত না সেরেই চলে এলাম।

—ধন্যবাদ। সংসার থেকে সংসারের মালিকের উপর বেশি দরদ থাকাটাই ধর্ম বুদ্ধি। সংসারে মাথা দিয়ে তার কর্তাটিকে হত্যা ক'রো না।

মলিনা আবার হাসিয়া কহিল—বাবা! একঘণ্টাও ত দেরি হয় নি।

শয়ন ঘর ঠিক করিয়া মলিনা দরজায় খিল দিল।

দত্ত চীৎকার করিয়া কহিলেন—কর কি! কর কি! খোলো খোলো!

মলিনা হন্তদন্ত হইয়া দরজা খুলিয়া দিল। কহিল—দরজা দেবো না, তবে এখানে শোবো কি ক'রে?

—অমনি থাক।

—না, দরজা না দিলে আমার বড্ড ভয় করে। তা হ'লে আমার ঘুমই হবে না।

দত্ত দরজাটা ভাল করিয়া খুলিয়া দিয়া কহিলেন—দরজা দিলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। চল, খোলা থাক্‌লে ক্ষতি ত নেই।

—না, সে হবে না। ঠাকুর চাকর আছে ওরা কি ভাববে। দরজা খোলা থাক্‌লে আমি কিছুতেই থাকতে পারবো না।

—কিচ্ছু ভেবো না। ওপরে আস্‌বে কেন? কথাটা বলিতে বলিতে দত্ত আলো নিভাইয়া দিয়া বলিলেন—চল।

মলিনা ভীত কণ্ঠে কহিল—দরজা দাও, দরজা দাও, তোমার পায়ে পড়ি। ওই যে কি যেন, কত কি—দাও দাও—

দত্ত আলো জ্বালাইয়া দেখেন মলিনা ভয়ে কাঁপিতেছে, রক্তাভ ওষ্ঠ দুইখানি নীল হইয়া গিয়াছে, মুখ ফেকাশে হইয়া উঠিয়াছে। দত্ত রাগিয়া উঠিয়া কহিলেন—কিন্তু দরজা খোলা রাখতেই হবে। তোমার এত জিদ্—

—না না না, তা হ'লে আমি ওই ঘরেই যাই- সে দ্বিরুক্তি না করিয়া পাশের ঘরে যাইয়া খিল দিল। যেন অশরীরী কি একটা হিংস্রতা তাহার পিছু পিছু তাড়া করিয়া আসিয়াছে।

দত্ত ক্রোধে ক্ষোভে ক্ষণিক দাঁড়াইয়া থাকিয়া শুইয়া পড়িলেন, কিন্তু ঘুম আসিল না। একটা মানসিক প্রদাহ তাঁহাকে ক্রমশ উত্তেজিত করিয়া তুলিল—এই মলিনার জন্য তিনি পিতামাতা, আত্মীয় বন্ধু সকলকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। সে আজ দরজা দিয়া রাখিবার অছিলায় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেল। এত প্রেম, এত ভালবাসা, তাঁহার এত মোহ সব নিমেষে উবিয়া গেল—এই মলিনাই তাঁহার অদর্শনে কত অনুযোগ করিয়াছে—পিতা বিবাহে মত দেন নাই বলিয়া অশ্রুপাত করিয়াছে। লাঞ্ছনায়, ক্রোধে, ক্ষোভে, দুঃখে দত্ত উৎসারিত অশ্রুধারা নিবারণ করিতে বালিশটা চোখের পাতার সহিত চাপিয়া ধরিলেন।

নির্জন বাড়িখানির নিবিড় অন্ধকারের মাঝে দত্ত ও মলিনাকে বিচ্ছিন্ন

করিয়া খোলা দরজাটা যেন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। খোলা দরজাটাই প্রাচীর হইতে বেশি দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিয়াছে যেন।

পরদিন সারাদিন উপবাস ও সমস্ত কলিকাতা অকারণ প্রদক্ষিণ করিয়া দত্ত সন্ধ্যার প্রাক্কালে আদিত্যবাবুর আড্ডায় আসিয়া যোগদান করিলেন। অন্যান্য দিনের মত আড্ডা আজিও সরগরম।

সেদিনকার প্রসঙ্গ ছিল বাঙালী মেয়ের বৈশিষ্ট্য।

মিঃ লাহিড়ী কহিলেন—বাঙালী ঘরের মেয়েদের মত ছিঁচকাঁদুনে ভীরু এবং অপদার্থ মেয়ে বোধ হয় জগতে সুদুর্লভ। অন্যান্য দেশে মেয়েরা আজ হাতিয়ার ধ'রে যুদ্ধ ক'রছে, পুরুষের সঙ্গে সমানে রাষ্ট্রের কাজে লেগে গেছে। মেয়ে হবে জোয়ান ডি আর্কের মত, রানী দুর্গাবতীর মত। তা নয় এ যেন জীবন্ত একটা লগেজ, যাকে কোথায়ও রেখে বিশ্বাস নেই চুরি যেতে পারে—দুর্বহ বোঝার মত কাঁধে ঝুলে থাকে।

সাহিত্যিক কথাটার ধুয়া ধরিয়া কহিলেন—হাঁ। আজকাল বাসে-ট্রামে তাদের জন্যে আলাদা সিট—দেখি মেম সাহেবরাও যাচ্ছে, এরাও যাচ্ছে। এরা যেন ভেঙে পড়ে। মুখ ভয়ে শুকিয়েই আছে। একা একা যাওয়ার সাহস নেই—এম, এ-ই হোক আর পি, আর, এস-ই হোক সঙ্গে একটা বাহন তার চাইই।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য বলিলেন—আজ্ঞে সেদিন শুনলাম, কোন কলেজের মেয়ে নাকি একটি পুরুষ পুঙ্গবকে চটি জুতো দিয়ে অঙ্গ সেবা ক'রেছে।

ডাঃ দত্ত হাসিতে চেষ্টা করিয়া কহিলেন—ওরকম কাজে ওদের হাত আছে। উপকারীর অপকার করা, স্বামীকে অপদস্থ করা, তাকে শোষণ ক'রে নিজের খেয়াল ও ব্যসনবৃত্তিকে চরিতার্থ করা এইটে হ'য়েছে এখনকার শিক্ষার মূলমন্ত্র। স্নেহ, ভালবাসা, মমতা, সেবা এগুলো আজ ঐতিহাসিক তথ্য। আজকার বঙ্গনারী নারীত্বহীন। যারা আজ হাতিয়ার নিয়ে যুদ্ধে নেমেছে তারাও বোধ হয় এমনি ক'রে হৃদয়ের বৃত্তিকে হত্যা করে নি।

ডাঃ সেন হাসিয়া বলিলেন—হায় হায়! এ কথা শত্রুও বোধ হয় বল্‌তে পারে না। কোনদেশে এমন মা আছে, যে মা না খেয়ে সন্তানকে খাওয়ায়, শীতের রাত্রে নিজের পিঠকে আলগা রেখে সন্তানকে ঢাকে। নিজে উপবাস ক'রে ভূরি ভোজনের অভিনয় ক'রে স্বামীকে খাওয়ায়। সর্বস্ব স্বামীর

কল্যাণে অম্লান মুখে ত্যাগ করে, এমন বধূ কোন দেশে আছে ? হিন্দুনারীর সহিষ্ণুতা, ত্যাগ, আত্মসমর্পণ কোন জাতির মেয়েদের মধ্যে আছে ? আজও দারিদ্র্য দুঃখ লাঞ্ছিত হিন্দুর গৃহ শান্তি প্রীতি ভক্তির আবাসভূমি। এই দেশে জন্মেছেন ব'লেই বুঝছেন না—এমনি গৃহকে পাওয়ার জন্যে সমস্ত পাশ্চাত্যদেশ সাধনা ক'রছে।

ডাঃ হালদার একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন—হ্যাঁ, ডাঃ সেনের কথা সত্যিই ভাববার। সহস্র সহস্র বৎসরের সাধনায় আর্য সভ্যতা আজ যে ত্যাগ, নিষ্ঠা ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা আমাদের দিয়ে গেছে তা ব্যর্থ হয় নি। ঘরে ঘরে আজ সীতার মত গৃহবধূ হ'য়েছে—এটা সাধনাপ্রসূত হলেও আজ স্বাভাবিক ও সাবলীল। সভ্যতায় মানুষের প্রকৃতি বদলে গেছে বই কি—নইলে স্বার্থপর মানুষ কি হিন্দু মেয়েদের মত ত্যাগ ক'রতে পারে ; কিন্তু আজ পেটিকোট ফ্রকের মোহে আমরা সে স্বাভাবিক ও সাবলীল গৃহকে হারাতে বসেছি। বর্তমানে শিক্ষিত মেয়েরা হ'য়েছে না মেম না বাঙালী। পূর্বরাগের পালা উদ্‌যাপন ক'রে বিয়ে ক'রতেও লজ্জা হয়, আবার বাপ মায়ের পছন্দে বিয়ে ক'রতেও মন সায় দেয় না ! তারা তাই গৃহকে উচ্ছৃঙ্খল ক'রেছে, ব্যভিচার ও অকল্যাণকে ডেকে এনে গৃহকোণে স্থান দিয়েছে।

সাহিত্যিক কহিলেন—হ্যাঁ, যা বলেছেন ডাঃ হালদার। আজ তাদের অবস্থা হ'য়েছে ত্রিশঙ্কুর মত—স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝামাঝি একটা জায়গায় ঝুলছে—সীতাও হয়নি, জোয়ান অফ্ আর্কও হয়নি। হ্যাঁ কি ব'লছিলাম ভুলে গেলাম—

অধ্যাপিকা বসু বলিলেন—কথাটা বড় এক তরফা চ'লছে ডাঃ হালদার। মেয়েদের ছেড়ে দেওয়ার ভরসাও আপনার নেই, আবার গৃহকোণে রেখে পঙ্গু ক'রতেও ইচ্ছা হয় না। এই দুইয়ের মাঝে পড়ে শিক্ষিতা মেয়েরা হয়েছে সবচেয়ে দোষী। পুরুষরাও আজ ঠিক তাই—ত্রিশঙ্কুই। সীতাকে বিয়ে করেও তৃপ্তি পায় না, জোয়ানকে বিয়ে ক'রতেও ভরসা পায় না। অর্থাৎ জোয়ানকে বিয়ে করবার মত সাহসও সঞ্চয় করতে সে পারে নি, পক্ষান্তরে সহিষ্ণু সীতাকে নিজের সুখের জন্যে সর্বস্বান্ত করে শোষণ করবার প্রলোভনও যায় নি।

ডাঃ বিশ্বাস আজ একটু দেরিতে আসিয়া পড়িয়াছেন। ঘরে ঢুকিয়া দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া আসিতেই ডাঃ দত্ত কহিলেন—খুলে দিন, খুলে দিন, গরমে সিদ্ধ

হচ্ছে সব। ডাঃ বিশ্বাস সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। দত্ত উঠিয়া গিয়া দরজাটা খুলিয়া রাখিয়া আসিলেন। আদিত্যবাবুর ইঙ্গিত মত সেটা অর্ধেক খোলা রহিল। ডাঃ বিশ্বাস কহিলেন—দরজা খুলে রাখা আপনার একটা মানসিক ব্যাধি কিন্তু। দরজা খোলা নিয়ে একটা দুঃখ আপনার জীবনে কোথায় যেন আছে।

দত্ত কহিলেন—দরজা দিয়েও কি আপনি একটা কিছু দুঃখ পেয়েছেন জীবনে?

একটা চাপা হাসির শব্দ খেলিয়া গেল। ডাঃ বিশ্বাস বলিলেন—নিঃজ্ঞান মনে একটা ভয় থাকে মানুষের। কোন ঘটনায় কোন জিনিসের সঙ্গে একটা সংযোগ বা association ঘটে যায়। ঐ যেমন আপনার দারোয়ান আরসোলা দেখলেও বড্ড ভয় পায়। মনের দুর্জ্ঞেয় রহস্য যারা জানে তারা কিন্তু এ সব ব্যাপারে স্বাধান। মিঃ ঘোষ টেবিলের উপরে ব্যাগটা রাখিয়া বলিলেন—আদিত্যবাবু, আপনার সেই বিজ্ঞাপনদাতা ভদ্রলোক এয়েছেন কি?

ডাঃ বিশ্বাস কহিলেন—ব্যাগটা নামিয়ে রাখুন। ওটা যেন—

ঘোষ বলিলেন—থাক এখানেই। এটা ত এমন ভয়ানক কিছু নয়—

আদিত্যবাবু বলিলেন—হ্যাঁ, তিনি এসেছেন আজ সকালে। বেশ ভদ্রলোক।

চন্দনা কহিল—ডাকুন না তাঁকে। আজকার এই প্রসঙ্গ সম্বন্ধে তাঁর মত-মতটা শোনা যাক, তা হ'লেই—

ডাঃ বিশ্বাস কহিলেন—একটা মতামত শুনেই মানুষকে বোঝা যায়! মতামতগুলো কতকটা ঘটনা পারম্পরিক। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এসে কেউ হয়ত মেয়েদের শ্রাদ্ধ করতে পারে, আবার কেউ হয়ত—

ডাঃ দত্ত একটু উষ্মা সহকারে কহিলেন—যারা সর্বদা ঘটনা পরম্পরায় মত পাল্টায় তারা ত পাগল।

—না, জগতে সবখানি sane লোকও যেমন নেই, সবখানি পাগলও তেমনি নেই, যেমন ধরুন এই দরজা খুলে রাখা।

—অথবা দেওয়া।

চন্দনা কহিল— যাক্, ওঁকে ডাকুন না, আমরা আলাপ ক'রে নি।

মিঃ ঘোষ বলিলেন—হ্যাঁ, ডাকা দরকার—স্বাস্থ্যটা ভাল ত?

ডাঃ বিশ্বাস পুনরায় ব্যাগটাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—নামিয়ে রাখুন মিঃ ঘোষ।

—কেন, আপনি ইনসিওর করেন নি এখনও? আমি কিন্তু কাউকে অনুরোধ করে ইনসিওর করি না, জানি যারা বুদ্ধিমান তারা আমাদের কাছে আসবেনই।

ডাঃ হালদার কহিলেন—ইনসিওর করাটা ভগবানের উপরে বিশ্বাসের অভাব সূচিত করে। যারা নিজের উপরও বিশ্বাস পায় না, ভগবানকেও বিশ্বাস করতে পারে না তারাই কেবল ঐভাবে টাকা সঞ্চয় করতে চায়।

মিঃ ঘোষ ব্যাগটাকে ভাল করিয়া রাখিয়া বলিলেন—হ্যাঁ, ডাকুন না তাঁকে।

ডাঃ বিশ্বাস তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন—আসি নমস্কার, আজ একটা কল আছে।

অধ্যাপিকা বসু বলিলেন—ডাকুন না তাঁকে আদিত্যবাবু, আপনার অসাধারণ সেই supermanকে একটু দেখি।

আদিত্যবাবু একটা কাগজে সামান্য কিছু লিখিয়া ভৃত্যের হাতে পাঠাইয়া দিলেন। ভৃত্য অনতিবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া আর একখানি কাগজ দিল। আদিত্যবাবু পড়িয়া শুনাইলেন—

আপনাদের আড্ডায় যোগ দিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত। আমাকে আহ্বান করা ব্যক্তি স্বাধীনতার অন্তরায় তাহা স্মরণ করাইয়া দিতে বাধ্য হইলাম। সামাজিক আচার-ব্যবহার এবং আনুসঙ্গিক জোরজবরদস্তি মানুষের স্বাধীনতাকে হরণ করিয়াছে। যথা ইচ্ছা না থাকিলেও ভদ্রতা রক্ষার্থে যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু ভদ্রতা অপেক্ষা স্বাধীনতাকে আমি বেশি ভালবাসি।

চন্দনা কহিল—ওঁর সঙ্গে কি কি এসেছে?

—অনেক বইপত্র।

ডাঃ সেন কহিলেন—কি বই? কাব্য সাহিত্য না দর্শন বিজ্ঞান?

—হরেক রকম।

মিঃ লাহিড়ী বলিলেন—মানুষের মাঝে আসতে চান না। বিপ্লবী নয় ত? শেষে একদিন দেখবেন বোমা ফেটে সমস্ত বাড়িটাই উড়ে গেছে।

ডাঃ হালদার বিরক্তির সহিত বলিলেন—যাক্, ও সব হ'লে আটকাবার যো নেই, তবে আদিত্যবাবু ঘড়ি আংটি সাবধান ক'রে রেখেছেন। হ্যাঁ, হেগেল, কান্ট, কাইজারলিং, মার্কস এদের বই দেখলেন?

ডাঃ সেন কহিলেন—কন্টিনেণ্টাল সাহিত্যের কোন বই, হামসুন, বোয়ার, আনাতোল ফ্রাঁ, টমাসম্যান, পিরান্দেলো, শোলোখব, আপটন সিনক্লেয়র, পার্লবাক্।

ভট্টাচার্য সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন—চৈতন্যচরিতামৃত, গীতা, উপনিষদ, বেদান্ত, সাংখ্য, পুরাণ—

আদিত্যবাবু সকলকেই নিরাশ করিয়া কহিলেন—না, বইগুলো চুণ-সুরকির মত গাদা ক'রে আনা হ'য়েছে, তা আবার খবরের কাগজ দিয়ে ঢাকা।

সাহিত্যিক বলিলেন—কোন পাণ্ডুলিপি আকারে কিছু—

অধ্যাপিকা বসু বলিলেন—কেমন চেহারা?

—দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ, শ্যামবর্ণ।

—ভালই তা হ'লে!

—হ্যাঁ! তবে সেটা যার যার চোখে—

ডাঃ হালদার চাকরকে প্রশ্ন করিলেন—কি কচ্ছেন এখন?

—শুয়ে শুয়ে বিড়ি খাচ্ছেন।

চন্দনা কহিল—বিড়ি?

—হ্যাঁ। সিগারেট দিয়েছিলাম তিনি ফিরিয়ে দিয়ে বিড়ি আনতে বল্লেন।

মিঃ লাহিড়ী একটু হাসিয়া ব্যঙ্গের স্বরে বলিলেন-ভবঘুরে লোক। সিগারেটে জমে না।

চন্দনা প্রতিবাদ করিল—একবার ব'লছো চোর, একবার বিপ্লবী, একবার ভবঘুরে, যা হয় একটা ঠিক ক'রে বল—তিনি কোন্ ঘরে থাকেন?

—বেরোবার সময় বাঁ পাশে, নীচের তলায় কোণের ঘর।

—তুমি আলাপ ক'রতে যাবে নাকি?

—যাই যাবো। তা দিয়ে দরকার?

আদিত্যবাবু বলিলেন—তাঁর ঘরের কড়া নাড়তে নিষেধ আছে; কিন্তু আমি একটু চিন্তিত হয়েছি—লোকটি আমাদেরই মত, কোন কিছুই বেশি তাঁর এখনও দেখতে পেলাম না।

হালদার সান্ত্বনা দিলেন—ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি, প্রকাশিত হবেই।

আড্ডা অন্তে নামিবার পথে চন্দনা লাহিড়ীকে কহিল—আমার মোটরেই ফিরবে ত?

—হ্যাঁ, এটা প্রশ্ন করা হ'ল যে হঠাৎ?

—কি জানি যদি রাগ হ'যে থাকে, পুরুষ মানুষের কাছে ওটা ত বীরত্ব। যাক্ চল ভদ্রলোককে একটু দেখে যাই।

চন্দনা নামিতে নামিতে মানবেন্দ্রের ঘরের জানালাটার কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল—অসঙ্গত হইলেও একটু থামিয়া জানালার ভিতর দিয়া দেখিল—অত্যন্ত দীর্ঘদেহটাকে খাট-আয়তক্ষেত্রের কর্ণরূপে স্থাপন করিয়া কি যেন একটা বই পড়িতেছে, মেঝের একটা দগ্ধ বিড়ির পরিত্যক্ত অংশ জ্বলিতেছে। ঘরখানা অনাবশ্যকরূপে শৃঙ্খলাহীন— বইপত্র সব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।

গাড়িতে উঠিয়া চন্দনা কহিল—লোকটা কেমন যেন!

লাহিড়ী অভিযোগ করিলেন—তোমার কৌতূহল ত ভয়ানক, না দেখে পারলে না কিছুতেই!

—এমন একটা জীব, দেখবো না!

লাহিড়ী হাসিয়া কহিলেন—জীবই বটে! নইলে নিরঙ্কুশ চিত্তে এমনি পরের অন্ন খেতে পারে!

চন্দনা খানিক ভাবিয়া কহিল—তুমি যেদিন প্রথম আমার ওখানে এলে সেদিন কিন্তু এমনি নানা সন্দেহ ক'রেছিলাম।

—কেন?

—কেন? তোমাকে বড্ড অদ্ভুত মনে হ'য়েছিল, কি ভনিতাই সেদিন ক'রেছিলে। আর যেদিন সোনার ঘড়ি চেন আংটি বোতাম নিয়ে এলে, সেদিন ভয় হ'য়েছিল কি জানি একটা চোরকে আশ্রয় দিলাম নাকি?

মোটর নির্জন পথ দিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছিল। লাহিড়ী কপালের উপর হইতে চুলটা সরাইয়া দিয়া কহিলেন—আজ ত তোমাকে ব'লতে বাধা নেই, তোমার জন্তে কি ক'রেছি,. কি করিতে পারতাম?

—কেন?

—ও ঘড়ি চেন বোতাম, সত্যিই চোরাই মাল!

—সে কি ?

—হাঁা, অন্য কারও নয় আমার বাবার। চুরি ক'রে এনেছিলাম, তার পর আর বাড়ি ফিরি নি। বাপ মা খোঁজ নিয়েছিলেন কিন্তু ফিরে যাওয়া পর্যন্ত তাঁরা বেঁচে থাকেন নি। তোমাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা সেদিন এমনি দুর্বার হ'য়ে উঠেছিল।

চন্দনা কহিল—যাক্, ব্যর্থ হয় নি সে সব। আমি সিনেমায় না গেলে তোমাকে কে ডিরেক্টর ক'রতো? আজ ত সব ফিরে পেয়েছ?

লাহিড়ী উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—নিজের সম্বন্ধে অত অহঙ্কার থাকা ভাল নয়, তোমার সঙ্গে পরিচয় আমার পথ ঠিক ক'রে দিয়েছে, চলার গতি দিয়েছে কিন্তু অক্ষমতা থাকলে আজ এখানে আস্‌তে পারতাম না।

চন্দনা লাহিড়ীর কাঁধের উপর হাত তুলিয়া দিয়া কহিল—বেশ! তুমি বড় ডিরেক্টর, ভারতখ্যাত। তোমার সঙ্গে পরিহাস করাই আমাদের মত তুচ্ছ লোকের অন্যায়। যাক্—

লাহিড়ী চিন্তাযুক্ত হইয়া মোটরে ব্রেক করিলেন এবং সস্নেহে প্রশ্ন করিলেন—মাঠে একটু হাওয়া খেতে যাবে?

—চল, কিন্তু রাত কত হ'ল?

—দশটা।

*

ডাঃ দত্ত সারাদিন প্রায় অভুক্ত অবস্থায় ঘুরিয়া যখন নিজের বাসার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে। দ্বিতলের ঘরটায় তখনও আলো জ্বলিতেছে- সম্ভবত মলিনা জাগিয়া আছে।

ডাঃ দত্ত কড়া নাড়িয়া এবং জুতায় যথা সম্ভব একটা উদাত্ত শব্দ তুলিয়া দ্বিতলে উঠিয়া গেলেন। মলিনা দরজা খুলিয়া নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। ঘরে যাইয়া কাপড় জামা ছাড়িবার বন্দোবস্ত করিতেছেন এমন সময় মলিনা আসিয়া কহিল—এমনি ক'রে সারাদিন ঘুরতে হয়! না খেয়ে নিজে কষ্ট পেলে আমাকেও দিলে? এমনি ক'রবে বলেই কি বিয়ে ক'রেছিলে?

ডাঃ দত্ত কহিলেন—যাক্, তুমি এমনি ক'রবে, জেনে যে বিয়ে করি নি একথা ঠিক।

—যাক্, ওসব কথায় দরকার নেই। এখন হাত মুখ ধু'য়ে দুটি খেয়ে নাও। সব গরম আছে। দেরি ক'রলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

—তুমি কিছু খাও নি?

মলিনা হাসিয়া বলিল—বেশ লোক, ভাত নিয়ে সন্ধ্যে পর্যন্ত বসে, তার পরে ত সব ঝি চাকরকে দিয়ে আবার রাঁধতে গেলাম; হিন্দুর ছেলে হয়ে কি ব'লছো?

—ও আচ্ছা, তুমি জোগাড় করো, আমি হাত মুখ ধুয়ে যাচ্ছি।

মলিনা সস্নেহে কহিল—থাক্, সারাদিন যা ক'রেছ, তা ত বুঝছি। আমিই উপরে ভাত নিয়ে আসছি, তোমাকে আর নীচে যেতে হবে না।

ডাঃ দত্ত খুশি হইয়া কহিলেন—আচ্ছা, তাই করো।

মলিনা সযত্নে খাবার গোছাইয়া দিল। সারাদিন পরে খাইতে বসিয়া দত্ত বেশ আরাম অনুভব করিতেছিলেন। মলিনা কহিল—এমন কষ্ট কেন পেলে, কেনই বা দিলে?

—আমি দিয়েছি? তুমিই ত এমনি ক'রে কষ্ট দিলে!

—আমি কি করলুম?

—কেন তোমার অত জিদ, আমার কথাটা রাখ্‌লে তোমার এমন কি ক্ষতি

মলিনা ইতস্তত করিয়া প্রসঙ্গটাকে এড়াইয়া কহিল—ভ-ভারতে কে শুনেছে যে মানুষে দরজা আলগা ক'রে সস্ত্রীক শোয়?

—যদি কারও সেটা ইচ্ছে হয় তা কি তার স্ত্রী পূর্ণ করে না? সে ত্যাগ, সে সেবা যত্ন ছিল আগে যখন সীতা সাবিত্রীর পূজা করতো লোকে—এখন সব ভুলেছ তোমরা। জানো কেবল নিজের সুখ।

মলিনা প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইল না। পরিহাস করিল—রামচন্দ্রেরা চিরকালই সীতার বনবাসের ব্যবস্থা করেন। তাতে বাধা পড়লেই সীতা হয় খারাপ।

আহারান্তে কিছুক্ষণ দুইজনে বসিয়া পুরাতন মান-অভিমান প্রসঙ্গে বিতর্ক হইল। মলিনা কহিল—সারাদিন পরিশ্রম করেছ, এখন ঘুমাও, কেমন?

—তুমি পরিশ্রম কর নি?

—হ্যাঁ, কতবার দোতলায় উঠে রাস্তার দিকে দেখেছি কিন্তু কিছুতেই এলে না। মলিনা অভিমান বেদনায় কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল।

দত্ত সান্ত্বনা দিলেন—যাক্, কষ্ট আমার জন্যও তা হ'লে তুমি পাও!

মলিনা উঠিয়া দরজা দিতে গেল। দত্ত উঠিয়া বসিয়া ভীত স্বরে কহিলেন—দিও না, দিও না, দরজা দিও না।

মলিনা আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—সেকি? আজও কি তেমনি ক'রবে নাকি?

দত্ত উঠিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া কহিলেন—কেন তুমি দরজা দেবে? বার বার ব'লছি তোমার জিদ কিছুতেই যাবে না?

মলিনা ভীত হইয়া কহিল—না না, দরজা দাও, নইলে আমি থাকতে পারবো না।

দত্ত আলো নিভাইয়া দিয়া মলিনার হাত ধরিয়া কহিলেন—এসো।

—না না, দরজা দাও। উঃ—আমাকে যেতে দাও।

দুর্দমনীয় একটা চাপাক্রোধে দত্ত মলিনাকে সজোরে ধরিয়া কহিলেন—তোমাকে থাক্‌তেই হবে। যার জন্যে সমস্ত ত্যাগ করেছি তাকে এমনি ক'রে পালাতে দেব না। রাখো তোমার ভয়।

ঘনান্ধকারের মধ্যে দত্ত জোর করিয়া মলিনার ক্ষুদ্র দেহখানাকে বিছানার উপরে আনিয়া চাপিয়া ধরিয়া রাখিলেন যাহাতে কোন ক্রমেই সে পলাইতে না পারে; কিন্তু মলিনার দেহ কোন রূপ প্রতিবাদ করিল না।

নিঃশব্দ অন্ধকারে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল।

দত্ত অকস্মাৎ অনুভব করিলেন, মলিনার দেহখানা যেন শক্ত হইয়া গিয়াছে এবং নিশ্বাস যেন কেমন একটা অজ্ঞানতা প্রকাশ করিতেছে।

আলো জ্বালাইয়া দত্ত দেখিলেন—মলিনার সংজ্ঞাহীন দেহখানা নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। দত্ত মনে মনে চিন্তা করিলেন—মলিনার হিস্টিরিয়ার ব্যারাম আছে তাহা ত কোন দিন কেহ বলে নাই, এক্ষেত্রে এমনি জোর করাটা তাঁহার উচিত হয় নাই।

সংজ্ঞাহীন মলিনা যেন কহিল—ওই, কে যেন আসে—দাও দাও, দরজা দাও!

দত্ত ঠাকুরকে ডাকিয়া গরম জল করিতে কহিলেন। ডাক্তারী শাস্ত্র যতদূর

জানা ছিল তাহাতে দত্ত ভাল করিয়াই জানিতেন যে, পায়ে উষ্ণ জলের সেক দিলে হিস্টিরিয়ার প্রকোপ প্রশমিত হয়।

সেঁকে সেদিনের মত সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল এবং রোগীর অনুরোধ ক্রমে তাহাকে পার্শ্বের ঘরেই থাকিতে দেওয়া হইল।

*

মানবেন্দ্র সকালে উঠিয়া চা পানান্তে সংবাদপত্র পড়িতেছিল—চা দিয়া গিয়াছিল সারদা ঝি। মানবেন্দ্র তাহাকে সংক্ষেপে বলিয়াছিল, চা'র সঙ্গে খাবার বেশি খাওয়া স্বভাব নয়—একখানা বিস্কুট কি একগাল মুড়ি হলেই যথেষ্ট।

সংবাদপত্রে সংবাদ কি ছিল জানা নাই তবে মানবেন্দ্র আপন মনেই দেখিতেছিল।

তপতী ও আদিত্যবাবু দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন—আসতে পারি?

—অবশ্যই। আপনি ত আমার চেয়েও সাংঘাতিক লোক।

আদিত্যবাবু বলিলেন—ওটা স্তুতি হ'ল না নিন্দা হ'ল বুঝতে পারলাম না।

—স্তুতিই হ'ল। পরের ঘাড়ে বসে খাওয়া আর হুকুম চালানো তবুও সোজা কাজ কিন্তু খেতে দিয়ে তার কাছে অপরাধীর মত সম্মতি প্রার্থনা করা অত্যন্ত কঠিন। বসুন। হ্যাঁ—এমনি কাজ যিনি পারেন তিনি মহাপুরুষ ব'ললেও অত্যুক্তি হয় না।

তপতী একটু হাসিয়া কহিল—আপনার মুখে এমন কথা প্রত্যাশা করি নি।

—প্রত্যাশাটা বেশি ক'রলে নিরাশ হ'তেই হবে। ব'সো তপতী।

আদিত্যবাবু খালি চেয়ারখানায় বসিয়া কহিলেন—আপনার কোন অসুবিধে হচ্ছে না ত? ধরুন, ঝি চাকর দিয়ে কাজ, তা ত মনের মত হয় না। ঠাণ্ডা চা দিলে, গরম জল দিলে, এইত ওদের কাজ—

মানবেন্দ্র হাসিয়া কহিল—তাদের দিয়ে কাজ কি ক'রে আদায় করতে হয় তা জানি। আর কোথায় কাজ ভাল ভাবে ক'রতে হয় তাও তারা জানে। মানুষে স্ত্রী কন্যা এদের কাছে অনেক প্রত্যাশা করে, একটু কম হলেই দুঃখ হয়, কিন্তু ঝি চাকরের কাছ থেকে বেশি প্রত্যাশা করি না বলেই অসুবিধে কম।

তপতী প্রশ্ন ক'রিল—আপনার বাপ-মা বেঁচে আছেন ?

মানবেন্দ্র আবার একটু স্মিত হাসিতে তপতীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—দেখুন আদিত্যবাবু, ব্যক্তি-স্বাধীনতা কেমন করে নষ্ট হয় সমাজ-নীতির প্রতাপে, ধরুন এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আমার ইচ্ছে নেই, কিন্তু না দিলে অভদ্রতা, শুধু তাই নয় তপতী মনে মনে দুঃখও পেতে পারে। অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃত উত্তর আমাকে দিতেই হবে। হ্যাঁ, একটা কথা, তপতীকে তুমি ব'লছি, বয়সের গুণে, নইলে এটাও অন্যায় হ'ত।

আদিত্যবাবু বলিলেন—তা বলুন ভালই, কিন্তু বয়স ত আপনারও বড় জোর তিরিশ। আদিত্যবাবু আপনার বয়সের গুরুত্বটাকে আরও গুরুতর প্রতিপন্ন করিবার জন্য হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

মানবেন্দ্র হাসিয়া কহিল—যতই হোক, তপতীর চেয়ে বড় ত!

তপতী প্রতিবাদ করিল—খুব বেশি নয়।

আদিত্যবাবু টেবিলের উপর হইতে একখানা খোলা বই টানিয়া লইয়া বলিলেন—কি বই ?

—রোমাঞ্চকর গল্পের বই।

—এও পড়েন ?

—ওই পড়ি, কারণ ওরা মিথ্যা বলে না। সাহিত্যের নামে অসাহিত্য চালায় না। চোর যদি চুরি স্বীকার করে তবে সেটা তার সততাই হবে, ওরাও তেমনি অন্তত সততা রক্ষা করে। উপরেই দেখুন লেখা—থ্রিলার।

তপতী প্রশ্ন করিল—আপনি কবিতা লেখেন ?

—আমার পরম শত্রুও এমন অপবাদ দেয় নি কোন দিন।

তপতী যেন অনেকটা মরিয়া হইয়া কহিল—তবে কি করেন ?

—কিছুদিন থাক্‌লেই ঠিক পাবে কি করি। মুখে যদি আমি বলি আমি চুরি করি তা হ'লেও সেটা যেমন বিশ্বাস করবে না, তেমনি তান্ত্রিক সাধনা করি ব'ললেও ক'রবে না। এক্ষেত্রে নিজেরা দেখে শুনে একটা যা হয় মতামত ঠিক ক'রলেই ভাল হয়,—না ? উপার্জন যে কিছু করি না এটা ত জানা যাচ্ছে!

আদিত্যবাবু বলিলেন—হ্যাঁ, সেই ভাল, তবে ছেলেমানুষ ওরা ত প্রশ্ন ক'রবেই। আচ্ছা উঠি এখন। যদি ইচ্ছে হয় সন্ধ্যার আড্ডায় যাবেন।

—হ্যাঁ। প্রশ্ন ওঁরা করবেনই তবে উত্তর দেওয়া না দেওয়াটাও আমার

চাত। হ্যাঁ, আর আপনাকে ধন্যবাদ—মনে মনে আপনাকে সাধুবাদ না দিয়ে পারছি না। ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে যে আপনি প্রশ্ন করেন নি, এটা আপনার অসাধারণ সংযম সন্দেহ নেই। এমনি মানুষ, প্রথম আপনার সঙ্গে দেখা—

আদিত্যবাবু পরিহাস করিলেন—রতনে রতন চেনে।

তপতী পিছন ফিরিয়া একবার চাহিয়া চলিয়া আসিল।

*

সান্ধ্য আড্ডায় সেদিন মিস্ বসু অভিযোগ করিলেন—দেখুন, একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি নে, আজকালকার শিক্ষিতা মেয়েকে বেশির ভাগ লোকেই গালাগালি করে কেন? আমরা ত কোন অপরাধ করিনি, শিক্ষিতা গৃহবধূগণ স্বামীকে বিন্দুমাত্র কম সেবাযত্ন করে এমন শুনি নি। তারা বেশি ব্যয়সাধ্যও নয়—বহু গ্রাজুয়েট মেয়েকে জানি যারা ঘরের মধ্যে ছেঁড়া কাপড় পরে হেঁসেলেই পড়ে থাকে—তবুও এ অপবাদ যায় না কেন?

ডাঃ বিশ্বাস বলিলেন—দেখুন, এখানে একটা মনের কথা আছে, যারা শিক্ষিতা মেয়েদের গালাগালি করে, দেখবেন তাদের বেশির ভাগ লোকেরই স্ত্রী অশিক্ষিতা। তারা যা পায় নি অন্যে তাই পেয়েছে এটা তাদের সহ্য হয় না, তাই অতৃপ্তির ঝাল ঝাড়ে আপনাদের উপর। জানবেন, ওটা তাদের প্রশংসাবাদ।

ডাঃ সেন বলিলেন—তা নয়, বহু ছেলেকে জানি যারা শিক্ষিতা মেয়ে বিয়ে কর'তে চায় না। এটা হ'য়েছে শিক্ষার ত্রুটি। তারা ভয় পায় এই সব মেয়েদের ঘরে রাখতে; এদের সঙ্গে ফ্লার্ট করা চলে, ভালবাসাও চলে কিন্তু নিঃসংশয় মনে গৃহে স্থান দেওয়া যায় না। গৃহে যে পবিত্রতা, যে সহিষ্ণুতা ও ত্যাগ দরকার তার থেকে এরা বঞ্চিত।

মিস্ বসু প্রতিবাদ করিলেন—পবিত্রতা কথাটা বাদ দেবেন দয়া করে। শিক্ষিতা মেয়েরাই বরং কৌশলে এবং বুদ্ধি দিয়ে আপনাদের লোলুপতার হাত থেকে বাঁচতে পারে, ওরা পারে না। সহিষ্ণুতা আর ত্যাগ—ওরা যে নিত্য সংকীর্ণ স্বার্থের জন্যে ভায়ে ভায়ে, জায়ে জায়ে কলহ সৃষ্টি ক'রছে সেটা কি ত্যাগের লক্ষণ? ডাঃ বিশ্বাসই বোধ হয় ঠিক অনুমান ক'রেছেন।

ডাঃ বিশ্বাস বলিলেন—অনুমান নয়, এটা সত্য। মন-বিজ্ঞানের ওটা একটা প্রধান আলোচ্য ব্যাপার। Rationalisation অর্থাৎ—মিথ্যা ব'লে নিজের অতৃপ্তিকে মনে মনে সান্ত্বনা দেয়।

ডাঃ হালদার এতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—মেয়েদের পবিত্রতার কথা ব'লছেন? তাঁরা যদি অপবিত্র হ'তে ইচ্ছে করেন তবে কারও সাধ্য নেই ঠেকাবার—সমাজনীতি, ধর্মশিক্ষা, সব ব্যর্থ। তবে তাঁরা পবিত্রতার প্রতীক—বিশেষত হিন্দু গৃহবধূ, তাঁদের জীবনে মাতাই বড়, পত্নী বা প্রেয়সী তাঁদের মাঝে মাতার ছায়ায় রয়েছে। ও আলোচনা তাই বৃথা—তাঁরা চান সন্তান ও গৃহ এবং গৃহকে পূর্ণ ক'রতে স্বামী, স্বামীকে পেতে চান না গৃহের মাঝে।

ডাঃ দত্ত সানন্দে দরজাটাকে খুলিয়া রাখিয়া, টুপিটাকে টেবিলের উপর অত্যন্ত অসাবধানতার সঙ্গে ছুড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়িলেন। ডাঃ হালদার বলিয়া চ'ললেন—অর্থাৎ মেয়েরা চান তাঁদের স্বামীকে বাহনরূপে ছেলেপুলের—তথা তাঁর গৃহের প্রতিপালন ক'রবার দাসরূপে—প্রেমিকরূপে নয়।

মিস বসু বলিলেন—আর পুরুষরা স্ত্রীকে চান নিজের দাসীরূপে।

দত্ত একটু উষ্মা সহকারে বলিলেন—না, তাঁরা চান সাথীরূপে, বন্ধুরূপে, নির্ভররূপে, কিন্তু এ তিনটির একটিও তাদের মধ্যে নেই। তাদের আছে কেবল স্বার্থবুদ্ধি—সংকীর্ণ আত্মকেন্দ্রিকতা।

ডাঃ বিশ্বাস দরজাটাকে কিছুটা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিয়া বলিলেন—যারা সবচেয়ে বেশি ভালবাসে মেয়েদের তারাই হয় নারী বিদ্বেষী। যারা ভালবাসার ব্যাপারে বেশি ব্যর্থ হয়, তারাই নিন্দা করে মেয়েদের।

মিস বসু ও চন্দনা হাসিয়া উঠিল। মিঃ দত্ত হাসিবার অভিনয় করিয়া কহিলেন—আর যাঁরা কোন বিষয় আয়ত্ত ক'রতে পারেন না তাঁরা পণ্ডিত হন মন-বিজ্ঞানে; কারণ যা বলেন তাই দুর্জ্ঞেয় মানুষের মন সম্বন্ধে কিছু না কিছু মেলে।

মিঃ ঘোষ ব্যাগটা দোলাইতে দোলাইতে গৃহে প্রবেশ করিলেন। ডাঃ বিশ্বাস ভীতভাবে আশে পাশে একটু চাহিয়া হঠাৎ বলিলেন—আচ্ছা আমি উঠি, কিছু মনে ক'রবেন না।

ডাঃ বিশ্বাস এমন ভঙ্গিতে চলিয়া গেলেন যেন তিনি হঠাৎ কোন কারণে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। মিঃ ঘোষ রসিকতা করিলেন—আমার

ব্যাগের মধ্যে যাদের ভরা যায় নি তারাই দুর্ভাগ্য, তাদের পত্নী ও শিশু ততোধিক।

একটু চাপা হাসি খেলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে দরজার প্রান্তে দীর্ঘকায় একটি লোক আসিয়া উদাত্ত স্বরে প্রশ্ন করিল—আসতে পারি?

আদিত্যবাবু কহিলেন—আসুন আসুন, মানবেন্দ্রবাবু। ইনি আমার নবতম অতিথি—আর এঁরা, একে একে পরিচয় করিয়ে দি।

আদিত্যবাবু পরিচয় করাইয়া দিয়া কহিলেন—আশা করি মানবেন্দ্রবাবু আমাদের সান্ধ্য আড্ডা পূর্ণ ক'রবেন।

মানবেন্দ্র গম্ভীরভাবে ডাঃ বিশ্বাসের পরিত্যক্ত চেয়ারটায় বসিয়া দগ্ধ বিড়ির অবশিষ্টাংশটা মেঝের ফেলিয়া দিল। যে প্রসঙ্গটা চলিতেছিল সেটা চাপা পড়িয়া গেল। সকলে নির্বাক ও উৎকণ্ঠিত চিত্তে নতুন কোন প্রসঙ্গের অপেক্ষা করিতেছিলেন। মানবেন্দ্র দেয়ালের দিকে চাহিয়া ছিল, কিছুই বলিল না।

ডাঃ সেন বলিলেন—যা শুনলাম আপনি ত অনেক পড়েছেন, পড়াশুনোই আপনার পেশা। আমরা দুই একটা প্রশ্ন কৌতূহলের বশবর্তী হ'য়ে ক'রলে বিরক্ত হবেন কি?

মানবেন্দ্র একজন চাকরকে ডাকিযা বলিল—এক কাপ চা দাও। প্রশ্ন আপনারা ক'রতে অবশ্যই পারেন কিন্তু উত্তর দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছা। পড়াশুনো আমার পেশা শুনেছেন—শুনেছেন ঠিকই, তবে পেশা নয়—কাজ।

ডাঃ হালদার হাসিয়া বলিলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনেক পড়েছেন নিশ্চয়ই কিন্তু—

—হ্যাঁ অনেক পড়েছি বলা যায়, অল্পস্বল্প পড়া হলে ত অধ্যাপকই হতাম।

ডাঃ সেন ও হালদার পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ডাঃ সেন বলিলেন—অল্প পড়াশুনো হ'লে কি অধ্যাপক হ'তে পারে? কি বলেন মিস্ বোস?

মিস্ বসু জবাব দিতে কেন যেন ভীত হইতেছিলেন, মানবেন্দ্র কহিল—কথাটা একটু শ্রুতিকটু কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য। অধ্যাপক হয় কারা? যারা প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করে, কেমন ত? প্রথম হয় কারা? যারা একই বই চোখ বুজে গিলিত চর্বণ করতে পারে এবং বারবার মুখস্থ ক'রতে পারে। প্রকৃত তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোকের রোমন্থন করার মনোবৃত্তি নেই। তা ছাড়া আত্মপ্রত্যয়ের অভাব হেতু যারা অধ্যাপকগণের সঙ্গে

নানা প্রকারে খাতির ক'রতে পারে তারা মনোজগতের অত্যন্ত নিম্নস্তরের জীব। সত্যিকার বুদ্ধিমান ছেলে নিজের মতকে প্রতিপন্ন ক'রতে চায়, অন্যের মতকে নিজের বলে চালানোকে ঘৃণ্য মনে করে। অতএব নিকৃষ্ট বুদ্ধি ব্যক্তি ছাড়া প্রথম হয় না।

ডাঃ হালদার বলিলেন—সবই কি তাই ?

—অবশ্যই। যারা পড়াশুনো করে তারা অধ্যাপকের বিদ্যার বাইরে দু'কথা লিখবেই, আর অধ্যাপক তাঁর অজ্ঞতা হেতু তাকে কম নম্বর দেবেনই, যেহেতু তিনি নতুন কথাটা জানেন না। অতএব এরা কখনই প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হ'তে পারে না।

ডাঃ সেন একটু এ'দিক ওদিক চাহিয়া যেন অসহায় বোধ করিলেন। মিস্ বস্ সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিলেন—কিন্তু আমরা—

—আপনারা ? সকলেরই ফার্স্ট ক্লাশ, অন্তত বর্তমানে পাওয়া উচিত। প্রথমত অধ্যাপকগণ এখনও পুরুষ, দ্বিতীয়ত না বুঝে মুখস্থ করার শক্তি আপনাদের অসাধারণ এবং অন্যের মতে মত দেওয়াটা আপনাদের স্বভাব; এক্ষেত্রে আপনারা সকলেই প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন না কেন তাই ভেবে আশ্চর্য হই—কত অধ্যাপককে দেখেছি তাঁরা অধ্যাপনার পুঁথি ক'খানার বাইরে দেশের নেতৃমণ্ডলীর চেয়েও কাণা।

ডাঃ হালদার বলিলেন—ডাঃ বিশ্বাস থাকলে কি ব'লতেন জানেন? আপনি বোধ হয় প্রথম শ্রেণী হ'তে বঞ্চিত তাই এই অভিযোগ ক'রছেন।

মানবেন্দ্র হাসির উচ্চ শব্দে ঘর ভরিয়া দিয়া কহিল—ডাঃ হালদার বড় দুর্বল-চিত্ত, নিজের মতটা পরের নামে চালাচ্ছেন কেন? ভগবানের আশীর্বাদ যে ওটা পাই নি এবং অধ্যাপক হ'য়ে আদিত্যবাবুর সান্ধ্য আসর জমিয়ে তুলি নি—সেই জন্যেই অতিথি হয়েছি হয়ত—মানবেন্দ্র আর একবার হাসিয়া উঠিল।

লাহিড়ী এতক্ষণ নীরবে ডাঃ হালদার ও সেনের অবস্থাটা উপভোগ করিতে-ছিলেন। এমন প্রত্যক্ষভাবে তিরস্কার করিতে পূর্বে কেহ পারে নাই। লাহিড়ী তাই সহাস্যে এবং কতকটা আত্মতৃপ্তির সঙ্গে প্রশ্ন করিলেন—পড়াশুনো ক'রেছেন ব'ললেন। অনেক বইও আপনার সঙ্গে এসেছে।

—হ্যাঁ, কিন্তু সে সব পুরোনো পাঁজি। বই রাখি, পড়ি না, হাতে ক'রে ঘুরি, লোককে দেখাবার জন্য! অথবা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বাজাই'।

চন্দনা লাহিড়ীকে অন্তরাল করিতে কহিল—সাহিত্য নিশ্চয়ই আপনার ভাল লাগে, এবং খুব পড়েনও বোধ হয়।

—পড়ি এবং ভালও বাসি, তা না হ'লে ত ফিল্ম ডিরেক্টরই হ'তাম এবং মোটরে চ'ড়ে দর্শক মহলের উপর কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে আত্মতৃপ্তি বোধ ক'রতাম।

লাহিড়ী বিদ্রূপের মত একটু হাসিয়া কহিলেন—তাই আমরা করি নাকি? আর সাহিত্য যারা পড়ে না, বোঝে না, তারাই বুঝি ডিরেক্টর হয়?

—হ্যাঁ। তা ছাড়া অন্য কেউ হ'তে পারে না। যারা বোঝে না, তারা ছাড়া ত কেউ খুন ক'রতে পারে না। সাহিত্যকে যারা খুন করে, তারা নির্বোধ না হ'লে চল্‌বে কেন? সাহিত্য যা'রা বোঝে নি, এবং সূক্ষ্ম রসবোধ যাদের মধ্যে গড়ে ওঠে নি তারা ছাড়া ওই কদর্যতার মধ্যে জীবন কাটাতে পারে কারা? সত্যিকার রসবোধ যাদের আছে তারা গেলে ত আত্মহত্যা ক'রবে।

চন্দনা স্মিত হাস্যে কহিল—সবই কি সেখানে কদর্য?

—হ্যাঁ। বিনা কৈফিয়তে—বলুন, যার বিন্দুমাত্র সৌন্দর্যবোধ আছে সে কি ক্যামেরার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে পাঁচবার একই কথা ব'লতে পারে?

মিঃ ঘোষ প্রশ্ন করিলেন—আপনি ইনসিওর ক'রেছেন? আপনার মত বুদ্ধিমান্ যারা—

—হ্যাঁ।

—কতদিন? ক'হাজার?

—প্রত্যেকবারে এক একটা এক হাজারের করি।

—কোন্ কোম্পানিতে?

—যাবতীয় কোম্পানিতে—কারণ যাদের চক্ষু আছে কিন্তু চক্ষুলজ্জা নেই তারাই কেবল ইনসিওর করে না।

ডাঃ ঘোষ বিজয়গর্বে একটু হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—হ্যাঁ, বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এমনি বলে থাকেন।

মিস বসু প্রশ্ন করিলেন—আপনি বিয়ে করেছেন?

—না।

—অথচ ইনসিওর ক'রেছেন!

—বুদ্ধিমান লোকে ক'রে থাকেন।

—তা বিয়ে করেন নি কেন ?

মানবেন্দ্র মিস বসুর দিকে না চাহিয়াই কহিল—বিয়ে করার মত মেয়ে পাই নি। যাদের বিয়ে ক'রতে পারতাম তারা আমায় বিয়ে করতে চায় নি, যারা আমায় বিয়ে ক'রতে রাজি ছিল তাদের আমি বিয়ে ক'রতে রাজি হই নি।

ডঃ হালদার হাসিয়া কহিলেন—হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। যা চাই তা যদি হাতের মাঝে এসে ধরা দেয় তবে তা আর চাই না—যা আসে না, তাই চাই। অথবা যা চাই তা আসে না, যা চাই না তাই কেবল আসে।

ডাঃ সেন কহিলেন—হ্যাঁ তাইত। চাওয়ার শেষ হলেই ত মৃত্যু হ'ল মনের।

মানবেন্দ্র বলিল—যেমন রোগের প্রকৃত আরোগ্য হয় ম'লে।

ডাঃ দত্ত কহিলেন—জীবন্ত মানুষ নীরোগ অবস্থায় কি নেই ?

মানবেন্দ্র কহিল—মাপ ক'রবেন, আপনি ডাক্তার ; কিন্তু নীরোগ ব্যক্তি বেঁচেই যে থাকে না—দুধ যেমন বেশিক্ষণ ভাল থাকে না ছানা কেটে দেয় কিন্তু ছানাটা থাকে। ডাক্তার আছে বলেই রোগ আছে নইলে রোগ থাকতো না —যেমন ফিল্মের তারকাকুল আছেন বলেই পরিচালক প্রযোজক আছেন— নইলে কিছুই থাকতো না।

ডাঃ হালদার বলিলেন—যেমন আলো আছে বলেই অন্ধকার আছে।

মানবেন্দ্র হাসিয়া কহিল—যেমন আমি আছি বলেই আপনারা নেই। আচ্ছা আসি, কিছু মনে ক'রবেন না, উঠি।

মানবেন্দ্র ক্ষুদ্র একটু নমস্কারে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিল।

তাহার সগর্ব প্রস্থানের পরে ঘরের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা আড্ডাকে অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিয়াছিল। কেহই কিছু বলেন না, পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া কেবল বচনের প্রতীক্ষা করেন।

আদিত্যবাবু সহাস্যে কহিলেন—আমার অতিথিটি সভাকে যেন অকস্মাৎ হতবাক ক'রে দিয়ে গেলেন। ডাঃ হালদার কি বলেন ?

ডাঃ হালদার কি যেন একটা চিন্তা করিতেছিলেন, তিনি কোন জবাব দিলেন না। মিস বসু কহিলেন—বাবা ! আপনার অতিথির চোখ দু'টো কি সাংঘাতিক, তাকালে মনে হয় যেন বাঘের মত—জ্বলজ্বল করে।

চন্দনা কহিল—তা হ'লেও, চোখ দু'টি কিন্তু বেশ—আয়ত এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচায়ক।

ডাঃ দত্ত কহিলেন—দেহটা বেশ পেশীযুক্ত—সবল।

ডাঃ হালদার অকস্মাৎ চিন্তাপ্রসূত মতামত ব্যক্ত করিলেন—উনি যা ব'ললেন সত্যিই ত তাই। আমরা কিছু জানি না বলেই রোজই এক কথা ব'লতে পারি —বিদ্যার অফুরন্ত পথের কতটুকু এগিয়েছি? সত্যিকার মেধা যাদের আছে তারা ত অধ্যাপনা ক'রতে পারে না, তারা স্বাধীনভাবেই পড়াশুনা করে। সেইজন্য লক্ষ্য ক'রবেন ওই কথাটা ওঁর—পড়াশুনোটা তাঁর পেশা নয় কাজ। আমাদের পড়াশুনোটা ত সত্যিই পেশা—পেশা কখনও সত্যিকার কাজ নয়।

ডাঃ সেন কথাটাকে ঠিক সমর্থন করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন— না, ওটা ওঁর ঠিক মত নয়; তা হ'লে প্রথম দিনেই এমন কথা ব'লতেন না। অধ্যাপকগণ যে বিজ্ঞ একথা সকলেই স্বীকার করে। উনি করেন না—তার অর্থ এই যে ফার্স্টক্লাশ হ'লেই সে বিদ্বান হয় না, ব্যক্তিগত পড়ার গণ্ডী বড় হওয়া চাই—অর্থাৎ Gamut of Study wide হওয়া চাই। এ কথার ত প্রতিবাদ করা যায় না—অনেক লোক ডিগ্রি বিনাও যথেষ্ট বিদ্বান কিন্তু তাঁরা অধ্যাপক হ'তে পারেন না।

মিঃ লাহিড়ী বলিলেন—ও কিছুই নয়। ভদ্রলোক একটু বাতিকগ্রস্ত, মানুষকে গালাগালি করা স্বভাব, কাজেই পরের অতিথি হওয়া ছাড়া পথ নেই। ভদ্রলোক জীবনে হয়ত ব্যর্থ হয়েছেন তাই দুঃখবাদী—আমরা দেখেছি কিনা সিনেমায় যারা অভিনেতা, কি পরিচালক হতে পারেন নি তাঁরাই সবচেয়ে কড়া সমালোচক। অথবা যে সাহিত্যিকের গল্প পরিচালকরা মনোনীত করেন নি তাঁরাই সিনেমাকে ভয়ঙ্কর গালাগালি করেন।

ডাঃ হালদার বলিলেন—যাই হোক্‌, কিছুই বোঝা গেল না। কথায় মনে হয় সত্যই বিচক্ষণ অথচ বলেন, বই সব পুরোনো পাঁজি—

লাহিড়ী বলিলেন—হ'তেও পারে, ওটা একটা শো। অনেকে ত দামী বই হাতে ক'রে ঘুরে বেড়িয়ে বিজ্ঞ প্রতিপন্ন হ'তে চেষ্টা করে।

আদিত্যবাবু বলিলেন—যদি তাই কেউ করে সে কি তা ব'লতে পারে?

ডাঃ হালদার প্রতিবাদ করিলেন—না না না, ওটা কল্পনার বাইরে।

ডাঃ দত্ত পুরাতন সূত্র ধরিয়া কহিলেন—দেখুন, শিক্ষিতা মেয়েরা যে সত্যিই

শিক্ষিতা নয় একথা কিন্তু উনি বলে গেছেন—বেশ একটা খোঁচা ওই দিকে লক্ষ্য করে।

ঘোষ বলিলেন—বিয়ে না ক'রেও লোকটা ইন্‌সিওর ক'রেছে এটা কিন্তু আশ্চর্য !

আদিত্যবাবু প্রশ্ন করিলেন—আপনি কত ক'রেছেন ?

—আমি সামান্যই ক'রেছি, হাজার পাঁচেক, তবে স্ত্রীর নামে হাজার বিশ আছে, কারণ আমি মারা গেলে তাদের যাতে অসুবিধে না হয় তার জন্যে—ধরুন পলিশি পেড আপ ক'রে দিলেও টাকাটা পাবে।

চন্দনা চুপ করিয়াছিল। সে কিছুক্ষণ পরে কহিল—আর যাই হোক উনি কিন্তু অদ্ভুত। অমনি লোক দেখ্‌লে কিন্তু আমার ভয় করে।

*

হরিচরণ মেসের দ্বিতল হইতে চাকরের উদ্দেশ্যে চ'ৎকার করিয়া কহিল—কই রে ভগ্না চা দিলি না ! রবিবারের সকালে চা'র আবির্ভাবের সময় স্থির থাকিত না, কাজেই বুদ্ধিমান চাকরেরা দু'চার কাপ চায়ের আদেশ একসঙ্গে না হইলে কেহ দোকানে যাইত না।

হরিচরণের বন্ধু আসিয়া কহিল—কি হে হরিদা, আর এক কাপ ব'লে দাও।

গরম বেগুনী ও মুড়িসহ আড্ডা চলিতে চলিতে হরিচরণ চা'য়ের জন্য আর একবার তাগিদ দিল। বন্ধুবর নরেশ কহিল—দাদা, তপতী তোমার সঙ্গে যেচে আলাপ ক'রলে, ব্যাপারটা কি বল ত ? মন্ত্রতন্ত্র জানো ? ওর কাছে ঘেঁষতেই যে ভয় পাই।

হরিদা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কহিল—কি জানি ভাই। ও যেন খেলাতে চায় ব'লে মনে হয়, তোমাদেরও—আমাকেও। আমার মত কার্তিক পুরুষকে ও যে ডেকে আলাপ ক'রলে তার মধ্যে একটা ঔদ্ধত্য র'য়েছে দেখেছ ! তোমরা থাকতে আমাকে যেন ও কৃপা ক'রতে চায়—কারণ আমি কুৎসিত।

—কিন্তু—

—কিন্তু-টিন্তু নেই ভাই। বিয়ে ক'রেছিলাম, বৌ পর্যন্ত তিনবেলা কুৎসিত বলে ঘেন্না করে। আর তপতী আমার প্রেমে পড়বে এইটে আজ বিশ্বাস ক'রতে বল ?

—কিন্তু অঘটনও ত ঘটে!

—সেটা আমার বরাতে ঘটবে কেন? তোমাদের ঘটুক—তবে আর বোধহয় কিছু ব'লবে না এমনি কটু কথা বলেছি।

হরিচরণ সংক্ষেপে তাহাদের পরিচয়ের ইতিহাস বিবৃত করিয়া কহিল—এর পরে আত্মসম্মানবোধ থাকলে ও আর নিশ্চয়ই কথা বল্‌'বে না।

—ওর বেশভূষা দেখে যেন মনে হয় গরীবের মেয়ে। কেরানী কি মাস্টার-ফাস্টারের মেয়ে হবে, কিন্তু চেহারায় বেশ একটা আভিজাত্য রয়েছে। গোবরের পদ্মফুল—মনে হয় যেন আগুন, কাছে গেলে আঁচ লাগবে।

হরিচরণ পরিহাস করিল—আমি ভিজে কয়লা, ধ'রবে না। একে এই চেহারা, তারপর বিবাহিত। তোমরা বারুদের মত, চট ক'রে ধ'রে যেতে পারো। দূরে থাকাই ভাল।

নানারূপ পরিহাসের পরে নরেশ চলিয়া গেল; কিন্তু তপতীর প্রসঙ্গটা হরিচরণের অন্তরের একটা শিরা ধরিয়া যেন ঝুলিতে লাগিল। এত থাকিতে তপতী তাহাকেই বা ডাকিয়া কথা বলিল কেন? যদি কেবল কৃপাই হয়, কেবল খেলাইয়া রুধিরাক্ত করিবার কামনাই হয় তবে ত প্রথম দিনের সেই জবাবটি যথেষ্ট ছিল—তাহার এ প্রবৃত্তিকে নষ্ট করিবার জন্যে; কিন্তু তাহার পরেও সেদিন কেমন স্মিতহাস্যে সে তাহাকে পাশে বসিতে আহ্বান করিল। তাহাকে কি সে ভালবাসিতে পারে!

একটা সংশয় ও আশা তাহার মনটাকে উদ্বেলিত করিয়া দেয়। তাহার চলিবার ছন্দ, তাহার দেহের অবয়ব যেন ঠিক তাহার মনের মত। এমনি একটা সুন্দর মেয়ে যেন হরিচরণের কল্পলোকে রঙীন মেঘের মত খেলা করিয়া বেড়ায়। ঘরে যে বিবাহিত স্ত্রী, সে যেন মর্ত্যের একটা মেয়ে, যার মাঝে চাহিবার কিছু নাই।

সোমবারে হরিচরণ প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশ করিতে একটা দুর্ঘটনা ঘটাইয়া ফেলিল। অসাবধানতাবশত খানিক গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড তাহার হাতে পড়ে, একটা অ্যাল্‌ক্যালি দিয়া আপাতত সে সেটাকে নষ্ট করে বটে, কিন্তু হাতের উপরে একটা অংশ বেশ পুড়িয়া যায়। হাতটা জ্বালা করিতেছিল।

হরিচরণ তবুও দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া বিড়ি খাইতেছিল—তপতী আজ আসিতে যেন বড় বিলম্ব করিতেছে। সে মনে মনে আশা করিয়াছিল তপতী

হয়ত আজও ডাকিয়া একটা কিছু প্রশ্ন করিবে এবং স্মিতহাস্যে তাহার সকল কটু মন্তব্যকে মার্জনা করিয়া যাইবে।

তপতী আসিল কিন্তু কিছু না বলিয়াই আজ সে সামনে থামা ট্রামটায় উঠিয়া বসিল। হরিচরণ ট্রামে না যাইতে পারিত এমন নয় কিন্তু সে আজ ইচ্ছা করিয়াই উঠিল না।

ট্রাম ছাড়িয়া দিল। হরিচরণ আপনার মনে একটা অজ্ঞাত বেদনা অনুভব করিল—হয়ত ও অপমানিত বোধ করিয়াছে, হয়ত কৌতুকের প্রয়োজন ফুরাইয়াছে, হয়ত বা আরও কিছু। যাহাই হউক, সে বিবাহিত, এসব দিয়া তাহার কি প্রয়োজন! কোন মেয়ে যদি একদিন কথা বলিয়া আর না বলে তাহাতে অভিযোগ করা যায় না, কেহ ভালবাসিল না বলিয়া তাহার উপর রাগ করা চলে না।

হরিচরণ খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলিল—কিন্তু মনের মধ্যে একটা আর্দ্র বিষণ্ণতা যেন বাদল দিনের বাতাসের মত হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে। এই সামান্য চলিয়া যাওয়াটা যেন তাহাকে বড়ই দুঃখ দিয়াছে। সে আপনারে ধিক্কার দেয়—একটা অদৃশ্য শক্তি যেন তাহার মনকে ক্রমাগত টানিয়া হেঁচড়াইয়া ওই মেয়েটির পদপ্রান্তে লইয়া ফেলিতেছে। যাতনায় চীৎকার করিবার শক্তিও যেন তাহার নাই।

হরিচরণ চলিতেছিল—কিন্তু চোখ দু'টি তাহার তীব্র অভিমানে বারবার সজল হইয়া উঠিতেছিল। খঞ্জ শ্রীহীন লোকটিকে এমনি কৃপার ব্যঙ্গ করিবার কি প্রয়োজন ছিল! যদি উপেক্ষা করিবে তবে এমনি অযাচিত করুণার কি প্রয়োজন হইয়াছিল!

তপন কলেজ যাইবার পূর্বে তৈয়ারি হইতেছিল—চাকরকে গাড়ি বাহির করিতে বলিয়া দিয়াছে, উপর হইতেই সে লক্ষ্য করিল গাড়ি যথাস্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

তাহার মা দরজার সামনে দিয়া চলিয়া গেলেন। মনে হইল যেন চোখ মুছিতে মুছিতে গেলেন। তপনের আজ অকস্মাৎ মনে হইল—সে জীবনে তাহার মাতাকে কোনদিন হাসিতে দেখে নাই। সামান্য যাহা দেখিয়াছে তাহাও

অত্যন্ত ম্লান ও বেদনার্ত হাসি মাত্র। তপন ভাবিয়া দেখিল, এত অর্থ, এত প্রাচুর্য, পুত্র, কন্যা, স্বামী সমস্ত থাকিতে তাহার জীবন এমন দুঃখময় হইল কি করিয়া। মনে মনে তাহার রাগ হয়—বাবা নিশ্চয়ই বাক্যে ও কার্যে তাহাকে এমন লাঞ্ছনা দেন, যাহাতে তিনি হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছেন—সব থাকিয়াও তাঁহার কিছু নাই। তাঁহাকে লইয়া দূরে কোথাও চলিয়া গেলে হয়ত তিনি সুখী হইবেন; কিন্তু কাঁদিতে কাঁদিতে যাওয়া—অব্যক্ত একটা যাতনায় কাঁদিতে কাঁদিতে গেলেন যেন? বাবা হয়ত লিলিপুট বা অমনি কোন সম্বোধনে তাঁহাকে পীড়া দিয়াছেন।

তপন কলেজে গেল।

কলেজে আজ একটা সভায় 'সাহিত্য-চক্র' সৃষ্টির জন্যে চেষ্টা হইতেছিল। কোনও অধ্যাপক বলিলেন—প্রত্যেক শ্রেণী হইতে দুইজন করিয়া সদস্য লইয়া একটি কার্যকরী সমিতি হউক। তাহাদের মধ্যে সম্পাদক ও সহসম্পাদক নির্বাচিত হউক—তাহারাই সমস্ত কার্য পরিচালনা করিবে। সেইজন্যে সদস্য নির্বাচনের জন্যে প্রস্তাব হইল।

তপনের রেঁস্তোরা-সেবা ও মোটর হাঁকানো বৃথা হয় নাই। তাহার নামই প্রস্তাবিত হইল—কিন্তু ভোট গ্রহণের সময় সে আশ্চর্য হইয়া গেল, রেণুকা ও মণিকাই সর্বাগ্রে হাত তুলিল। মাহিলাদিগের পক্ষ হইতে রেণুকা নির্বাচিত হইল।

তপন উঠিয়া দাঁড়াইয়া সবিনয়ে কহিল, আমাকে নির্বাচিত করায় আনন্দিত হইয়াছি সন্দেহ নেই কিন্তু এ পদের জন্যে আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য। সাহিত্য-আদি ব্যাপারে আমার এমন কোন বিশেষ বিজ্ঞতা নাই।

অধ্যাপক টিপ্পনী করিলেন—সাহিত্যের বিজ্ঞতার কোন প্রয়োজন নাই, 'সভা-সংগঠন শক্তি থাক্‌লেই যথেষ্ট।

সকলের করতালির মধ্যে তপন লজ্জিতভাবে বসিয়া পড়িল।

সভান্তে সম্পাদক ও সহসম্পাদক নির্বাচনকালে তপনকেই সহ-সম্পাদক নিযুক্ত করা হইল। সকলে বাহির হইয়া আসিতেছিল, সিঁড়ির মাঝে রেণুকা তপনের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া কহিল—আপনি ত ভয়ঙ্কর র‍্যাশ ড্রাইভ করেন অথচ সাহিত্য দেখলে এত ভয় পান কেন?

তপন ব্যঙ্গ করিল—মানুষকে মোটর চাপা দেওয়া সোজা কিন্তু বাক্যে চাপা দেওয়া বড়ই কষ্টসাধ্য—সেইজন্যেই।

মণিকা তাহাদেরই পাশে পাশে যাইতেছিল, সে কহিল—চাপা ক'টা দিয়েছেন ?

—দেব দেব করি কিন্তু পারি না। যাক্, অন্য যা হয় সব ক'রতে পারবো কিন্তু দেখবেন প্রবন্ধ কি গল্প-কবিতা পাঠ করতে অনুরোধ ক'রবেন না। তা হ'লে কলেজই ছেড়ে দেব।

রেণুকা স্মিতহাস্যে কহিল—এত ভয় !

—হ্যাঁ, নইলে তিন বছর কলেজ ক'রছি অন্তত একবার ত পরীক্ষা দিতাম।

মণিকা তাহার প্রশান্ত আঁখি দুইটির বিলোল একটা কটাক্ষে তপনকে পরিহাস করিল—পাশকরাটা ত আপনার প্রয়োজন নয়, কলেজে আসাটাই প্রয়োজন।

তপন স্বীকার করিল—হ্যাঁ, একথা স্বীকার ক'রতে লজ্জা নেই।

রেণুকা কাজের কথা পাড়িল—যাহোক, এখন একটা সভা বেশ জমিয়ে দিয়ে, সাহিত্য-চক্রকে জোর দিতে হয়। বড় একজন সাহিত্যিক পাকড়াও ক'রে এনে একটা বৈঠক দেওয়া দরকার।

—হ্যাঁ, ওটা আপনারা ক'রবেন। আপনারা গেলে কেউ না বলবে না, অন্য যা হয় আমি করবো। ধরুন বেঞ্চি চেয়ার সাজানো, ঘর সাজানো বা তাঁকে আনা, পৌঁছে দেওয়া।

মণিকা বাধা দিল—কিন্তু অমন ক'রে মোটর চালিয়ে শেষে তাঁকে মারবেন ?

—ওরা ত মরা মানুষ ওদের আবার মারবো কি ? সংসারের সবক্ষেত্রে পরাজিত হ'য়ে ত লোকে গল্প লেখে—নইলে একটা একটা অক্ষর সাজিয়ে ৩০০। ৪০০ পৃষ্ঠা কেউ লিখতে পারে ?

তপনের রসিকতায় সকলে হাসিয়া উঠিল।

সেদিন বাড়ি আসিয়া তপন বেশ একটা অনাস্বাদিত-পূর্ব সুখাবেশ অনুভব করিতেছিল ; রেণুকা যেমন সুন্দর, তেমনি সাবলীল তাহার স্বভাব, কোথায়ও যেন সবলতা ও সরলতার অভাব নেই। যেমন বীরাঙ্গনা সুলভ দেহ, তেমনি স্বাস্থ্য—দীর্ঘদেহ অথচ সুন্দর, স্বাস্থ্যবতী অথচ অপ্রয়োজনীয় মেদের ভারে বেমানান নয়। অমনি হইলে তবে তাহার এই গৃহে—জমিদার গৃহিণীরূপে মানায়।

মণিকা ক্ষুদ্র—দেহ যতটুকু না হইলে নয় ততটুকু। ম্লান স্মিত হাসি—অনেকটা তাহার মায়ের মত। আড়ম্বর নাই, অথচ একটা আভিজাত্য আছে; স্বভাবে, কথায় কোথায়ও আড়ষ্টতা নাই বা প্রগল্‌ভতাও নাই। মণিকা যেন তাহার পিতার পোষা কাঠবিড়ালীর মত—চপল, সুনিপুণ, দ্রুত, চকিত, সুন্দর।

মোক্ষদা আসিয়া কহিল—দাদাবাবু, চা।

—চা!

—হ্যাঁ, কেন আশ্চর্য হ'লেন নাকি? আমাকে বলেছেন, তাই এনেছি।

তপন একটু হাসিয়া কহিল—বিছানাটা ঝেড়েছিলে? এটায় যেন বালি কিচ্ কিচ্ করছে।

—এই ত এখুনি ঝেড়ে দিয়ে গেলাম। আপনি চা খান, আমি আবার ঝেড়ে দিচ্ছি।

তপন চেয়ারে বসিয়া চা খাইতে আরম্ভ করিল। মোক্ষদা অত্যন্ত যত্ন সহকারে শুভ্র চাদরখানি নিখুঁতভাবে বিছানায় পাতিতেছে।

মোক্ষদার বর্ণ একটু কালো হইলেও দেখিতে মন্দ নয়। তপন চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল—ওর কাজকর্ম চলন ও কথার মাঝে বেশ একটা অনাড়ম্বর হৃদ্যতা আছে যাহা সহজেই মানুষকে আপনার করিয়া দেয়। ওর দেহটিও মণিকার মত স্বল্প, তাহার মায়ের মত ক্ষীণ। তপন পরিহাস করিল—মোক্ষদা, তোমার সঙ্গে আর ওই কাঠবিড়ালীটার সঙ্গে তফাৎ কি?

মোক্ষদা হাসিয়া ফেলিয়া কহিল—ও—মা, সবখানিই তফাৎ!

—তফাৎ এই যে ওটা কাঠবিড়ালী আর তুমি মানুষ।

মোক্ষদা কৃত্রিম বিস্ময়ে ও পরিহাস পুষ্ট চাহনিতে কহিল—তা হ'লে আর একরকম হ'ল কোথায়?

তপন হাসিয়া বলিল—ওর স্বভাব, আর তোমার স্বভাবে—

মোক্ষদা ছিছি করিয়া হাসিয়া কহিল—গালাগালি দিলেন বুঝি? উত্তরের কোন অপেক্ষা না করিয়াই মোক্ষদা চলিয়া গেল।

তপন মোক্ষদার প্রস্থানটা দেখিয়া আপন মনেই যেন খুশি হইয়া হাসিতে লাগিল।

মানবেন্দ্র একাকী ঘরের মাঝে বসিয়াছিল—আদিত্যবাবু তাঁহার চিড়িয়াখানা পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। মানবেন্দ্র যে একেবারে নির্বিকারচিত্তে বসিয়াছিল এমন নয়, মনে মনে বৈকালিক চা-এর প্রতীক্ষা করিতেছিল। দিবানিদ্রার পরে নেশাটা যেন চাপিয়া বসিয়াছে।

আজ চা লইয়া আসিল—তপতী নিজে। হাসিয়া প্রশ্ন করিল—আসতে পারি!

—আপনি ব্যতিরেকে ত আর চা প্রবেশ ক'রবে না। অতএব আসুন।

—আমার চেয়ে, চা-কাপের মূল্য বেশি হ'ল আপনার কাছে?

—আপাতত, কারণ মনে মনে ওইটাই চাইছিলাম। জিনিসের দাম প্রয়োজন বোধে—এখন প্রয়োজনটা ওরই সমধিক।

তপতী কহিল—একটু মনরাখা কথা ব'লেও কি খুশি ক'রতে পারতেন না?

—মনরাখা বুঝে ফেললেই ত আর খুশি হতেন না।

চা পানান্তে মানবেন্দ্র কহিল—এত কষ্টে চা ব'য়ে এনেছেন কেন তা আমি জানি। আমার সম্বন্ধে ভয়ঙ্কর একটা কৌতুহল হয়েছে—না?

তপতী স্বীকার করিল—কার না হয় বলুন? আপনার চাল-চলন কথাবার্তা সবই যেন কেমন অদ্ভুত। কেনই বা এমনি ভাবে আমাদের এ আতিথেয়তার সুযোগ দিলেন?

মানবেন্দ্র খানিক হাসিয়া লইয়া কহিল—ভাষাটা বড্ড পেঁচানো হ'ল! সোজা ক'রলে হয় এমন আশ্রয় নিলেন কেন? কিন্তু যাক আপনার কৌতুহল চরিতার্থ ক'রবার চেষ্টা করি, বলুন।

তপতী কৃত্রিম অভিমানে বলিল—অমনি ক'রলে কি জিজ্ঞাসা করা যায়? আচ্ছা, আপনি কতদূর পড়েছেন—মানে, ইউনিভার্সিটি এডুকেশন?

—এম, এ, পর্যন্তই।

—চাকুরি করেন না কেন?

—থাকে না।

—কেন?

মানবেন্দ্র একটু হাসিতে চেষ্টা করিয়া কহিল—যখনই বুঝতে পারি যে

আমাকে আমার চেয়েও বড় মুর্খের অধীনে চাকুরি ক'রতে হ'চ্ছে, অমনই আর চাকুরি করা চলে না—বিদ্রোহী হ'তে হয়—চাকুরি যায়।

—বিয়ে করেছেন?

—হয়নি অর্থাৎ আমাকে কেউ বিয়ে করতে রাজি হয় নি।

—কেন?

—সম্ভবত চাকুরি থাকে না ব'লে। মানবেন্দ্র তপতীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিটি এমন তির্যক যে তপতীর সন্দেহ হইল যে, লোকটি নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলিতেছে। তপতী তাই অনুনয় করিয়া কহিল—না না, সত্যি ক'রে বলুন।

মানবেন্দ্র গম্ভীর ভাবে বলিল—মিথ্যা কথা আমি বলি না।

—আপনার আর কে-কে আছেন?

—কেউ নেই। ছিলেন কিন্তু এখন সবই স্বর্গে, বাবা মা ভাই বোন সব।

—এত সমস্ত বই কিসের?

মানবেন্দ্র কহিল—ঐ প্রশ্নের জবাবটা পাবেন না। আর ও সমস্ত বই দেখতেও চেষ্টা ক'রবেন না। ওর মধ্যে যাবতীয় রকমের বই আছে।

তপতী যেন অনেকটা মরিয়া হইয়া প্রশ্ন করিল—বিয়ে করার প্রয়োজন বোধ করেন নি? ইচ্ছাও করেন নি কোনদিন?

—হ্যাঁ, যেমন একটা রাজা হওয়ার ইচ্ছে করেছি, প্রয়োজন বোধ ক'রেছি কিন্তু তা হয় নি। আচ্ছা এবার আমার পালা, আমি প্রশ্ন করি?

—হ্যাঁ।

—আপনি অত্যন্ত সাদাসিধে ভাবে কলেজে যান কেন?

—ভাল লাগে।

—কেন ভাল লাগে জানেন?

—না।

—আপনার মধ্যে আভিজাত্যের স্পর্ধা সবচেয়ে বেশি সেই জন্যেই। সেই জন্যেই আমার আত্মগোপন ব্যাপারটায় আপনার কৌতূহল সবচেয়ে বেশি।

তপতী উদাস ভাবে জবাব দিল—হয় ত হতে পারে। অতটা ঠিক বুঝি না।

—ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করেন?

—না, একজনের সঙ্গে আলাপ করেছিলাম একদিন; ছেলেটি কুৎসিত কদাকার, রোজই ট্রামের স্টপের কাছে দাঁড়িয়ে বিড়ি খায়।

—তার কি একটা ঠ্যাং খোঁড়া আছে?

তপতী আশ্চর্য হইয়া বলিল—হ্যাঁ, আপনি জানলেন কি ক'রে? এমন নেংচে হাঁটে দেখলে হাসি পায়!

. মানবেন্দ্র হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—সে যেন ব্যাপারটার সবখানিই বুঝিয়া ফেলিয়াছে।

তপতী অপ্রস্তত হইয়া কহিল—অমন হাসছেন যে! এমন কি হ'ল? এর মানে?

মানবেন্দ্র পরিহাস করিল—হ'ল না কিছুই, কিন্তু লোকটির হাঁটাটা কল্পনা ক'রেই হেসে উঠলাম। একদিন নিয়ে আসবেন, আলাপ ক'রবো।

—ছিঃ তাকে কি বাড়িতে আনা যায়? সে একেবারে কদাকার।

—হোক্, আমিও ত এমন সুপুরুষ নয়। স'য়ে যাবে আস্তে আস্তে। আপনারা যাকে ভালবাসেন তার নিন্দা না ক'রে জলগ্রহণ করেন না। তাইত সন্দেহ হয়—মানবেন্দ্র হাসিয়া উঠিল, তপতী বিমূঢ়ের মত ক্ষণিক বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া আসিল।

*

সন্ধ্যায় সেদিনও যথারীতি আড্ডা বসিয়াছিল।

মানবেন্দ্র আজ পূর্ব হইতেই একটা চেয়ার দখল করিয়া বসিয়াছিল। আজকার আড্ডায় প্রথমত ডাঃ বিশ্বাসই তাঁহার মন-বিজ্ঞানের কথা আলোচনা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন—হিস্টিরিয়া, ম্যানিয়া, অবসেশন প্রভৃতি যে সব রোগ আমরা সাধারণত দেখতে পাই, এ গুলি মানসিক ব্যাধি, একটু চেষ্টা করলেই সারানো যায়। কতকগুলো রুদ্ধকণ্ঠ আকাঙ্ক্ষা মনের মাঝে এই ব্যাধির সৃষ্টি করে—ধরুন—

ডাঃ দত্ত একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিলেন—হ্যাঁ, তবে সেটা আপনাদের দ্বারা হয় না, আমাদের দ্বারা কিছু আয়াসে আরোগ্য হয় বটে—

ডাঃ বিশ্বাস যেন একটু ভীতভাবে এদিক ওদিক চাহিয়া দরজাটা দেখিয়া লইলেন, সেটা দেওয়া আছে কিনা, অদূরে মিঃ ঘোষের ব্যাগটিও নাই—

তিনি একটু শান্ত ভাবে বলিলেন—হ্যাঁ, আপনারা পারেন কিন্তু আরোগ্য করতে নয় সৃষ্টি করতে। পাশবিক তথা আসুরিক চিকিৎসায় সেটাকে বাড়াতে পারেন। আপনারা—

ডাঃ দত্ত বলিলেন—হ্যাঁ, ডাঃ বিশ্বাস। যেখানে স্বামীটি যৌন ক্ষমতাশালী এবং বুদ্ধিমান সেখানে ও সব হয় না। আপনাদের আজগুবি গল্পটল্প সব রেখে দিন।

—হ্যাঁ তাও হয়। সেক্স ছাড়াও অন্য কারণ থাকতে পারে, অন্য অ্যাসোসিয়েশনের ফলে sex complex জুটতে পারে।

ডাঃ দত্ত নিজে অনেকটা যেন উদ্বেগের সঙ্গেই বলিলেন—তিন দিন চিকিৎসায় সব সারানো যায়। কত কেশ্ দেখ্লাম—

ডাঃ বিশ্বাস যেন থতমত খাইয়া চুপ করিলেন। মানবেন্দ্র টিপ্পনী করিল—ডাঃ বিশ্বাস চুপ করলেন যে! প্রতিবাদ ক'রে ওঁকে বোঝাতে পারবেন এমন নয় তবে আপনার মতটা ফেঁসে যাচ্ছে কিন্তু—

বিশ্বাস দরজার দিকে একবার তাকাইয়া বলিলেন—গেলে নাচার, যাঁরা মন-বিজ্ঞান জানেন না তাঁরা অবিশ্বাস করতে পারেন, সেটা কিছুটা স্বাভাবিক—

মানবেন্দ্র কহিল—কিন্তু দুই একটি মত বিশ্বাস করা যে মানুষের প্রয়োজন সেটা জানেন ত। যেমন কেউ বিয়ে ক'রতে চায় না, তার একটা ফিলজফি আছে যে ওটা করা সঙ্গত নয় কারণ যাই হোক্—

মিঃ লাহিড়ী বলিলেন—কথাটা ঠিক অমনি নয়। কারণ বিচার ক'রেই মানুষের ফিলজফি ঠিক হয়। আগে গোড়া পরে আগা—

মানবেন্দ্র কহিল—ওটা একেবারেই ভুল। মানুষ নিজের সুবিধে মত ফিলজফিটা আগে ঠিক ক'রে নেয় তার পরে ভেবে চিন্তে যুক্তি বের করে। কোন ফিলজফারই তাঁদের নিজের ফিলজফিতে বিশ্বাস করেন না।

ডাঃ হালদার বলিলেন—বলেন কি? তা না হ'লে কি তাঁরা এই নিয়ে পড়ে থাকতে পারেন? আমার ফিলজফিতে আমি বিশ্বাস করি না।

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। মনের পরিতৃপ্তির জন্য ওটি বিশ্বাস ক'রতে চান, ক'রলে খুশি হন কিন্তু তা করা হয়ে ওঠে না।

মিঃ লাহিড়ী বলিলেন—আমি যেমন বিয়ে করাটাকে অস্বাভাবিক বলে মনে করি, তা বিশ্বাস করি এবং সেই জন্যেই বিয়ে করি নে।

মানবেন্দ্র হাসিয়া কহিল—ভুল। আপনি বিয়ে করতে সুযোগ পান নি, তথা বিবাহিত জীবনের থেকে বঞ্চিত বলেই ওই বিশ্বাসটা করতে চান কিন্তু ওটা বিশ্বাস করেন না। যদি ক'রতেন তবে তা কারণ দিয়ে বোঝানোর প্রয়োজন থাকতো না।

ডাঃ হালদার বিস্মিত হইয়া বলিলেন—এই যে আমি মনে করি, মানুষ কল্পনাকে চায়, ব্যক্তিকে ভালবাসে না। সেই জন্যেই পৃথিবীতে সকলেই কল্পলোকে ব্যভিচারী এটা কি ভুল? সে জন্যে ত কারও দোষ দেওয়া যায় না—মানুষের স্বভাবই এই—

মানবেন্দ্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডাঃ হালদারের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—আপনার পরিবার যদি ঠিক এমনি স্বভাবের হ'ন তবে কি সেটা আপনি বিশ্বাস ক'রতে পারেন?

—কেন নয়? মানুষের স্বভাবই এই যখন, তখন তা নিয়ে অভিযোগ করা চলে না।

মানবেন্দ্র কহিল—আপনি সাংঘাতিক লোক। খুনও আপনি করতে পারেন—আপনার ফিলজফিতে যারা বিশ্বাস করে তারা হয় খুনে, নয় পাগল।

ডাঃ বিশ্বাস বলিলেন—হ্যাঁ, কথাটা সত্য। ফিলজফিটা হচ্ছে ঐ রুদ্ধকণ্ঠ আকাঙ্ক্ষার ক্রিয়া তাই সেটা আগে হয়, কারণটা জোটে পরে।

ডাঃ সেন চিন্তা করিয়া কহিলেন—আমি যে হিন্দু আদর্শ, হিন্দু নারীর পবিত্র গৃহ ও আত্মত্যাগ, স্নেহ, মমতা, মাতৃত্ব, পাতিব্রত্যকে শ্রদ্ধা করি, এটাও কি ভুল?

মানবেন্দ্র কহিল—ভুল নয়। বিশ্বাস ক'রলে খুশি হতেন কিন্তু পারেন না—কাজেই বর্তমান শিক্ষার নিন্দা করেন বটে কিন্তু তাকেই চান মনে মনে।

মিস্ বসু বলিলেন—আপনার কথাগুলো বড়ো হেঁয়ালীর মত শোনাচ্ছে। পরিষ্কার করে বলুন—ঠিক বুঝতে পারছি নে।

—কাব্যের টীকা করলে সেটা পাঠ্যপুস্তক হয়, কাব্য থাকে না। ওটা বুঝে দেখুন ঠিক পাবেন মনের মাঝে—বিনা কারণেই বিশ্বাস ক'রবেন।

মিস্ বসু বলিলেন—আপনি কি তা হ'লে বলতে চান ডাঃ সেন বর্তমান শিক্ষাকে গৃহে পান নি বলেই হিন্দু আদর্শের এত পক্ষপাতী?

মানবেন্দ্র একটু হাসিয়া কহিল—আপনি সেটা মনে মনে ভেবে দেখলেই

বুঝবেন। আপনি গুহ পান নি বলেই গুহার নিন্দা করেন এবং তার বিপরীত একটা ফিলজফি মনে মনে বিশ্বাস করতে চেষ্টা করেন।

গুরুভার আলোচনার অস্বস্তিতে ঘরখানা অকস্মাৎ যেন নিষ্প্রভ হইয়া গেল। কি যেন একটা দুর্ভাবনা সকলকেই অন্তর্মুখী করিয়া দিয়াছে। মানবেন্দ্রের অযৌক্তিক যুক্তিগুলি যেন অকস্মাৎ তাহাদের ভাববাজ্যের ভিত্তিভূমিকে ভূকম্পনে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

চন্দনা এতক্ষণ কেবল শুনিতেছিল। এতক্ষণ যে আলোচনা চলিতেছিল তাহার সবখানি সে বুঝিতে পারে নাই তবে এটুকু সে বুঝিয়াছিল যে আলোচনা গুরুতর এবং তাহার পক্ষে অনধিগম্য। সে প্রশ্ন করিল—যাদের ফিলজফি বলে কিছু নেই—তারা ?

—তারা ? আদি ও অকৃত্রিম আদিম-মানুষ। তারাই সত্যিকারের মানুষ কারণ তার মধ্যে দেহ ও মনে সংঘাত বাধে নি। মন ও সমাজের সঙ্গে কলহ হয় নি।

ডাঃ সেন এতক্ষণ চিন্তা করিতেছিলেন, তিনি সহসা একটা শ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া কহিলেন—মানবেন্দ্রবাবু, আপনার কথাটা বিশ্বাস ক'রতে পারলাম না বলে দুঃখিত।

মানবেন্দ্র সহাস্যে কহিল—বিশ্বাস যদি ক'রতেই পারবেন তবে বুঝতাম ত ফিলজফিটা আপনার ধার করা মুখস্থ বিদ্যা। ওটাকে প্রাণপণে আঁকড়ে থাকাটা আপনার প্রযোজন, কাজেই আমার কথা বিশ্বাস আপনি কিছুতেই করতে পারেন না।

চন্দনা কহিল—কিন্তু যারা ধরুন আর্টের পূজারী তারা ফিলজফিহীন ব্যক্তি কিন্তু তাই বলে কি তারা, অবশ্য আপনার মতে, আদিম মানুষ ?

—আদিম-মানুষ কি গিরিগুহায় ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখায় নি ? আর্টের পূজারী কথাটা শ্রুতিমধুর, ওর প্রকৃত অর্থ হল আত্ম-পূজারী অর্থাৎ আপনাকে তারা নানাভাবে পূজা করে, কেউ ছবি দিয়ে, কেউ রাজা সেজে। আপনি সিনেমায় অভিনয় করেন সেটা লাহিড়ীমশা'র জন্যে নয়; নামের জন্যেও সম্পূর্ণ নয় যতটা নিজেকে বড় ক'রে বিশ্বাস করবার জন্যে।

মিঃ লাহিড়ী একটু বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া বলিলেন—আর্ট শাশ্বত, চিরন্তন সেখানে নিজে নেই, থাকে না, সৌন্দর্যের মাঝে আপনাকে বিলিয়ে দেয়।

—তাইত, সৌন্দর্যের মাঝে আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে সুন্দর হ'তে চায়, সুন্দর অসুন্দর হয়ে ওঠে কিন্তু নিজে সুন্দর হয় না। সে যত কিছু পঙ্ক মেখে আবার মর্ত্যের ধূলায় নেমে আসে—যেমন এরোপ্লেন যতই উপরে উঠুক মাটিতে তাকে নামতেই হয় তেল ফুরিয়ে গেলে। উপরে উঠে পৃথিবীর মানুষগুলোকে পিঁপড়ের মত দেখে কিন্তু নেমে এলে দেখে তারা মানুষই আছে পিঁপড়ে হয় নি, এবং নিজেও বড় হয় নি, সমানই আছে, একটু পরিশ্রান্ত হয়েছে এইমাত্র।

চন্দনা কহিল—কিন্তু—

—না না, কিন্তু নেই মিস্ চন্দনা, ওটা স্বভাব, ওর বিরুদ্ধে যেমন লাহিড়ীও যেতে পারেন না, আপনিও পারেন না—যে স্বভাবগুণে লাহিড়ীমশায় বিয়ে ক'রতে পারেন নি।

চন্দনা অবান্তর প্রশ্ন করিল—আপনি বিয়ে করেন নি কেন ?

—হয় নি। স্বভাবগুণে করি নি এমন নয়।

ডাঃ হালদার চিন্তা করিয়া কহিলেন—কিন্তু আমার চিন্তাধারা, একি অযৌক্তিক, সত্য নয় ?

মানবেন্দ্র হাসিয়া বলিল—না ডাক্তার হালদার, অসত্য বলি নি, আপনি যদি বিশ্বাস করেন তবে সেটা অস্বাভাবিক ও দুর্দৈব হবে এই বলেছি।

ডাঃ হালদার মানবেন্দ্রের কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন—কিন্তু আপনি কি বলেন মানুষ যা চায় তা পৃথিবীতে পায়, তবে ত মনের মৃত্যু ব'লতে হবে। আপনি যা চেয়েছেন তা কি পেয়েছেন ?

মানবেন্দ্র একটু করুণা ভরা কণ্ঠে কহিল—যা পাওয়া যায় না তা আকাঙ্ক্ষা করাটা যেমন বেকুবী, আবার যা পাওয়া যায় তাকে না চাওয়াও তেমনি নিষ্ঠুরতা। কাজেই চাওয়া আর পাওয়ার মাঝে একটা সামঞ্জস্য না থাকলে, সেই ব্যবধানটা পূরণ করে আপনার ফিলজফি।

ডাঃ সেন অকস্মাৎ আনন্দিত হইয়া বলিলেন—হাঁ্যা তাই। সামঞ্জস্য—ঠিক। সামঞ্জস্য যেখানে নেই সেইখানেই গোলমাল—নইলে দিবারাত্রি যে সংসারে আমার অস্থিমজ্জা শোষিত ও নিষ্পিষ্ট হ'চ্ছে সেখানে এমন নির্বিকার ও পরিতৃপ্তির সঙ্গে পড়ে থাকা সম্ভব ছিল না।

মানবেন্দ্র হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া ডাঃ সেনকে অপ্রস্তুত করিয়া দিল, যেন তিনি একটা মিথ্যা কথা বানাইয়া বলিয়া ধরা পড়িয়া গিয়াছেন। সে

উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—হাঁ, অনেক আলোচনা হ'য়ে গেছে এখন উঠি মিঃ লাহিড়ী, মিস্ চন্দনা। সময়ান্তরে দেখা হবে। আশা করি আপনাদের নূতন ছবি দ্রুত এগুচ্ছে।

উত্তরের জন্য বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া মানবেন্দ্র চলিয়া গেল। মিঃ লাহিড়ী মানবেন্দ্রের হাসিটা নকল করিয়া উচ্চহাস্যে ঘরের লোকগুলিকে সচকিত করিয়া দিয়া বলিল—লোকটার কথার অর্থ হোক্ না হোক্ কথা বলার ভঙ্গিটা বেশ, শুন্‌লে মনে হয় যেন সত্যিই, কিন্তু—

ডাঃ হালদার বলিলেন—না না, যা বুঝি না, তাই অর্থহীন এমন নয়। কথায় বিরোধ থাক্‌লে হয় কি ভাবের বিরোধ নেই ব'ললেই চলে—এর গভীর তাৎপর্য আছে।

ডাঃ সেন বলিলেন—তা না হ'লে 'সীমার মাঝে অসীম তুমি' কি 'চোখের জল ফেল্‌তে হাসি পায়,' এসব কথাও ত অর্থহীন হ'য়ে দাঁড়ায়।

মিঃ লাহিড়ী তাচ্ছিল্যের সহিত বলিলেন—টীকা ভাষ্য না থাক্‌লে অনেক কবির নাম লুপ্ত হ'ত। আপনাদের টীকা ভাষ্য যাই হোক ওর কথা তার কাছা-কাছিও নেই জান্‌বেন।

ডাঃ বিশ্বাস হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—একটা কথা আমাদের শাস্ত্রে আছে, কালো মেয়েরাই অন্যের চেহারার সমালোচনা বেশি করে, কাজেই সমা-লোচনার আগে নিজেকে দেখতে হবে, বুঝি না বলেই অর্থ নেই এমন নয়। মন-বিজ্ঞান অনেকেই বোঝেন না তবুও অর্থ আছে, তাতেও রোগ সারে, ডাক্তাররা সারাতে পারেন না।

ডাক্তার দত্ত একটু বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া, টুপিটা হাতে লইয়া কহিলেন—আচ্ছা আসি, নমস্কার। একটা হিস্টিরিয়ার রোগী আছে দেখে যেতে হবে।

ডাঃ হালদার বাড়ির পথে ট্রামে উঠিয়া মানবেন্দ্রের কথাই ভাবিতেছিলেন—চাওয়া ও পাওয়ার মাঝের ফাঁকটুকু ভর্তি করে ফিলজফি—সত্যই কি তাই?

হালদার পঁচিশ বৎসর বয়সে প্রথম পত্নীকে হারান, তাহার পরে বছর সাত তিনি বিবাহ করেন নাই। যাঁহাকে হারাইয়াছেন তাঁহাকে যখন ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না তখন বিবাহ নিরর্থক, কিন্তু এমনি মানসিক অবস্থা ক্রমে পরিবর্তিত

হইয়া যায় এবং ফলে বত্রিশ বৎসর বয়সে পুনর্রায় বিবাহ করেন। সম্প্রতি দুইটি কন্যা ও একটি পুত্র। কন্যাটির বয়স বছর সাত হইবে।

ডাঃ হালদার দরজা উন্মুক্ত দেখিয়া একটু নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিলেন—উপরে যেন একটা আনন্দের কোলাহল শোনা যায়। তাঁহার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর কিন্তু আর এক ব্যক্তি কে এমনভাবে হাসিয়া যাইতেছে?

হালদার আরও একটু সতর্ক পদক্ষেপে দ্বিতলে উঠিয়া গেলেন—তাঁহারই চেয়ারে বসিয়া জনৈক ভদ্রলোক কি যেন অনর্গল বলিতেছেন এবং তাঁহারই স্ত্রী হাসিয়া বাড়ি মাথায় করিতেছে। ছেলেপুলেগুলো ঘুমাইতেছে।

তিনি দরজার কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়াইলেন, কিন্তু ভদ্রলোক কোন ক্রমেই বক্তৃতা বন্ধ করিলেন না, অবশেষে তিনি ঘরে ঢুকিলেন। ।র

হালদার-পত্নীর বয়স ছাব্বিশ হইবে কিন্তু সন্তানের জননী বলিয়া বোধ না এমনি সুন্দর তাঁহার দৈহিক গঠন। ভদ্রলোক হাত তুলিয়া বলিলেন—নমস্কার হালদারমশায়। আপনার জন্যে এত রাত পর্যন্ত বসে আছি। আপনাদের খোঁজখবর নিতে এসেছিলাম বিকেলে কিন্তু বিনু ত না খাইয়ে ছাড়লে না।

হালদার বলিলেন—এসেছেন ভাল, আপনার মামাত ভগ্নীকে দেখতে এসেছেন ওটা অত্যন্ত স্বাভাবিক কিন্তু ভগ্নীপতিকে এত খাতির না ক'রলেও ক্ষতি ছিল না।

ভদ্রলোক বলিলেন—কেন আমি কি খোঁজখবর নিই না, বরং আপনিই ভুলেও একবার আমাদের ওখানে যান না। আপনারা দার্শনিক, আপনাদের সাতখুন মাপ—যত দোষ আমাদেরই—

হালদার-গৃহিণী বলিলেন—তুমি কবে কার খোঁজ নিয়েছ বল? কলেজ, আড্ডা, আর বই, এছাড়া কি জগতে কিছু আছে? আমি না হলে তোমাকে না খেয়ে থাকতে হ'ত, যত টাকা রোজগার কর না কেন?

হালদার পরিহাস করিলেন—ভদ্রলোক, আপনিই বলুন, বিবাহের সময় উনি গালাগালি করবেন এমন কোন শর্ত ছিল কি আপনাদের সঙ্গে?

কিছুক্ষণ পরিহাস ও অবান্তর আলাপের পর ভদ্রলোক বিদায় লইলেন। হালদার আহারাদি শেষ করিয়া আসিয়া নিজের টেবিলটি সামনে করিয়া বসিলেন। সেখানে কয়েকটি পেটেণ্ট ঔষধ থাকিত, একটা সাধারণ টনিক আর একটা স্নায়ুশক্তিবর্ধক ঔষধ। হালদার যেন অনুভব করেন মানসিক পরিশ্রমের

ফলে তাঁহার একটু স্নায়বিক দৌর্বল্য ঘটিয়াছে, তাই তিনি ঔষধ দুইটি নিয়মিত ব্যবহার করেন। যথারীতি ঔষধপান করিয়া তিনি পত্নীর আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

সন্ধ্যার পরে ঐ সময়টা যে তিনি প্রায়ই থাকেন না তাহা জানিয়াই তাহা হইলে ওই লোকটি দেখা করিতে আসিয়াছে। তাঁহার সহিত দেখা করিবার অভিপ্রায় থাকিলে অবশ্যই সে অন্য সময় আসিত—ঘড়িতে দেখিলেন আজ একটু সকালেই ফিরিয়াছেন। যদি ঠিক সময়ে ফিরিতেন তবে দেখা হইত না; কিন্তু উনি যে প্রায়শই কুশল প্রশ্ন করিতে আসেন তাহা ত তাঁহার স্ত্রী কদাপি বলেন নাই···মানুষ যাহা পায় তাহা চায় না, নূতন করিয়া সে 'বতম বস্তুকে পাইতে চায় ইহাই মানুষের মনের ধর্ম···যে কল্পনাকে তাহারা আ তাহা পাওয়া যায় না, তাই সর্বত্রই তাহা মানুষ খুঁজিয়া বেড়ায়। আজ ড .র পত্নীর পক্ষে তাঁহাকে পাওয়া ত অবান্তর,—সে নূতন কোথায়ও আপনার জল নের মানুষটি খুঁজিয়া বেড়াইবেই। সমাজ, নীতি, শিক্ষা কিছুই সে মনের বাসনাকে রোধ করিতে পারে না।

হালদার উঠিয়া গিয়া দ্বিতলের ঝুলবারান্দায় দাঁড়াইলেন—এই স্থানটা হইতে একতলার রান্নাঘরের খানিকটা দেখা যায়। চাকরটা খাইতেছে—তাঁহার স্ত্রী দিতেছেন। চাকরটি যুবক, সে যেন হাসিযা হাসিয়া কি একটা গল্প করিতেছে অত্যন্ত আবদারের সুরে, তাঁহার স্ত্রী সেটা বেশ উপভোগ করিতেছেন।

হালদার বিশ্লেষণ করিলেন—তিনি সারাদিনের কর্মান্তে ফিরিয়াছেন, যদি প্রেম-প্রীতিপূর্ণ মানুষের মন একনিষ্ঠই হইত তবে ওর পক্ষে তাঁহার কাছে যত-শীঘ্র সম্ভব সকালে আসাই প্রয়োজন ও স্বাভাবিক ছিল। তাহার মাঝে চাকরের সহিত অকারণ গল্পে সময় কাটাইবার মত প্রবৃত্তি কেন হইবে? বয়সের পার্থক্য তাঁহাদের প্রায় পনর—তিনি বার্ধক্যের সীমায় উপনীত বলিলে ভুল বলা হয় না। তাঁহার অজ্ঞাতে তাঁহারই বিবাহিত পত্নীর অন্তরে কি অভাব সঞ্চিত হইয়া আছে তাহা কে জানে?

হালদার মনে মনে একটা অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন—কিন্তু কাহা-কেও ত দোষ দেওয়া যায় না, মানুষ যাহা পায় তাহাকে পথপ্রান্তে ফেলিয়া সে চলে আপনার কল্পনার পিছনে—পরশ-পাথর খুঁজিতে নুড়ি সংগ্রহ করিয়া স্তূপাকার করে।

হাল্দার আপনার চেয়ারে আসি।

সত্যই বেমানান।

তাঁহার স্ত্রী আসিলেন। হালদারকে গম্ভ।

—কোন মুখ ধ্যান করা হচ্ছে?

হালদার প্রশ্ন করিলেন—এত দেরি হ'ল যে?

—জগা তাদের দেশের গল্প ক'রছিল তাই দেরি হ'ল! রাত ৬

—আচ্ছা তোমার ও ভাইটি যে আসেন, খোঁজ খবর নেন তা'ত আমা

গৃহিণী একটু হাসিয়া বলিলেন—এই ত তিনমাস পরে আজ এল। খপর দিয়ে আনিয়েছি—তোমার সঙ্গে দেখা করানর জন্যে বসিয়ে রেখেছিলাম। অনেকদিন বাবার কাছে যাই নে, যদি রেখে আসতে পারে। তুমি ত আর নিয়ে যাবে না!

—কিন্তু উনি যে প্রায়ই আসেন ব'ললেন।

—বেশ! ঠাট্টাও বুঝলে না?

হালদার গম্ভীর হইয়া বলিলেন—দার্শনিকরা বিমনা হ'তে পারে কিন্তু বোকা নয়। সবাই সবাইকে ভালবাসতে পারে না তার জন্যে দোষ দেওয়া চলে না কাউকে—তোমাকেও দোষ দেব না, তবে গোপন ক'রে ত···

—ছিঃ ছিঃ! আবার তুমি ছাই ভস্ম বলতে শুরু ক'রলে? না না চুপ কর, ওসব শুনতে চাইনে কিছু।

—আচ্ছা, আমাকে একা ফেলে চাকরটার সঙ্গে গল্প ক'রে তুমি আরাম কেন পাও তা জানো? তার মাঝে একটা যেন পরিতৃপ্তি পাও—না?

গৃহিণী কাতর কণ্ঠে কহিলেন—তোমার পায়ে পড়ি। বিয়ের পরদিন থেকে একদিনও ত অমনি যা তা না ব'লে থাকতে পারলে না, কেন বলত? এতদিন যা হয় বলেছ, আজ তিন ছেলের মা, আজও বলবে—ছিঃ—

—মানুষ মানুষই, দেবতা নয়। তিন ছেলের মা'ও মানুষ, বালিকাও মানুষ, কোন প্রভেদ নেই, তাদের মন একই রকম বাধাবন্ধহীন।

—তোমার পায়ে পড়ি, লক্ষ্মীটি ওসব আর ব'লো না। কেন আমাকে কষ্ট দাও, নিজেও যা বিশ্বাস করো না—

হালদার ততোধিক গম্ভীর ভাবে বলিলেন—বিশ্বাস মানুষ ইচ্ছা ক'রলেই ক'রতে পারে না, হেতু ও যুক্তিতে তা বিশ্বাস করে—

ারে এত বিদ্যা, এত বুদ্ধি, এত যশ তাও

(কেন তোমার এ সন্দেহ হয়? সারা-

ন?

গ্রহণ করতে পারার মত নির্ভীকতা আমার আছে তাই

ৃহিণী স্বামীর পা দুইটি দুই হাতে ধরিয়া সকাতরে রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন

.র পায়ে পড়ি, এসব কথা বলো না, তোমার পাপ হয়। না হয় আমায়

করে দাও কিন্তু এসব কথা মুখে এনো না।

স্ত্রী অঝোরে কাঁদিয়া ফেলিলেন—হায় হায়! বিবাহের পর হইতে এত সেবা, এত যত্ন, এত ভালোবাসায়ও এই সামান্য মনের দীনতাকে জয় করিতে পারিলেন না! তাহার ত কোন ত্রুটি নাই, কোন পাপ নাই—

হালদার বিশেষ কিছু না বলিয়া শুইয়া পড়িলেন—গৃহ অন্ধকার। অন্যপ্রান্তে পুত্রকন্যা ও স্ত্রী শুইয়া রহিয়াছে। তিনি ভাবিলেন—মানুষের কামনার সীমারেখা ত ক্রমেই দিকচক্রবালের মত আগাইয়া যায়, কাজেই ক্ষুদ্রগৃহ, পুরাতন বহু পরিচিত স্বামী, তাহার মাঝে কি অনন্ত অম্বরে চির উড্ডীন মন পরিতৃপ্তি পাইতে পারে? ক্ষণিকের জন্য শ্রান্ত ডানা স্তব্ধ করিয়া বিশ্রাম করিতে থাকে মাত্র, কিন্তু সে আবার উড়িবেই আপনার পাখা বিস্তার করিয়া অনন্ত রামধনু আঁকা আকাশের বুকে।

তিনি জানিলেন না—অদূরে উৎসারিত অশ্রুস্রোতে উপাধান নিষিক্ত করিয়া দিয়া তাঁহারই স্ত্রী আপনার ভাগ্যকে ধিক্কার দিতেছে এবং বলিতেছে—এত বিদ্বান, এত বিখ্যাত, এত সুন্দর স্বামী, এত সুন্দর গৃহ যদি দিয়াছিলে বিধাতা, তবে কেন এইটুকু হইতে বঞ্চিত করিলে? তাহার গৃহ, তাহার আত্মসমর্পণ, তাহার ত্যাগ, নিষ্ঠা, ভালবাসা, পরিপূর্ণ জীবনতরী নিমজ্জিত শৈলশিখরে ঠেকিয়া বার বার এমন করিয়া নিমজ্জিত হইয়া যায় কেন? ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়া অশ্রু মার্জনা করিয়া শিশুপুত্রকে বুকের মাঝে টানিয়া লইয়া তিনি কেবল বলেন—ওর মনটা এমন হইল কেন?

ডাঃ সেন বাড়ি ফিরিবার পথে মানবেন্দ্রের অযৌক্তিক মতবাদের কথাই

ভাবিতেছিলেন—হিন্দু আদর্শ তথা সীতা সাবিত্রী রামলক্ষ্মণের আদর্শকে মনে মনে এত ভালবাসি তাহা কি সবই মিথ্যা! লোকটির কথা বলার এমন একটা ভঙ্গি ও ভাষা আছে যে তাহা অবিশ্বাস করা যায় না—কথাগুলি যেন প্রত্যক্ষ করিয়াই বলিয়াছে। আজকার এই গৃহ, এই অতি গ্রাম্য স্ত্রী ও অপগণ্ড শিশুগুলি লইয়া কি তিনি নির্বিবাদে বসবাস করিতে পারিতেন—নইলে মিস্ বসু কি অমনি কোন শিক্ষিতা মহিলাকে বিবাহ করা ত বিন্দুমাত্র কষ্টসাধ্য ছিল না...তাহাদের যৌবনে যে কলেজের মেয়েটি ঘুরিয়া বেড়াইত তাহাদের চোখে স্বপ্নের প্রলেপ বুলাইয়া, পরীক্ষায় ফার্স্ট হইবার পরে অন্তত তাহাকে বিবাহ করা হয় ত কঠিন হইত না। তবুও তিনি ত বাপ মায়ের পছন্দ ও কথামত ঐ মেয়েটিকেই বিবাহ করিয়াছিলেন এবং একনিষ্ঠ স্বামী হইয়া আনন্দেই কালাতিপাত করিতেছেন বলিতে হইবে—কলহ না হয় এমন নয় তবে তাহা অনিবার্য। ডাঃ হালদারের কথামত কোন মানসীর পিছু পিছু ছুটিয়া বেড়াইবার প্রলোভন ত তাঁহার সত্যই হয় না...তবে যাহারা শিক্ষিতা ও সুরুচিসম্পন্না মহিলা তাহাদের সহিত আলাপ-পরিচয় করা তাহার মধ্যেও ত একটা নিষ্কলুষ আনন্দ আছে!

ডাঃ সেন সযত্নরক্ষিত জলে হাতমুখ ধুইয়া, ঢাকা ভাত খাইয়া উঠিলেন। স্ত্রী প্রশ্ন করিলেন—সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ত?

—না, বেশ গরম আছে—হ্যাঁ গরম আছে বই কি!

—কেন শুধু শুধু রোজ রাত্রি কর। সারাদিন পরিশ্রম ক'রে বাড়ি এসে বিশ্রাম কর, তা নয় কেবল টৈ টৈ করে আড্ডা দেবে। ঠাণ্ডা ভাত খেলে অসুখ ক'রবে যে—এ ত কচি ছেলেও বোঝে।

—খাঁচার মধ্যে দিবারাত্রি থাকা যায়?

—বাড়িটা যে খাঁচা সে ত বিয়ের পর থেকেই দেখ্‌ছি। বাড়িটা গরম বোধ হয়, না? দুদণ্ড দাঁড়ালে গায়ে ফোস্কা পড়বে? কোথায় যাও তুমি?

—কেন আদিত্যবাবুর বাড়িতে।

—কি কর? গাল-গল্প ত—তার দরকার কি? কতকগুলো মেয়ে পুরুষে মিলে হিহি হাহা করা যে কি ফ্যাশনই হ'য়েছে তোমাদের! বুড়ো হ'য়েছ তা লজ্জাও করে না—যতই চেষ্টা কর, আমি থাক্‌তে আর এই ছেলেপুলে থাক্‌তে তোমার আর বিয়ে হবে না।

ডাঃ সেন বিস্মিত হইয়া কহিলেন—সেখানে কি বিয়ের সম্বন্ধ খুঁজতে যাই নাকি ?

—তবে কেন যাও ? তোমরা বিদ্বান, বুদ্ধিমান, আমি মুখ্‌খু মানুষ আমি আর কি বুঝি ! যাক্‌, কিন্তু ওই নান্টু যে কিছুই পড়াশুনো করে না, ফাঁকি দেয়, তাকে নিয়ে একটু ব'সলেই পারো ? মাসে মাসে মাস্টারের টাকা গুনতে হয় অথচ এত বড় সংসার দেখে আমি কি পড়াশুনোও তদারক ক'রবো নাকি ?

ডাঃ সেন ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—কেন নান্টু পড়ে না ? মাস্টার আসে না ?

—আসে ; কিন্তু সে ভদ্রলোকের ছেলে ওর মত বাঁদরের সঙ্গে কি পারে ? কি করে না করে একটু দেখতেও ত পারো—আমাকে মুখ্‌খু পেয়ে যা তা বুঝিয়ে দেয়।

—আচ্ছা ওর একটা পরীক্ষা ক'রবো।

—হ্যাঁ, শনিবার দিন রাত্রে একটু দেখ ত কি করে—আর কাল সকালে বাজারে যাও একটু। চাকরটা রোজই বলে মাছ চার টাকা, অথচ শুনি দাম কমেছে, সে কত কি করছে কে জানে !

ডাঃ সেনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অপ্রিয় কাজ বাজার করা, তবুও তিনি রাজি হইয়া বলিলেন—হ্যাঁ, চাকরটা যেন কিছু কিছু করছে—মাছ ত তিনটাকা আজ কে যেন বল্‌লে। আচ্ছা কালই যাবো।

ডাঃ সেন আসিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। স্ত্রী আহারান্তে আসিবেন—একটা সিগারেট ধরাইয়া লইয়া ভাবিলেন—মিস্‌ বসু যেন ঐ কথাটা একটু ঠেস দিয়া বলিলেন…"বর্তমান শিক্ষাকে গৃহে পান নি বলেই হিন্দু আদর্শে এত অনুরাগ"…এটা যেন বিদ্রূপ ! ওঁরা মনে করেন শিক্ষিতা মেয়েদের আমরা বিয়ে করতে ভয় পাই।…তবে এই নান্টু পড়ায় ফাঁকি দিতেছে কিনা সেটা বুঝিবার জন্য তাঁহাকেই শনিবার পরীক্ষা করিতে হইত না। মিস্‌ বসুকে দেখিতে যেমনই হোক, কথাগুলি তাঁহার বেশ স্পষ্ট এবং ন্যাকা লজ্জাবতী মেয়েদের মত দীনতাপূর্ণও নয়—বেশ একটা নির্ভীকতা আছে কথায় এবং ব্যবহারে—এইটুকু ওর শিক্ষার দান।

গৃহিণী আহারান্তে পান দোক্তা চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া প্রশ্ন করিলেন—আচ্ছা ওখানে যাওয়া একটি দিনও কামাই দেওয়ার যো নেই কেন ? ওখানে কি কর ?

—আড্ডা। বাড়ি বসে কি করবো, হয় টাকা পয়সার ভাবনা, না হয় ছেলেপুলের কিচিরমিচির। একটু বিশ্রাম ত চায় মানুষ।

—কেন আমার সঙ্গেই না হয় বসে আড্ডা দাও—ওদের নিয়ে খেলাধুলো কর। ওই যে পাশের বাড়ির শৈলেনবাবু কেমন ছেলেপুলে নিয়ে ক্যারম খেলে, বেড়াতে যায়। তুমি একদিনও আমাদের নিয়ে গেলে না কোথায়ও।

ডাঃ সেন একটু অসন্তুষ্টভাবে বলিলেন—আড্ডা মানে কি হৈ চৈ, তা নয়। বড় বড় কথাই সেখানে হয়, কত জ্ঞানীগুণী লোক আসে, কত রকমারি বিষয় জানা যায়—এই ত এক ভদ্রলোক এসেছেন তাঁর জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি—

পত্নী কটাক্ষ করিলেন—ও আমরা মুখ্খু বলেই বুঝি তোমার কথাবলা, আড্ডা দেওয়া হয় না? কি ক'রবে বল—বিয়ে যখন ক'রেই ফেলেছ—

ডাঃ সেন ইচ্ছাকৃতভাবেই পারিষদের মত বলিলেন—মাপ ক'রো, এই মুখ্খুর ঝালই সামলাতে পারি না, এর পর আবার শিক্ষিতা হ'লে রক্ষে ছিল!

—ওখানে মেয়েমানুষ আসে ক'জন?

—আসে কদাচিৎ দুই একজন—প্রায়ই আসে না।

—আজ এসেছিল কে?

—কেউ নয়, তবে ওই ভদ্রলোক—হ্যাঁ সত্যিই চমৎকার কথা বলেন।

—কে ভদ্রলোক, বাসা কোথায়? বিয়ে ক'রেছেন কোথায়? ছেলেপুলে কি?

—সে সব কে জানে? ওই বুঝি জিজ্ঞাসা করি?

—তবে আর পরিচয় হ'ল কি?

ডাঃ সেন হাসিয়া উঠিলেন। গৃহিণী বলিলেন—এখন আবার পড়বে নাকি? না আলো নিভিয়ে দেবো? হ্যাঁ আর দ্যাখো, তুমি চিংড়ির কাটলেট খেতে চেয়েছিলে, চিংড়ি পেলে এনো—আর নতুন একটা জিনিস শিখেছি সেটা তৈরি ক'রতে হবে—একটা কি দুটো ঝুনো নারকেল এনো।

*

হরিচরণ আজ পানের দোকানটার সাম্নে না দাঁড়াইয়া ট্রামস্টপে আসিয়া দাঁড়াইল। সে তপতীর জন্যে অপেক্ষা করিতেছিল—আলাপ করিয়া অকারণ হৃদ্যতা প্রকাশ করা এবং অকারণেই পরিচয়কে অস্বীকার করার মাঝে সঙ্গতি কোথায় তাহা সে আজ একবার জিজ্ঞাসা করিবে।

কয়েকজন সহপাঠী নিকট দিয়াই গেল—একটু কটাক্ষে এবং একটু হর্ষপাতে কেহ ব্যঙ্গ করিল, কেহবা বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিল—অপেক্ষমান।

হরিচরণ সমস্ত উপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণিক পরে তপতী আসিল, হরিচরণ বিনা ভূমিকায় তাহার পিছন পিছন ট্রামে উঠিয়া পড়িল। তপতী চোখের কোণ দিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—ব'সবেন নাকি?

হরিচরণ নিঃশব্দে তাহাব কাছে বসিযা পড়িল। কণ্ডাকটব আসিতেই হরিচরণ দুইখানা টিকিট করিয়া কহিল—আপনি টিকিট ক'রবেন না। কলেজ স্কোয়ারে একটু নাম্‌তে হবে, কথা আছে।

তপতী কহিল—আমার সঙ্গে? কথা থাকলেই বা আমি নাম্‌বো কেন?

—একটি দিন নাম্‌তেই না হয় হ'ল তা'তে ক্ষতি কি? একদিন যদি অনুগ্রহ করে আলাপই ক'রেছেন আর একদিন না হয় আর একটু কৃপা ক'রলেনই।

তপতী হাসিয়া কহিল - বেশ কৃপা আর একটু না হয় আজ ক'রবো।

—ধন্যবাদ। আসুন, আমরা এসে পড়েছি।

তপতী হরিচরণের পিছু পিছু নামিয়া আসিয়া বলিল—তাব পর কি ক'রতে হবে?

হরিচরণ একখানা খালি বেঞ্চি দেখাইয়া বলিল—বসুন এখানে।

একখানা বেঞ্চ দখল করিয়া বসিযা হরিচরণ বলিল—একটা সত্য কথা বলবেন আজ? আশা করি আপনার সত্য কথা বলবার মত সাহস আছে।

তপতী কহিল—না সত্য কথা বলার মত দুঃসাহস নেই। বলুন দেখি যদি বলতে পারি।

হরিচরণ ভূমিকা করিল—আপনার সঙ্গে পরিচয় সম্ভবত আজ শেষ হ'তে চলেছে; আজ সত্য কথা বলে সারাজীবনের মত একটা সংশয় জয় ক'রবেন এ আশা করা সম্ভবত আমার অন্যায় হবে না।

—হ্যাঁ, ভূমিকা ত্যাগ ক'রে প্রশ্নটা বলুন।

—আমি জানি আমি কুৎসিত, শুধু তাই নয় দরিদ্রও বটে এবং আপনি জানেন না বোধহয় আমি বিবাহিতও। যাক্—এ সত্বেও আপনি—সম্ভবত বড়লোকের ঘরের মেয়ে, তা ছাড়া সুন্দরীও বটে, এ ক্ষেত্রে আমার সঙ্গে আলাপ করে—স্বেচ্ছাকৃত ভাবে—আমাকে কি অনুগৃহীত করতে চেয়েছিলেন?

—কতকটা। আপনি যদি আমার আচরণের ব্যাখ্যাটাও এমনি ভাবে ক'রে খুশি হন তবে আপনার সে ধারণা আমি ভাঙতে চাইনে।

হরিচরণ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া জবাব দিল—এটা আপনার পক্ষে কত বড় ঔদ্ধত্য এবং স্পর্ধা তা আপনি জানেন—দরিদ্রকে দান ক'রে মানুষ আত্মতৃপ্তি লাভ করে ব'লে, তার মধ্যে কৃপা বা সহানুভূতি থাকে না জানেন?

—জানি না, তবে সে হতে পারে।

—আমাকে আপনি এই কৃপাটুকু ক'রে সেই রকম আত্মতৃপ্তি বোধ ক'রেছেন? তার মধ্যে আমার প্রতি এতটুকু দরদ নেই—অত্যন্ত নির্মম ভাবে আমাকে নিষ্পিষ্ট ক'রে আপনি আনন্দ পেয়েছেন।

তপতী হাসিয়া কহিল—কিন্তু আপনিও ত বহু রকমে নিষ্পিষ্ট করে তৃপ্তি পেতে চাচ্ছেন কিন্তু তৃপ্ত হচ্ছেন না। এক্ষেত্রে একটা ঝগড়া করা দরকার, কেমন?

হরিচরণ চুপ করিয়া রহিল—তপতীর মুখের দিকে চাহিবার মত সাহস তাহার ছিল না, অদূরে সুইমিং ক্লাবের বাড়িটার পানে চাহিয়া রহিল। তপতী তাহার দিকে চাহিয়া দেখে হরিচরণের মুখখানা কুৎসিত হইলেও চোখ হইতে একটা তীব্র দীপ্তি বাহির হয়, ক্ষুদ্র বুকখানায় অপরিমিত সাহস, কণ্ঠ মেঘমন্দ্রের মত গম্ভীর ও অনুজ্ঞা-জ্ঞাপক। তপতী তাহার কুৎসিত আকৃতিকে মনে মনে খানিকটা ক্ষমা করিয়া কহিল—আপনি যে খুব কুৎসিত একথাটা আপনি বুঝলেন কি করে?

হরিচরণ জবাব দিল—বাজারে এখনও আয়না পাওয়া যায়।

—কিন্তু চেহারাটাকে যারা তারিফ করে তারাই কি মানুষের ঠিক বিচার করে?

—না, যারা টাকার পরিমাণ বিচার করে তাদের বিচারে সাধারণত ভুল হয় না। শিক্ষা, দীক্ষা, প্রাণ, প্রেম, প্রণয়, সততা সবই অর্থ-লভ্য।

—কিন্তু যারা বড়লোক নয় তারা?

—আপনি নয়?

—অন্তত অনুমান করবার মত কোন হেতু নেই।

হরিচরণ লক্ষ্য করিল তপতীর বেশভূষার মধ্যে আভিজাত্যের কোন প্রমাণ নাই।

তবুও তাহার একটা সংস্কার ছিল যে বড়লোকের মেয়ে না হইলে বি, এ, পড়ে না তাই সে বলিল—অনুমান মানুষে অকারণেই করে, বিশেষ কারণ তার থাকে না। আমার অনুমান ভুল নয়। যা হোক্, আমার প্রশ্ন থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি। আমার প্রশ্নের একটা স্পষ্ট উত্তর দিলে সুখী হব।

তপতী একটু ব্রীড়া ভঙ্গি করিয়া কহিল—আপনাকে খুশি করার ইচ্ছে যদি আমার না থাকে অথবা আপনাকে দুঃখ দিয়েই যদি আত্মতৃপ্তির ইচ্ছে থাকে, তবে এ প্রশ্নের উত্তর ত আমি দেব না।

হরিচরণ খোঁড়া পা'টাকে আর একখানা পায়ের উপর তুলিয়া কহিল—যদি তাই হয় তবে তা স্বীকার করতে রাজি হচ্ছেন না কেন?

—স্বীকার ক'রলে আর তৃপ্তিটা পাওয়া যায় কেমন ক'রে?

হরিচরণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। উত্যক্ত কণ্ঠে কহিল—রহস্য রহস্যই থাক্, চাই নে জানতে—তবে এ রকম করে মানুষকে নিয়ে মরণখেলা করার মাঝে মনুষ্যত্ব নেই। আপনার স্পর্ধাকে আর আলাপ পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা দিয়ে বাড়াতে চাই নে।

হরিচরণ কোনরূপ ভদ্রতা না করিয়া, এমন কি একটা শুষ্ক নমস্কার পর্যন্ত না করিয়া নেঙচাইতে নেঙচাইতে চলিয়া গেল। তপতী বসিয়া বসিয়া তাহার গমনভঙ্গি লক্ষ্য করিতেছিল। মনে মনে কহিল—লোকটাকে আঘাত না দিলেও হইত। তাহার করিয়া যে একটা আকর্ষণ সে বোধ ক'রে, সে কথা মিথ্যা করিয়া বলিলেই বা ক্ষতি ছিল কি? ও হয় ত জগতে সত্যই ভালবাসা পায় নাই—বিবাহিত জীবনে ও হয় ত একান্তই বঞ্চিত।

তপতী ভাবিয়া ভাবিয়া একটু করুণা বোধ করিল।

*

কলেজের শেষে তপনকুমার অবগত হইল তাহাদের সমিতির একটি জরুরি অধিবেশন অদ্য হইবে। তপন একটু চা খাইয়া অধিবেশনে যোগ দিবে স্থির করিয়া নামিতেছিল; কিন্তু সিঁড়ির মাঝে অকস্মাৎ রেণুকা ও মণিকার সহিত দেখা হইয়া গেল। রেণুকা অভিযোগ করিল—বেশ ত, এখন মিটিং আপনি যাচ্ছেন কোথা?

—একটু চা খেয়ে আসি।

রেণুকা একটা অনুজ্ঞাজ্ঞাপক সুরে কহিল—আপনি ও চা'র দোকানে কেন চা খান, ওখানে চা খাবেন না। চলুন—

মণিকা অনুমোদন করিল—হ্যাঁ, যেমন অপরিষ্কার, তেমনি কি দেয় না দেয়—

তপন বলিল—একটা কু-অভ্যাস যখন হ'য়ে গেছে তখন আর কি ক'রবো বলুন ?

—ওটা পৈতৃক স্বভাব নয় বরং কু-অভ্যাস আয়ত্ত করাটাই স্বভাব।

রেণুকা বলিল—কু-অভ্যাস ত্যাগ করুন।

মণিকা ব্যঙ্গ করিল—নইলে বড়লোকের ঘরে জন্মে লাভ হ'ল কি ?

তপন হাসিয়া বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, নইলে বাপের টাকা খরচ হবে কেমন ক'রে। আর সকলেই যদি না খায় তবে দোকানদারটা ফেল ক'রবে সেটা কি ভাল হবে ?

রেণুকা কহিল—হ্যাঁ, পরহিতব্রতে যখন এত দূর মতি হয়েছে তখন সৎকর্মে বাধা দিয়ে কি হবে ?

পথে আসিতে আসিতে দুই একজন বন্ধু জোগাড় হইয়াছিল। চা খাইতে খাইতে শৈলেন বলিল—কি বল তপন ? রেণুকা মণিকার যেন—

তপন বলিল—যেন নেই। রেণু আজ শাসন ক'রলে—রেঁস্তোরায় চা খাই কেন! বাপ্ এত শাসন পরের ছেলের উপর—

শৈলেন ব্যাখ্যা করিল—অর্থাৎ তোমার শুভাকাঙ্ক্ষিনী—অর্থাৎ তোমার স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্যে একটা আকুল বা ব্যাকুল সতর্কতা, যার মানে হচ্ছে কিনা—ধর—তোমার প্রতি একটা আকর্ষণ অর্থাৎ আকর্ষণটাই হ'ল ভালোবাসার প্রথম স্তর, তার মানেই ভালোবাসা—

বন্ধুগণ অনুমোদন করিল। তপন বলিল—কিন্তু মণিকা কি বল্লে জানো ? বড়লোক বলে একটু খোঁচা দিল।

শৈলেন পুনরায় ব্যাখ্যা করিল,—খোঁচা কাকে দেই, না যাকে ব্যথা দিয়ে তৃপ্তি পাই, কাকে ব্যথা দিয়ে তৃপ্তি পাই, না যে আমাকে ব্যথা দেয়। কে ব্যথা দিতে পারে ? যাকে ভালবাসে—অতএব—

বন্ধুগণ অনুমোদন করিয়া কহিল—এখন দুইয়ের মাঝে বাছাই ক'রতে হবে —choice between the two—

তপন কহিল—আবার বাছাই কেন—দু'টোই যেটা শেষ পর্যন্ত টেঁকে।

শৈলেন টিপ্পনী করিল—জালে বেশি মাছ আটকালে জাল ছিঁড়ে যায়, সেটার প্রতিষেধক হচ্ছে গোটানোর পূর্বে ছেড়ে দেওয়া।

অনৈক বন্ধু বলিল—জাল শক্ত আছে কিছু হবে না তপন। তবে আরো কিছু এসে না ঢোকে এইটে লক্ষ্য ক'রো, কারণ যেখানে গেছ সেখানে বহু মৎস্য জালে ঢোকবার জন্য প্রতীক্ষমান।

তপন বিনয় প্রকাশ করিয়া কহিল—কিন্তু জাল যে ছেঁড়া।

বন্ধুরা উৎসাহ দিলেন—তা হোক, যার মরণ থাকে সে ছেঁড়া জালেও আটকায় আর তা ছাড়া আত্মহত্যাও ত অনেকে করে।

*

সভা যখন শেষ হইল তখন কলেজে ছুটি হইয়া গিয়াছে, বিশেষ কেহ নাই। তপন ধীরে ধীরে নামিতেছিল, কিন্তু যে পথটা সে বাছিয়া লইয়াছিল সেটা রেণুকা ও মণিকার গমন পথ। তাহারা একটু আগে আগে নামিতেছে।

তপন কহিল—মিস্ রায়, এটা কি ভাল হ'ল?

রেণুকা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—কোন্টা?

—আপনাদের সাহিত্যিক শ্যামলবাবুকে আনার ভার আমার উপর দেওয়া?

মণিকা টিপ্পনী করিল—সকলেরই ত মোটর নেই।

রেণুকা বলিল—কেন?

—কথাবার্তা বল্‌তে শেষে হয়ত বেকুব বনে যাবো। তাঁরা সব নামজাদা লোক!

রেণুকা উৎসাহ দিল—তা হোক্, মানুষ ত। গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে আস্‌বেন এর মধ্যে অসাধ্য কিছু ত নেই।

—অসাধ্য না হ'লেও দুঃসাধ্য ত বটে!

মণিকা ব্যঙ্গ করিল—মাঝে মাঝে দুঃসাধ্য কাজ ক'রতে হয়, নইলে পুরুষ মানুষ কিসের?

অবান্তর বিদ্রূপ ও পরিহাসের মধ্যে রেণুকা হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে প্রশ্ন করিল—আমার একটা কথা জান্‌তে ভারী কৌতূহল হয়—আচ্ছা আপনি পরীক্ষা দেন নি কেন?

—আজ্ঞে দরকার বোধ করি নি।

মণিকা পুনরায় ব্যঙ্গ করিল—ডিগ্রির ত দরকার নেই কিছু!

—ডিগ্রির দরকার নেই সত্যি, তবে লেখাপড়াটা শেখা দরকার। ডিগ্রি পেলেই মনে হবে বহু শিখে ফেলেছি, তাই। আর ধরুন ভাল করে পাকাপোক্ত ভাবে শিক্ষা করাই ভাল—নয়? তপন হাসিয়া উঠিল। রেণুকা বা মণিকাকে কটাক্ষ করিয়া নহে বরং নিজের অকর্মণ্যতা লক্ষ্য করিয়া।

—এবারও কি পরীক্ষা দেবেন না? প্রশ্ন করিল রেণুকা।

—এখনও ঠিক করি নি, তবে যথেষ্ট ইচ্ছা আছে।

রেণুকা পরিহাস করিল—হ্যাঁ, সেই সুমতি আপনার হোক্।

তপন একাকী নিজের গাড়িতে গিয়া উঠিল। মনটা রেণুকা ও মণিকার স্বপ্নাবেশে যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। রেণুকার কথাগুলি বেশ হৃদ্যতাপূর্ণ, মনে হয় যেন কতকালের পরিচিত শুভাকাঙ্ক্ষিনী। তাহার শুভাশুভের জন্যে সে যেন বড় ব্যাকুলতা প্রকাশ করে—চেহারাটা তাহার গ্রীক্ ভাস্করের তৈয়ারি স্ত্রীমূর্তির মত বলিষ্ঠ, সুন্দর, সতেজ। এ যেন দুর্ভাগ্যে চোখের জল ফেলিতে জানে না, আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া নিজেকে পোড়াইয়া দিতে পারে—আর মণিকা বড়ই মধুর, তিরস্কার করিলেও যেন ভাল লাগে। অল্প একটু দেহের মাঝে যেন নিবিড় সৌন্দর্য ও অনন্ত মধু সঞ্চিত হইয়া আছে—মণিকা ও সুন্দর, বেতসের মত কমনীয়, একটু হাওয়ায় আন্দোলিত হয়—নিরুপায় অশ্রু বিসর্জন করিতে পারে কিন্তু কাহাকেও আঘাত দিতে পারে না।

তপন বাড়িতে ফিরিয়া আসিল—মনটা একটা আনন্দাপ্লুত ঔদাস্যে ভরিয়া উঠিয়াছে মোক্ষদা কখন তাহার ক্ষুদ্র দেহ সঞ্চারিত করিয়া দিয়া চা পরিবেশন করিয়াছে তাহা সে লক্ষ্যও করে নাই। মোক্ষদাকেও তাহার ভাল লাগে—তাহার ক্ষুদ্রত্বের মাঝেও যেন মাতৃত্বপুষ্ট ত্যাগশীল হৃদয় আছে।

তপন চা খাইয়া নামিয়া যাইতেছিল, মানবেন্দ্র নীচের অঙ্গনে দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করিতেছিল। নিকটবর্তী হইতেই নমস্কার করিয়া কহিল—আমাকে চিনতে পারেন তপনবাবু?

তপন একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—চিনবো না কেন?

—আমিই আপনাদের আশ্রিত জীব, নাম মানবেন্দ্র।

তপন অপরাধ স্বীকার করিবার মত ভঙ্গীতে বলিল—আমি কলেজের কতকগুলো কাজে বড় ব্যস্ত আছি তাই আড্ডা দেওয়ার সময় পাচ্ছি না। রবিবার থেকে জোর আড্ডা জমানো যাবে—কেমন?

—সে অনুরোধ করিনি। কলেজের কাজ মানে সাহিত্য সমিতি-টমিতির ব্যাপার বোধ হয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মিটিং হবে—তাই।

—ও বুঝেছি। তা ব্যস্ত ত হতেই হবে, ওখানে আপনি ত নিরুপায় ব'লতে গেলে। ইচ্ছে না থাক্‌লেও কাজ ঘাড়ে এসে পড়ে।

—হ্যাঁ। ঠিক তাই।

—হ্যাঁ কতকগুলো লোক আছে যাদের ঘাড়ে কাজের চাপ পড়েই, আবার এমন লোকও আছে শত কাজের মাঝেও তারা বেশ আলগা থাক্‌তে পারে—না?

—হ্যাঁ। ঠিক তাই।

মানবেন্দ্র হাসিয়া উঠিয়া বলিল—ও সব জানি। আচ্ছা রবিবারে আড্ডা দেওয়া যাবে। আসুন—

মানবেন্দ্র এমন ভাবে হাসিয়া উঠিল যে তপন ক্ষণিক অপ্রস্তুতের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল—সত্যিই তাই। মিথ্যা নয়।

—না না, মিথ্যা মনে করি নি। আপনি বিশ্বাস করুন।

*

ডাঃ দত্ত সেদিন আকস্মিক ভাবে কয়েকটা কল্ পাইয়াছিলেন—শেষ রোগীটা যখন দেখিয়া ফিরিলেন তখন ভিজিটের টাকায় পকেট ভারী হইয়া উঠিয়াছে। রাত্রি ন'টা—বাসায় ফিরিতে হইবে। মনটা টাকার প্রাচুর্যে বেশ প্রসন্ন হইয়া রহিয়াছে। ডাঃ দত্ত হাঁটিতে হাঁটিতে ডাক্তারখানা হইতে বাসার দিকে রওনা দিলেন।

হঠাৎ বাড়ির কথা এবং সেই প্রসঙ্গে মলিনার কথা মনে করিয়া মনটা যেন নূতন করিয়া কাঁটার খোঁচা অনুভব করিল—হয় ত মলিনা আলো জ্বালিয়া মলিন ভাবে বসিয়া আছে; কিন্তু যে মলিনা বিবাহের পূর্বে এমন কলহাস্যে পূর্বরাগের নীরব অভিব্যক্তিতে আপনাকে এমন মোহময় করিয়া তুলিয়াছিল সে আজ এমন কি দুঃসহ ব্যথায় এত উদাস হইয়া উঠিল? সে ত এমন কোন ব্যবহার করে নাই, এমন কোন কটূক্তি করে নাই যাহাতে সে আপনার জীবনকে দুর্বহ মনে করিতে পারে।

দরজার কড়া নাড়িতেই ঝি আসিয়া শশব্যস্তে দরজা খুলিয়া দিয়া অশুভ সংবাদ জানাইল—মার অসুখ ক'রেছে।

দত্ত উপরে উঠিয়া দেখেন মলিনা হিস্টিরিয়ার ফিটে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ঝি চোখে মুখে জলের ছিটা দিয়া বাতাস করিয়াছে কিন্তু কোনরূপ সজ্ঞানতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। দত্ত ডাকিলেন—মলিনা, মলিনা—

মলিনা কোন উত্তর দিল না।

দত্ত গরম জল আনাইয়া পা দুইটিতে জল ঢালিয়া গরম করিলেন, মনে হইল যেন শরীরের অবস্থা কিছু কোমল হইয়াছে। ডাকিলেন কিন্তু কোন সাড়া নাই।

আরও কিছুক্ষণ চেষ্টার পরে রুদ্ধনিশ্বাস নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিয়া মলিনা উঃ বলিয়া উঠিল। দত্ত সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি? কি হ'ল মলিনা?

—বড় অন্ধকার—আলো—আলো কই?

—এই ত, এই ত আলো জ্বালা—

দত্ত সস্নেহে মাথায় হাত দিয়া প্রশ্ন করিলেন—কেমন ঠেকছে—বল—

—অমনি করে ধ'রো না, নিশ্বাস বন্ধ হ'যে যাচ্ছে—ছাড়ো ছাড়ো—উঃ।

সঙ্গে সঙ্গে সে পুনরায় অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ডাঃ দত্ত কাপড় জামা বদলাইতে বদলাইতে ভাবিলেন—এমনি কেন হইল? অন্ধকার কি আলো তাহা বুঝিতেছে না কেন? সত্যিকার অজ্ঞানতা হইলে ত এমনি কথা বলিতে পারিত না। হিস্টিরিয়া রোগিণী দুই একটি চিকিৎসা না করিয়াছেন এমন নয়—

পুনরায় জ্ঞান ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু জ্ঞান হইল না। আপনার ব্যর্থতায় দত্ত ক্রমেই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিলেন। অবশেষে ক্রোধে অধীর হইয়া গরম জলের পাত্র ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন—মরো—ছি ছি ছি—

ঝিকে একটা গোলমরিচ আনিতে বলিয়া কহিলেন—হ্যাঁ দেখছি—

গোলমরিচ পোড়াইয়া তাহার ধোঁয়া নাকে দিতেই মলিনা দুই একবার একটু এদিক ওদিক করিয়া, শ্বাসপ্রশ্বাসের একটা নিদারুণ কষ্ট অনুভব করিয়া নিদ্রোখিতের মত জাগিয়া উঠিল।

ডাঃ দত্ত মনে মনে একটা প্রতিশোধের আনন্দে খুশি হইয়া উঠিলেন। হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—কি হলো?

মলিনা মাথায় একটু কাপড় টানিয়া দিয়া কহিল—ও তুমি এসেছ? হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ডাঃ দত্ত নিতান্ত অশোভন ভাবে বিদ্রূপ করিলেন—ঘুমিয়ে পড়া বদ্‌অভ্যাসটা ত্যাগ করো। আমি একেই এমনি ঘুমিয়ে পড় কেন ?

মলিনা বিস্মিত বিহ্বল দৃষ্টিতে চারিপাশ দেখিয়া যেন আশ্চর্য হইয়া গেল—ঘরে এত জল থৈ থৈ করিতেছে কেন ?

*

লাহিড়ী ও চন্দনা আড্ডা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। লাহিড়ী সে দিনের মত চন্দনার অতিথি।

ড্রইং-রুমে একখানা সোফায় বসিয়া লাহিড়ী চা পান করিতে করিতে বলিলেন—একেই বলি অপব্যয়। অপব্যয় না ক'রলে বড়লোক হবে কেন ?

চন্দনা প্রশ্ন করিল—কার কথা ব'লছো ?

—ঐ আদিত্যবাবু। একেবারেই পাগল—ত্মাখো না কত জন্তু জানোয়ার জোগাড় ক'রেছে। আর ঐ লোকটা কত বড় হামবাগ, কারও কোন কথা সত্যি নয় ওর কথাই যেন সত্যি এমনি ভাবে কথা বলে। ওটাকে টাকা দিয়ে পুষছে কেন ?

চন্দনা আপত্তি করিল—না না, ওর কথাগুলো যেন সত্যি বলে মনে হয়। কথা বলাটার মধ্যে সে রকম চালিয়াতি আছে বলে ত মনে হয় না।

লাহিড়ীর যুক্তিতর্কের ভিত্তিভূমি যেন বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে এবং তাহাকে আশু সংস্কার না করিলে সব ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে—এমনি একটা ব্যস্ততা ও ব্যাকুলতার সঙ্গে তিনি বলিলেন—ত্মাখো চন্দনা, দু' দশখানা বই না পড়েছি এমন নয়। ডিগ্রি নেই বটে, কিছু পড়াশুনো করেছি, আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া সহজ নয়, মানুষ চরিয়ে খাই। লোকটা মস্ত বড় হামবাগ—আজ না হয় কাল বুঝতে পারবে। আচ্ছা এই যে আমি বিয়ে করি না—এটা যে কত বড় একটা বিশ্বাসের বলে বা যাকে বলে principle-এর প্রভাবে তা, আমি ত মনে মনে জানি কিন্তু ও কোন্ সাহসে সেটা মিথ্যা বলে ? আমার মন কি আমার কাছে অজানা আছে ?

—উনি ত তাই ব'ললেন, মানুষ নিজের মনকেই সবচেয়ে কম জানে।

—তোমার কি এটা সত্যি বলে মনে হয় ?

চন্দনা চিন্তা করিয়া কহিল—খানিকটা যেন সত্যি। আজ যাকে খুব ভাল

বা বড় মনে হয় কাল তাকে ত তেমনি বড় মনে হয় না। যদি নিজের মনটাকে জান্তামই তবে এমন ভুল হয় কেন? এই ধর তুমি, তোমাকে কত শ্রদ্ধা করেছি কিন্তু তুমি যে চোরাই মাল এনে আমাকে সন্তুষ্ট ক'রতে চেয়েছ তা কি জান্তাম!

—সেটা কি অন্যায় ক'রেছি?

—সে কথা হ'চ্ছে না। তোমাকে খুব জ্ঞানী বলে মনে হ'ত কিন্তু ওখানে গিয়ে দেখি ওদের কথাও ত খুব অজ্ঞান লোকের মত নয়।

লাহিড়ী একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—তবে কি তুমি ব'ল্‌তে চাও ওরা সবাই আমার চেয়ে বেশি বোঝে, বেশি জানে?

—কোন কোন বিষয় জান্‌তে পারে। আর ভ্যাখো, তোমাকে যা বল্‌তে সাহস হয় ওদের তা ব'লতে সাহস হয় না। মনে হয় নাগাল পাবো না।

লাহিড়ী বিজ্ঞের মত হাসিয়া বলিলেন—ওটা বুঝলে না? ওটা নৈকট্য, আমার সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা আছে বলেই আমার কাছে হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত ক'রতে পারো।

চন্দনা ভ্রূ-ভঙ্গি করিয়া কহিল—ও, তাই!

লাহিড়ী আবার বলিলেন—আর একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রেছ? ও বলে কিনা যে যুক্তিটা হয় পরে এবং ফিলজফিটা হয় আগে। এমন কথা ত পাগলেও বলে না—উল্টো কথা বলায়ই যেন বাহাদুরী। আচ্ছা ধর, তুমি অমুক ছবিতে নাম্‌বে কিনা তা ঠিক করো কি ক'রে? আগে মনে মনে যুক্তিতর্ক কর তারপর ঠিক কর 'হ্যাঁ' কি 'না'—তাই কিনা?

চন্দনা কহিল—হ্যাঁ।

—তবে? যুক্তিটা আগে না ফিলজফিটা আগে? এ কথা তুমি ত বুঝলে—কত বড় হামবাগ্ ও—

চন্দনা ঈষৎ হাসিয়া কহিল—আমি বুঝলে আর কি হ'ল? আমি ত যা বোঝাবে তাই বুঝবো। সজ্ঞানে হউক আর অজ্ঞানেই হউক লাহিড়ী জানিতেন—জগতে আর কেহ বুঝুক আর নাই বুঝুক চন্দনাকে তাঁহার কথা বোঝানো একান্তই প্রয়োজনীয়, অন্তত মানবেন্দ্র যে বুদ্ধি-জগতে তাঁহার হইতে বড় নয় এটা সপ্রমাণ করা আপনার জীবনরক্ষার মত অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে, তাই অত্যন্ত ব্যাকুলতার সঙ্গে তিনি বলিলেন—হ্যাঁ, বোঝা দরকার। তুমি ত বল্‌লে ও যা বলে তা যেন ঠিক মনে হয়—অথচ কত বড় একটা ভুল কথা বুঝিয়ে দিয়েছে?

—কেমন ক'রে দিলে ?

—লোকটা ভাল অভিনেতা। তাই নয়, কথা বলাটা ও আয়ত্ত করেছে।

—অভিনেতা হ'লে এই 'বিড়ম্বনা' ছবিতে ওকে নাও না। চেহারা ত আর তাতে ভাল দরকার নেই।

লাহিড়ী উচ্চ হাস্যে ঘর ভরিয়া দিয়া বলিলেন—ওই ত আবার ভুল বুঝলে। অভিনেতা মানে কি ছবির অভিনেতা ? তা নয়—মনকে চেপে কথা ব'ল্তে পারে। ওর মত লোকের কাজ অভিনয় করা—যারা আর্টকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসে তারাই পারে—আর ও বলে কিনা—

—হ্যাখোই না একদিন মহলা দিয়ে।

—আমি যাবো তাকে সেধে আন্‌তে অভিনয় করানোর জন্যে, আর আমার পায়ে কত লোক দিনরাত্রি মাথা খুঁড়ছে একটা পার্ট পাওয়ার জন্যে ? তুমিই হাসালে !

—ভাল হ'লে সাধবে না কেন ? আমাকে সাধো নি কোনদিন ?

—সেধেছি, তবে সেটা তুমি বলেই। সে আমার কে ?

চন্দনা মনে মনে কথাটা যেন পছন্দ করিল না, বলিল—আচ্ছা আমি শুন্‌বো, যদি রাজি হন তবে কিন্তু তখন না ব'লতে পারবে না।

লাহিড়ী মনে মনে একটু বিপন্ন বোধ করিয়া কহিলেন—তার মানে ? সে না পারলেও তাকে নিয়ে ছবিটা নষ্ট ক'রবো ? বাজারে বদ্‌নাম কিনবো ?

চন্দনা সবাগ্রে বলিল—আমার জন্যেই ত নাম কিনেছ, না হয় আমার জন্যে একটু হারালে।

লাহিড়ী আহত ব্যাঘ্রের মত বলিলেন—তুমি আমার নাম দিয়েছ ?

—সব না হলেও কতকটা ত ? ধর—সেবার আর্য আর্ট তোমাকে কিছুতেই ডিরেক্টরী দেবে না। আমি নামবো না ব'ল্‌লে তবে ত দিল। তারা যখন বুঝ্‌লে তোমাকে না নিলে আমাকে পাবে না—

লাহিড়ী মনে মনে ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হইয়াছিলেন। মুখে হাসিয়া বলিলেন—যাক্, নিজের সম্বন্ধে তোমার এমন ধারণা কি গর্বের লক্ষণ নয় ?

চন্দনাও উত্তেজিত হইয়াছিল, সে কহিল—কেন ক'রবো না। আমার নামে ছবি চলে কিন্তু তোমার নামে চলে না। আমাকে দেখ্‌তে আসে লোকে, তোমাকে নয়।

লাহিড়ী অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—আচ্ছা আজ উঠি—কাল সুটিং মনে আছে ত?

চন্দনা কোন জবাব দিবার পূর্বেই লাহিড়ী দরজা ঠেলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। চন্দনা তাঁহার এই অভিমানস্ফুরিত উদ্ধত প্রস্থানের ভঙ্গি দেখিয়া হাসিয়া উঠিল।

সন্ধ্যার একটু পরে মানবেন্দ্র একখানা সাদা কাগজে পেন্সিল দিয়া অনির্দিষ্ট ভাবে রেখাপাত করিতেছিল, তাহাতে একটা অস্পষ্ট নারিকেল গাছ ও একখানি নৌকা অঙ্কিত হইয়াছিল—সে রেখার উপর রেখা টানিয়া জলের ঢেউ দিতেছিল। হঠাৎ মুখ তুলিয়া দেখে তপতী ঘরে ঢুকিতেছে। মানবেন্দ্র একটু ব্যঙ্গ করিল—শুধু হাতে আসছেন দেখে আশ্চর্য হ'লাম।

তপতী হাসিয়া কহিল—কেন চা? এত চা'ও খেতে পারেন। আচ্ছা দাঁড়ান ব'লে আসি।

তপতী চা'র কথা বলিয়া আসিয়া, একটা চেয়ারে বসিতেই, মানবেন্দ্র বলিল—সেই খোঁড়া ছেলেটি কি ব'ললে? তার সঙ্গে আর দেখা হ'য়েছে?

তপতী আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল। সে যে আজকার ঐ ভাবপ্রবণ হরিচরণের কাহিনীই বলিতে আসিয়াছে তাহা এই লোকটি যেন অনুমান করিয়া ফেলিয়াছে। তপতী কহিল—আজ সে একটা কাণ্ডই ক'রে ফেলেছে!

মানবেন্দ্র একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিল—কি রকম?

তপতী আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনাটা বর্ণনা করিয়া কহিল—লোকটা এমন ক'রলে কেন বুঝলাম না। ডেকে নিয়ে এমন কথা বলেই বা কেন, আবার রাগ ক'রে হন হন ক'রে চলেই বা যায় কেন ইচ্ছে হচ্ছিল খুব শুনিয়ে দি কিন্তু দিলাম না, ভাবলুম যাক্‌গে—পাগলে কত কি বলে!

মানবেন্দ্র তপতীর মুখের দিকে দৃঢ় দৃষ্টিতে তাকাইয়া হাস্যস্মিত মুখে কহিল—কেন করে এমন তা আপনি ভালই বুঝেছেন, সে আমায় বুঝিয়ে দিতে হবে না। তবে ওই শুনিয়ে দেওয়া, ও আর আপনি পারবেন না, কোন দিন।

—কেন?

—তা বুঝবেন না—বুঝোলেও বিশ্বাস ক'রবেন না। সেটা যাক্—সে যে আপনাকে ভালবেসে ফেলেছে সেটা বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই!

তপতী লজ্জিত মুখখানি নীচু করিয়া কহিল—সেই রকমই মনে হয়

যদিও—মানবেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল কিন্তু তপতী তাহার অসমাপ্ত বাক্য শেষ না করিয়াই আকস্মিক ভাবে প্রশ্ন করিল—আপনি আমাকে আপনি বলেন কেন? প্রথমে ত তুমি ব'লতেন।

—কেন মানে? বলাই ত উচিত—আপনারা আমার আশ্রয়দাতা—মনিব। তুমি ব'ললেই ঘোর অসম্মান ও অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হবে।

—কেন, বয়সে ত ছোট।

—হ্যাঁ, আমার চেয়ে বয়সে ছোট এমনি হাকিম অনেক আছে, তাদের তুমি ব'ললে রক্ষে থাক্‌বে না—জেল, ফাঁসি সব হতে পারে।

—আমি ত হাকিম নই।

—মনিব ত।

—তা হোক্, তুমি বল্‌বেন। আপনি ব'ললেই যেন কেমন কেমন লাগে।

মানবেন্দ্র একটু হাসিয়া কহিল—আচ্ছা, তুমিই ব'ল্‌বো। হ্যাঁ, তুমি যদিও—বলে চুপ ক'রলে, ওটা শেষ করো।

—কোনটা? সে ভুলে গেছি। তবে মনে হয় যেন ও—তপতী স্বাভাবিক লজ্জায় চুপ করিল।

মানবেন্দ্র একটু দেরি করিয়া কহিল—সান্ধ্য আড্ডায় যাওয়াটা আমার কর্তব্য কারণ তোমার বাবার ইচ্ছা সেটা—তা একটু পরে গেলেই চলবে। যা হোক্—একটা জিনিস ত বুঝেছ মনে হয় যে তথাকথিত হরিচরণ তোমায় ভালবেসেছে কিন্তু আর একটা জিনিস একেবারেই বোঝো নি বোধ হয়।

—কি?

—তুমিও তাকে ভালবেসেছ।

—যান্, বলেন কি? অমনি কুৎসিত, তার পরে খোঁড়া, আর তার ত বিয়ে হ'য়ে গেছে।

—যে কয়েকটা কারণ ব'ল্‌লে ঐ কয়েকটা কারণ আছে বলেই আমার কাছে তোমার সংশয় দূর ক'রতে এসেছ এবং তার কাহিনী বলেছ। ঐ সংশয়টুকু না থাক্‌লে আমাকে বলতে না, ওটা নিজেই বুঝে ফেল্‌তে পারতে।

—না না, অমন একটা লোককে কি ভালবাসা যায়? এ কি সম্ভব?

মানবেন্দ্র হাসিয়া বলিল—যায় ব'লেই ত এত বিড়ম্বনা, নইলে ত গোলমালই থাকতো না, আর যে ব'লেছো অসম্ভব, ওটার উত্তরে ব'লতে হয় নেপোলিয়ান

যা বলেছিলেন। অর্থাৎ ওটা মূর্খের উক্তি। তাকে ভালবেসে লাভ কি, এই ভাবনা তোমার ভালবাসাকে সংশয়খণ্ডিত ক'রে তুলেছে। লাভ-ক্ষতির বিচার মনের গতিকে রুদ্ধ ক'রতে পারছে না; কিন্তু এখন সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় ক'রবার একটা লোভ হ'চ্ছে। তাকে ভাগ্যবান ব'লতে হয়।

—তাকে নিয়ে আস্‌বো একদিন, আপনি ছাড়া আর কারও সঙ্গে দেখা ক'রতে দেব না কিন্তু!

—আচ্ছা, মন্দ কি? এখন আড্ডায় যেতে হবে কিছু মনে করবেন না।

—হ্যাঁ, যান; কিন্তু ওখানে গিয়ে কি আনন্দ পান? যত সব উজবুক জোটে একসঙ্গে!

মানবেন্দ্র কহিল—আমাকে বাদ দিয়ে বলেছেন নিশ্চয়ই।

তপতী হাতজোড় করিয়া কহিল—ছি, ছি, আপনাকে কি বল্‌তে পারি। অ।পান।কছু মনে ক'রবেন না। মাপ ক'রবেন।

মানবেন্দ্র ব্যঙ্গ করিল—আপনার মাঝে সত্যিকার আভিজাত্য আছে।

*

সান্ধ্য আড্ডা জমিয়া উঠিয়াছিল।

মানবেন্দ্র ঢুকিতেই ডাঃ হালদার বলিলেন—আসুন, আসুন। আজ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে। আশুতোষের দানে আজ সত্যিই বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাংলা ধন্য। তাঁর জন্যেই আজ ক্ষ মরা—

ডাঃ সেন বলিলেন—তাঁর জন্যেই শিক্ষার এই উন্নতি, বাংলা সাহিত্য ভাষার এই উন্নতি।

ডাঃ বিশ্বাস বলিলেন—উন্নতি শুধু নয়, বাংলা ভাষার, জাতির সম্মান দিয়েছেন তিনি। তাঁর জন্যে বাংলা আজ বিশ্বের বিদ্যামণ্ডপে আসন লাভ ক'রেছে।

মানবেন্দ্র কোন জবাব দিল না। ডাঃ হালদার বলিলেন—কাল তাঁর মৃত্যু-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হবে। আপনি নিশ্চয়ই বাংলার এই মহাপুরুষের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে যাবেন।

ডাঃ সেন বলিলেন—নিশ্চয়ই যাবেন। যিনি বাংলাকে ভালবাসেন তিনি অবশ্যই যাবেন।

মানবেন্দ্র বলিল—দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, যাবো না।

সকলে সমবেত প্রশ্ন করিলেন—কেন? কেন যাবেন না?

—কারণটা ব'ললে দুঃখিত হবেন। তাই ব'লতে চাই নে।

ডাঃ বিশ্বাস বলিলেন—কেন দুঃখিত হবো? মহাপুরুষই তাঁরা যাঁরা আমাদের শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধায় বিচলিত হন না। তাঁদের কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না।

—হয়, আমরা না থাকলে মহাজন থাকেন না। মহাপুরুষদের কাজ ক'রবার একটা স্থান চাই ত! সে যাক্, আশুতোষকে মনে মনে আমি খুব বড় ভাবতে পারি না। আমার মনে হয় প্রথমত তিনি প্রচুর বুদ্ধিমান হয়েও বোকা ছিলেন, দ্বিতীয়ত তিনি বাংলা দেশের, ভাষার এবং বাঙালীর অশেষ ক্ষতি ক'রে গেছেন, তৃতীয়ত তিনি নিজের প্রতি ঘোর অত্যাচার ক'রে পাপের ভাগী হ'য়েছেন।

ডাঃ হালদার উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—না, না, আপনার কথা প্রত্যাহার করুন। তাঁকে এমনি অসম্মানিত হ'তে দিতে পারি নে। আপনাব অন্য কথায় সত্যতা থাকলেও এটা একেবারেই মিথ্যা। আপনি—

—হ্যাঁ প্রত্যাহার করুন। নইলে আমরা যেতে বাধ্য হব।

মানবেন্দ্র হাসিয়া কহিল—সে ত পূর্বেই বলেছি আপনারা দুঃখিত হবেন। আর একটা জিনিস কি জানেন, আপনারা বড় জিনিস ছোট করে দেখেন তাই বাহবা দিতে পারেন, বড় জিনিস ছোট ক'রে দেখ্‌লে সুন্দরও দেখা যায়, আর আমি ছোট জিনিস বড় ক'রে দেখি তাই অসুন্দরও দেখি এবং সহসা বাহবা দিতে পারি না।

ডাঃ সেন আক্রমণ করিবার ভঙ্গিতে বলিলেন—কেন? বলুন, আপনি প্রমাণ না ক'রতে পারলে আপনার এ উক্তি প্রত্যাহার ক'রবেন বলুন।

মানবেন্দ্র সংক্ষেপে কহিল—হ্যাঁ। আপনারা ব'লছেন বাংলা ভাষা ও ভাষীর খুব উপকার ক'রেছেন তিনি। বেশ! তার অর্থ বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালী আকৃষ্ট হ'য়েছে এবং তার সেবায় ভাষার উন্নতি হয়েছে এবং হবে; কিন্তু যারা বাংলা জানে বা লেখে তাদের চাকরি হয় না একথা সকলেই জানেন এবং প্রকৃত অর্থ হচ্ছে এই যে ফাঁকি দিয়ে কতকগুলো ছেলের সর্বনাশ ক'রেছেন তিনি। একটা ঘটনা বলি—আমি ইংরিজিতে যখন এম, এ, পড়ি তখন আমার এক স্কুল সহপাঠী—সে সর্বদাই আমার চেয়ে বেশি নম্বর পেত, বাংলা ভাষার একটা কিছু ভয়ানক সেবা-টেবা ক'রবে মতলবে বাংলায় এম্, এ, পড়তে গেল—আমার হিতবাক্য শুনলো না। আমি সেকেণ্ড ক্লাশ এবং সে রোগশয্যায় পরীক্ষা

দিয়ে সেকেণ্ড ক্লাশ পেলো। আমি হেডমাষ্টার হলাম ১০০৲ টাকায়, সে বাংলার শিক্ষক হল ৫০৲টাকায়। ইংরিজিতে সে পাশ ক'রতে পারতো এবং ১০০৲টাকাও পেত কিন্তু আশুতোষের জন্মে হ'ল না। যা এমনি অনর্থকর তা পড়তে যিনি উৎসাহিত ক'রেছেন তাঁকে প্রশংসা করা সম্ভব নয়। এখানেই গল্পের শেষ নয়—স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন এক হাকিম। একবার ক্লাশ সেভেনের ইংরিজি পড়াতে তাঁকে দেওয়া হ'ল। হাকিম প্রশ্ন ক'রলেন—ওঁর যোগ্যতা? আমি বল্‌লাম—এম, এ, বাংলায়। তিনি ব'ললেন—না না, একজন গ্রাজুয়েট টিচারকে দিন। আমি সবিনয়ে ব'লনাম—আজ্ঞে ও ত বি, এ, পাশ ক'রেছিল ইংরিজি নিয়েই। তিনি বিরক্তির সঙ্গে ব'ললেন—তা হোক্, তা হোক, একজন গ্রাজুয়েটকে দিন। শুধু হাকিম নয়, সকলেই এই কথা বলেন। এক্ষেত্রে এই ভদ্রলোকের যে সর্বনাশটা করা হ'য়েছে তার জন্মে দায়ী কে? আশুতোষ একটা ভুল পথে পরিচালিত হ'য়ে কতকগুলো লোকের জীবন মাটি ক'রতে সমর্থ হ'য়েছেন বলে তাঁকে মহাপুরুষ বলা যেতে পারে—অন্য কোন কারণে নয়। যে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা মাতৃভাষা জানাকে মূর্খতার পরিচয় বলে মনে করে, সেই দেশে যিনি মাতৃভাষার উন্নতি ক'রতে চেষ্টা করেন তিনি যিশুখ্রীষ্ট বা জোয়ানের মত বোকা। অধিকন্তু তিনি উন্নতি ক'রতে পারেন নি এবং কতকগুলো লোকের জীবিকা হরণ ক'রেছেন—তিনি অনুগ্রহ ক'রে এ উপকারটুকু ওই দুর্ভাগ্যদের না করলেও পারতেন।

মিস্ বসু বলিলেন—একটি দুর্ভাগ্য লোকের জন্মেই কি [illegible] মত মনীষীকে নিন্দা করা যায়?

—একটা নয়, বহু। ওটা উদাহরণ। আচ্ছা, তার পরে ডাঃ হালদারের শিক্ষার উন্নতি—শিক্ষা হবে দুর্লভ, তাকে সুলভ করে কতকগুলো লোকের চৈতন্যোদয় করে দিয়েছেন, কাজেই শীত গ্রীষ্ম সুখ দুঃখ তারা বুঝতে শিখেছে—দেশে দুঃখই বেড়ে গেছে তার ফলে। কতকগুলো ছেলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে নাকাল হ'চ্ছে—না পাচ্ছে চাকুর, না পারছে জীবিকা উপার্জন ক'রতে। একটা ঘটনা ধরুন। ম্যাট্রিক পাশ ক'রে আমার এক সহপাঠী রেলে চাকুরি পেলে, এখন তার মাইনে দেড়শ' আর উপরি আছে কিছু। সে বাড়িতে দালান দিয়েছে, জমিজমা ক'রেছে। আর এক সহপাঠী বি, এ, পাশ ক'রে চারিপাশে ঘোর অন্যায় দেখে কি একটা বক্তৃতা দিয়েছিল, ফলে তার

হ'ল জেল। সরকারী চাকুরি মিল্লো না—এখন সে টিউশনি ক'রে খায় আর ছেলেরা তাকে পাগল মাস্টার বলে। শিক্ষা বিস্তারের নামে তিনি এই যে অশেষ উপকার করেছেন সহৃদয় যুবকদের তা দেখে আপনারা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা তারিফ ক'রবেনই কিন্তু আমি ক'রতে পারলাম না বলে দুঃখিত।

ডাঃ হালদার উষ্মাপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন—তবে কি আপনি ব'লতে চান—শিক্ষা বিস্তার ক'রে এবং বাংলা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান দিয়ে তিনি অন্যায় করেছেন?

মানবেন্দ্র হাসিয়া উঠিল। ক্ষণিক পরে ধীরে ধীরে কহিল—আপনি উত্তেজিত হয়েছেন ডাঃ হালদার তাই ভুলে যাচ্ছেন। আমি অন্যায় বলি নি, আমি বলেছি তিনি বোকা ছিলেন। যিনি কাঞ্চন কৌলিন্যের দেশে শিক্ষা-কৌলিন্য চেয়েছেন তিনি বোকা ছাড়া কি? যেমন ধান রোপণ করাটা বুদ্ধিমানের কাজ। যিনি উর্বর জমিতে ধান বপন করেন তিনি বুদ্ধিমান সন্দেহ নেই কিন্তু যিনি মরুভূমিতে ধান ছড়ান তাঁর ভাগ্যে গাছ জোটে না, খই জোটে—সেক্ষেত্রে যদি এই কৃষককে আমি তারিফ ক'রতে না পারি তবে সেটা কি আমার পক্ষে খুব অন্যায় হবে!

ডাঃ সেন বলিলেন—আপনার কথা বুঝেছি কিন্তু যে দেশ অনুন্নত সে দেশে নেতারা হয়ত অকৃতকার্য হয়েছেন কিন্তু তাই বলে তাঁদের সৎসাহস ও দানকে আমরা অগ্রাহ্য ক'রতে পারি না।

—অনুন্নত, বলেন কি? যে দেশে এত হাকিম, এত পুলিশ, এত উকিল মোক্তার, এত ল' মেম্বর, এত রায় বাহাদুর, এত নেতা, এত লিমিটেড কোম্পানি ফেল হচ্ছে, এত ডাক্তার, এত কেরানী, এত ফিলিম কোম্পানি দিতে পেরেছে সে দেশ অনুন্নত? এটা কি ব'ললেন ডাঃ সেন? যে নেতা এই রকম দেশে অকৃতকার্য হবেন তিনি নেতৃপদবাচ্যই নন। কথাটা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মানবেন্দ্র হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে অকস্মাৎ একটা বিস্ফোরণ হইয়াছে এমনি সচকিতভাবে সকলে মানবেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল। মানবেন্দ্র বলিল—আগেই ত বলেছি ছোট জিনিস বড় ক'রে দেখা আমার অভ্যাস—কাজেই রক্তের ফোঁটার মাঝে রোগ বীজাণুই কেবল আমার চোখে লাগে, রক্তকণিকার সৌন্দর্য দেখ্তে ভুলে যাই। বাংলা দেশে এমন একটা লোক বের ক'রতে পারেন যে অন্যের চেয়ে কম

বোঝে? তিনি যদি সত্যিকার বুদ্ধিমান হ'তেন তবে ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে সর্বোচ্চ বিজ্ঞতা লাভ ক'রে পরম নিশ্চিন্তে পুরুষানুক্রমে হাকিমী ভোগ ক'রতেন অথবা কালোবাজারে প্রচুর ধনশালী হ'য়ে, মোটর হাঁকাতেন আর আপনাদের মত ব্যক্তির প্রতি করুণার দৃষ্টি রেখে সগর্বে পৃথিবী কাঁপিয়ে চলতেন। বাংলা ভাষার উন্নতি ক'রতে গিয়ে নিজের ও পরের সর্বনাশ ক'রতেন না। অথবা যদি মিঃ লাহিড়ীর মত একখানা ছবি তৈরি ক'রে বাংলার রসিকগণকে অনুপ্রাণিত ক'রতে পারতেন এবং আনন্দ ভোগ ক'রতে পারতেন তবে তাঁকে বুদ্ধিমান বল্‌তে কোন বাধা থাক্‌তো না।

মিঃ লাহিড়ী হাসিলেন মাত্র কিন্তু কোন জবাব দিলেন না। চন্দনা কহিল—ছবি দ্বারা কি দেশের বা মাতৃভাষার সেবা করা যায় না?

মানবেন্দ্র কহিল—অবশ্যই যায় এবং সেটা সুবুদ্ধি প্রচেষ্টা ব'লতে আমি বাধ্য। তবে দেশকে, তার মানুষকে, তার সঙ্গে নিজেকে সেবা করারও সুযোগ আছে, অন্তত অন্যকে ফাঁকি দিয়ে নষ্ট করবার সুযোগ নেই।

মিঃ লাহিড়ী বলিলেন—হ্যাঁ। ছবির এই সেবা ও দান আজও বাংলা বুঝতে পারে নি।

—অচিরেই বুঝবে। সেদিন আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন, সুভাষকে ভুল্‌বে কিন্তু লাহিড়ীকে ভুল্‌বে না, বিবেকানন্দকে ভুলবে কিন্তু চন্দনাকে ভুলবে না। সেই শুভ দিন সমাগতপ্রায়, সত্যিকার বাঙালী সৃষ্টি হ'য়ে বাংলাকে অচিরেই পরম শান্তিদান ক'রবে।

হালদার এতক্ষণে হাসিয়া বলিলেন—এও কি কখনও সম্ভব যে বিবেকানন্দকে ভুলে মানুষ মিস্ চন্দনাকে মনে রাখবে?

মানবেন্দ্র কহিল—হ্যাঁ, সে শুভদিন আগতপ্রায়, আপনারা শীগ্‌গিরই সেদিন দেখতে পাবেন। কারণ আর্ট সত্য শাশ্বত, বিবেকানন্দের জীবন আর্টহীন—কি বলেন লাহিড়ী?

লাহিড়ী আত্মপ্রসাদের সঙ্গে বলিলেন—এতদিন আপনার কথার প্রতিবাদই ক'রেছি কিন্তু আজ তা সমর্থন ক'রতে হ'ল। বিবেকানন্দের জীবন রোমাঞ্চকর কিন্তু তাতে রোমান্স নেই, নইলে তাঁকে নিয়ে ভাল ছবি হ'তে পারতো।

মানবেন্দ্র দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল—হ্যাঁ, ভদ্রলোক মরে বেঁচে গেছেন বহুদিন, তা না হ'লে বাঙালীর স্মৃতিশক্তির উপর অত্যাচার চালাতেন। যাক্,

আমরা আশুতোষের জীবনকে ছেড়ে অনেকদূর চ'লে এসেছি—ডাঃ সেন, আপনারা ঔদ্ধত্য মার্জনা ক'রবেন আশা করি, সত্যভাষণে বা নিজের কথার অসঙ্কোচ প্রকাশকে আপনারা নিশ্চয়ই দোষারোপ ক'রবেন না।

ডাঃ সেন বলিলেন—না না, তবে আমরা আপনার কথা স্বীকার না ক'রলে নিশ্চয়ই দুঃখিত হবেন না।

—সে আশঙ্কা নেই।

মিস্ বসু বলিলেন—আপনি যা বললেন তা কি আপনি বিশ্বাস করেন? আপনিই একদিন বলেছিলেন, যে আপনার ফিলজফিকে বিশ্বাস ক'রতে পারে সে মানুষ খুন করতে পারে।

মানবেন্দ্র কহিল—বিশ্বাস করার কথা নেই, তা ছাড়া ওটা আমার ফিলজফি নয় একটা মতবাদ মাত্র। যেমন আপনারা কিছুতেই পুরাতন মতকে অবিশ্বাস ক'রতে পারছেন না। যেমন হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ দিতে চাইলেও তাঁরা করেন না। মানুষ যদি সবরকম কমপ্লেক্‌স্‌হীন হয় এবং জিনিসকে ঠিক ঠিক দেখতে পায়—যাকে বলা যায় in true proportion তবে তার পক্ষে পৃথিবীতে বাঁচা চলে না।

বিশ্বাস প্রশ্ন করিলেন—কেন?

—সে কাউকে ভালবাস্‌তে পারে না। কোন জিনিসেই আনন্দ পায় না, সমস্ত পৃথিবী একটা চিড়িয়াখানা হ'য়ে তার জীবনকে ঘিরে দিবারাত্রি এমন ব্যঙ্গ করে যে সে চেষ্টা করলেও বেঁচে থাকতে পারে না। তারা আত্মহত্যা করে most rationally অর্থাৎ যৌক্তিকতা বিচার ক'রে ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে আত্মহত্যা করে।

মানবেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল—বিনা ভূমিকায়ই সে চিরদিন প্রস্থান করিয়া থাকে।

*

সেদিন রবিবার।

ডাঃ সেন সকালে বেড়াইতে বেড়াইতে মিস্ বসুর বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এরূপ আগমন তাঁহার আকস্মিক নয়—অযাচিত ভাবে তিনি বহুদিন বহুবার আসিয়া বসুর কুশল প্রশ্ন করিয়া গিয়াছেন। মিস্ বসু জানিতেন ডাঃ সেন তাঁহাকে স্নেহ করেন এবং সেই জন্যেই তিনি এমনি আন্তরিকভাবে ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া তুলিয়াছেন।

মিস্ বসু একটু চা'র বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়া বলিলেন—বসুন, ডাঃ সেন। অকস্মাৎ আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে মনে পড়লো!

ডাঃ সেন যথাসম্ভব সংযমের সহিত উত্তর করিলেন—মনে পড়াটা অত্যন্ত আকস্মিক রকম ভেবে নেওয়ার সঙ্গত কোন হেতু পাচ্ছি না ব'লে দুঃখিত।

মিস্ বসু জানিতেন কথাটা ক্রমশ কোন্ পথে অগ্রসর হইবে। ডাঃ সেন বহুদিন আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ করিয়াছেন এবং মিস্ বসু সে আন্তরিকতাকে যথেষ্ট সহানুভূতির সহিত বিচার করেন নাই বলিয়া অভিযোগও করিয়াছেন। মিস্ বসুর সহানুভূতির অভাব ছিল না কিন্তু লাভক্ষতির বিচার তাঁহাকে সংশয় মণ্ডিত করিয়া দিয়াছিল বলিয়া ডাঃ সেনকে অস্বীকার করিতে হইয়াছে। মিস্ বসু যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে বিষয়ান্তরে প্রশ্ন করিলেন—আজ সন্ধ্যায় ঐ আড্ডায় যাচ্ছেন ত?

—ভাল লাগে না। নিত্যই যেন সেটা ভাল লাগে না, নেহাৎ কাউকে পাই না তাই যাই। সন্ধ্যাটা যেন আর কাটে না।

—কেন, ঘরে বসে স্ত্রীপুত্র পরিবার নিয়ে বেশ গল্পগুজব করুন।

—ঘরে বসে? সেই একঘেয়ে তেলনুনের হিসাব কতক্ষণ ভাল লাগে! সে খাঁচা থেকে বেরিয়ে প্রাণটা যেন নিশ্বাস নিয়ে বাঁচে।

মিস্ বসু প্রশ্ন করিলেন—মানবেন্দ্রবাবুকে কেমন লাগে?

ডাঃ সেন একটু উপেক্ষার সঙ্গে বলিলেন—বিদ্যাবুদ্ধি যাই থাক, লোকটার কথা ব'লবার ক্ষমতা আছে—যে গুণ থাকলে মিথ্যাকে উকীলরা সত্য বলে প্রমাণ ক'রতে পারে।

—আমার কিন্তু ভাল লাগে না। চলতি রীতি-নীতির বিরুদ্ধে কিছু বলাই যেন তাঁর স্বভাব। সকলে যা বলে তিনি তা কিছুতেই ব'লবেন না। বিদ্বান হ'তে পারেন কিন্তু এমনি ভাবে সবকিছু উপেক্ষা করা যেন—

ডাঃ সেন কি যেন চিন্তা করিয়া বলিলেন—না না, সবখানি তা নয়। যা বলেন তা অনেক সময় সত্যি; কিন্তু অত সত্যি কথা বলা ভাল নয়—ওতে লাভ নেই বরং অপ্রিয় হ'তে হয়।

—ধরুন সেদিন যে আপনাকে বল্লেন যে, শিক্ষিতা মেয়ে বিয়ে ক'রতে পারেন নি বলেই আপনি সনাতন পন্থী—এটা কি সত্য বলে মনে করেন আপনি ?

ডাঃ সেন হঠাৎ কোন জবাব দিলেন না। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বলিলেন—সত্যি কথা বলা সকল সময় ঠিক নয়। যথার্থ উত্তর দিতে হ'লে তাঁর কথা কিছুটা স্বীকার করতেই হয়—নইলে মিথ্যা বল্‌তে হয়।

—বলুন না।

—আমি স্ত্রীপুত্র পরিবারকে ভালবাসি না এমন নয়, নইলে এত শ্রম বিনা দ্বিধায় এবং সানন্দে ক'রতে পারতুম না, তবুও যেন একটা অতৃপ্তি তার মধ্যে বড় হ'য়ে ওঠে—তার অজ্ঞাত প্রভাব মনটাকে ভারী ক'রে দেয়। সব ভাল লাগে—স্ত্রীর সারল্য, অমার্জিত আব্দার, সব কিছুতেই রোমাঞ্চিত হই কিন্তু তবুও মনে মনে ভাবি—মনের সাথী নেই। আমি যেখানে গিয়ে চিন্তা করি সেখানে সে যেতে পারে না। তাই পালিয়ে আসি আপনার কাছে, মনের ভাবনার প্রকাশে,আপনার মাঝে একটা মানসিক সঙ্গী পাই—আপনার সঙ্গ পাওয়ার একটা লোভ আমার মাঝে দুর্দমনীয় হ'য়ে ওঠে।

মিস্ বসু হাসিয়া বলিলেন—তবুও ত আপনি আমাদের নিন্দে করেন।

—করি, অস্বীকার করে লাভ নেই। মনের সাথী মিলে না বলে যেমন আপনাদের কাছে পালিয়ে আসি, তেমনি আপনাদের কাছে ওই অকপট নির্ভরতা ও সারল্য পাই না ব'লে তাদের কাছে ফিরে যাই। তাই মাঝে মাঝে মনে হয় ডাঃ হালদারের মতবাদই বোধ হয় সত্য—তাঁকে যেন শ্রদ্ধা করি, মানুষের অন্তরকে গভীর দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখেছেন।

মিস্ বসু যুক্তি দেখাইলেন—কিন্তু এমনি খুঁজে বেড়ানোর লাভ ?

—লাভ ক্ষতির বিচারই কি মানুষ সর্বদা করে ? তা হ'লে কি মানবেন্দ্রের মত মানুষ অন্যের অন্নদাস হ'য়ে থাক্‌তে পারে ?

—সত্যই ওর জীবন যাত্রা অদ্ভুত। লোকটার সম্বন্ধে বড় কৌতূহল হয় —কেন লোকটা এমন ? নিজের উপার্জন ক'রবার শক্তি আছে, অথচ বিয়ে ক'রে গৃহস্থালী ক'রবার সাহস নেই।

ডাঃ সেন ব্যঙ্গ করিলেন—উপার্জন ক'রেও ত আপনি বিবাহ ক'রতে পারেন নি ?

মিস্ বসু ডাঃ সেনের প্রতি একটু কটাক্ষ করিয়া কহিলেন—কিন্তু তা'তে কি? সেইটাই আমার একটা অপরাধ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে?

—হ্যাঁ অপরাধ বৈকি? জগতের একটি মানুষকে আপনি আপনার সাহচর্য দিয়ে সুখী ক'রতে পারতেন কিন্তু করেন নি এবং নিজেও সুখী হন নি।

—আমার সাহচর্যে খুশি হবে এমন লোক ত আমার চোখে পড়ে না ডাঃ সেন।

ডাঃ সেন হাসিয়া বলিলেন—এটা আপনার বিনয়, নইলে আমি গৃহ ফেলে আপনার কাছে আসি কোন্ লোভে? আপনার সঙ্গে কথা ব'লে এত তৃপ্তি পাই কেন?

মিস্ বসু একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন—সম্ভবত স্নেহ করেন বলে।

—স্নেহ লোকে করে না। আপনার গুণে লোকে স্নেহ আকর্ষণ করে।

—মানবেন্দ্রবাবু ত সব কিছুকেই গালাগালি করেন, তাঁকে কি কেউ ভালবাসে না?

—হ্যাঁ বাসে বই কি?

—তবে তিনি বিয়ে করেন নি কেন?

ডাঃ সেন মানবেন্দ্রের প্রসঙ্গে যেন একটু বিরক্ত হইয়াই জবাব দিলেন—আপনার বিবাহ না করার কারণও যেমন আমাদের অনধিগম্য, তেমনি তাঁর অবিবাহিত জীবনের কারণও আপনার অজ্ঞাত।

—কিন্তু যাই বলেন, আশুতোষের মত মনীষীকে গালাগালি করাটা তাঁর ভাল হয় নি। এটা সংস্কার ও নীতির বাইরে—যাঁর এত বড় দান—

ডাঃ সেন বলিলেন—কিন্তু আমার যেন মনে হয় লোকটা তাঁকেই সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করে—তাই ব'ললে তিনি যিশুখৃস্ট বা জোয়ান অব আর্কের মত বোকা—তাঁকে প্রশংসাই করেছে সেদিন। যে জন্যে হোক্, দেশের উপর, বর্তমানের উপর তার একটা বিজাতীয় ক্রোধ আছে—এটা তার উচ্চাদর্শের প্রতীক।

মিস্ বসু চিন্তান্বিত হইয়া বলিলেন—লোকটা বিপ্লবী বা অমনি কোন রকম কিছু নয় ত?

—বিচিত্র কি!

—তবুত লোকটার মাঝে যেন একটা দুর্নিবার আকর্ষণ আছে। ওঁর জন্যেই যেন আদিত্যবাবুর আড্ডাটা এত ভাল লাগে!

ডাঃ সেন একটা দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া কহিলেন, জগতের নিয়মই এই। আপনি হয়ত সেখানে যান মানবেন্দ্রমণ্ডিত আড্ডার মোহে—আমি যাই হয়ত আপনার মোহে। এ জগতে তাই শান্তি মিলে না, জীবনে অতৃপ্তির বোঝা বেড়ে চলে—ওটা স্বভাব, ওর জন্যে দুঃখিত হওয়া চলে কিন্তু অভিযোগ করা চলে না।

মিস্ বসু সহানুভূতির সঙ্গে একটু হাসিলেন।

*

সাহিত্য সভার প্রথম সাধারণ অধিবেশন সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভান্তে সাহিত্যিক শ্যামলবাবুকে একটু চা দিয়া আপ্যায়িত করিবার কথা ছিল, তাই কলেজের শিক্ষকগণের কক্ষে কর্মকর্তাগণ, প্রফেসরগণ ও অতিথি সমবেত হইয়াছিলেন এবং মহিলারা চা পরিবেশন করিতেছিলেন।

তপন টেবিলের এককোণে বসিয়া চা'র প্রতীক্ষা করিতেছিল। শ্যামলবাবু চা'এর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মতবাদ সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিতেছিলেন। রেণুকা চা ও খাবার লইয়া তপনের সামনে রাখিয়া পরিহাস করিল—রেস্তোঁরার চা আপনার ভালই লাগবে।

—ও! তপন আর কিছু বলিবার পূর্বেই রেণুকা বলিল—ঠাণ্ডা হয়ে গেল, খেয়ে নিন। একটু পরেই মণিকা চা হাতে করিয়া আনিয়া আশ্চর্য হইয়া বলিল—ও তপনবাবু, এরই মধ্যে চা পেয়ে গেছেন!

তপন কৃত্রিম মূঢ়তার সঙ্গে বলিল—ফেরত নেবেন নাকি?

—তার মানে, আর একটু চাই নাকি?

তপন বলিল—এককাপ চা আমি কখনও খাই না।

মণিকা হাসিয়া চায়ের কাপ রাখিয়া গেল। শ্যামলবাবু কি বলিতেছেন তাহা ভাল করিয়া শুনিবার মত আকাঙ্ক্ষা সে পোষণ করে না। সে রেণুকা ও মণিকার এই চা দেওয়া ও পরিহাসকে মনে মনে নানা রঙে রঙীন করিয়া দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল। ওদের এই নৈকট্য যেন তাহার মনকে দুর্নিবার আকর্ষণে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। কোথায় তাহা সে জানে না, অথচ ভাসিয়া যাইতে বেশ একটা আনন্দ হয়। তপন ভাবিয়া যাইতেছিল—

জনৈক প্রফেসর তপনকে ডাকিলেন কিন্তু তপন সাড়া দিল না, তাহার মন

তখন অতীন্দ্রিয় এক সুখাবেশে আপনার অস্তিত্বকে ভুলিয়া গিয়াছে। আর একজন প্রফেসর টিপ্পনী করিলেন—তপন ঘুমলে নাকি?

তপন তাড়াতাড়ি জবাব দিল—আজ্ঞে হাঁ।

সকলে হাসিয়া উঠিল। তপনের কথায় ততটা নয় যতটা তাহার বলিবার ভঙ্গিতে। প্রফেসর প্রশ্ন করিলেন—এত সকালে ঘুমুলে কি হে?

—আজ্ঞে স্যর, কাল রাত্রে ঘুমুই নি।

—তপনের কিন্তু অজুহাতের কোনরূপ দ্বিধা নেই। সব কাজেরই একটা বেশ নির্ভীক কারণ থাকে। তবে ঘুমুলে না কেন?

তপন কপট গাম্ভীর্যের সহিত বলিল—আজকার অনুষ্ঠানের দুর্ভাবনায়।

সকলে পুনরায় হাসিয়া উঠিলেন। রেণুকা হাসিতে হাসিতে বলিল—যাই করুন ওঁকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে আপনাকেই।

—আজ্ঞে সে ত যেতেই হবে, তবে—

—এ্যাক্সিডেন্ট ক'রবেন না যেন ঘুমুতে ঘুমুতে।

প্রফেসর প্রশ্ন করিলেন—রেণুকা ও মণিকা তোমরা যাবে কি ক'রে এখন।

রেণুকা নিঃসঙ্কোচে বলিল—কেন ওই গাড়িতেই যাবো। বেশি দূর ত নয়—শ্যামলবাবুর বাসা থেকে আমরা যেতে পারবো।

—বেশ তাহলে তাই ঠিক রইল।

*

শ্যামলবাবুকে তাহার বাসায় নামাইয়া দিয়া নমস্কারান্তে তপন ফিরিয়া আসিয়া নিজের স্থানে বসিতে বসিতে বলিল—গাড়ি বুঝি আবার স্টার্টই নেবে না।

মণিকা কহিল—ও ভয়ে আমরা ভয় পাই নে, আমরা হেঁটেই ওটুকু যেতে পারবো।

—কিন্তু পথে গুণ্ডা আছে যে!

মণিকা বলিল—তা থাক গে। গুণ্ডারা আমাদের কি ক'রবে?

রেণুকার কাছে এ উত্তরটা পাইলে তপন হয়ত বিস্মিত হইত না কিন্তু ক্ষুদ্রকায়া মণিকার মুখে জবাবটা পাইয়া আশ্চর্য হইল। সে কহিল—কি ক'রতে পারে জানি না, তবে তারা যে আপনার খুব হিতৈষী নয় তা বোধ হয় অনুমান ক'রতে পারেন?

তপন স্টার্ট দিল।

রেণুকা বলিল—আপনি সভায় অমন চুপ করে থাকেন কেন বলুন ত?

—নির্বাকভাবে থাকাটাই বিজ্ঞতার পরিচয়—কি ব'লতে কি ব'লবো আর ওরা আমার পেটের বিদ্যে আঁচ ক'রে ফেলুক আর কি?

মণিকা বলিল—আমরা কথা বললেও ত চুপ ক'রে থাকেন, উত্তর দেন না।

তপন হাসিয়া বলিল—আজ্ঞে ভয় হয়।

—কেন?

—বেশি কথাবার্তা ব'ললে যদি শেষে ভাল-টাল বেসে ফেলি—শেষে একটা অনর্থ ঘটাবো?

রেণুকা বলিল—অনর্থ ঘটবে কেন? আপনার মোটর ও ঐশ্বর্য যারা দেখবে তারা ত আপনার ভাল-টাল বাসাকে অবহেলা ক'রবে না।

তপন একটু ইতস্তত করিয়া কহিল—কিন্তু সেটা ত আপনারাও অবহেলা ক'রেছেন, যদি ভরসা দেন তবে না হয় স্বচ্ছন্দ মনে কথাবার্তা ব'লি।

মণিকা কহিল—যা হোক্, এখন ত বেশ শ্লেষ ব্যঙ্গ চ'লছে? সভায় ব'সলেই বুঝি সব বুদ্ধির দরজায় খিল পড়ে যায়!

মোটর চলিল।

রেণুকা বলিল—সে যাই হোক্, সাম্‌নের অনুষ্ঠানে আপনাকে কিছু না কিছু বলতেই হবে। আমাদের ক্লাশ থেকে কিছু না পড়া হ'লে ভাল দেখায় না।

তপন যুগপৎ দুইটি ব্রেক টানিয়া দিয়া বলিল—এমন কথা ত ছিল না—পূর্বেই আমি সে শর্তে রাজি হই নি।

রেণুকা কহিল—রসিকতা রাখুন, ভাল ছেলেটির মত আজ থেকে একটা কিছু লিখতে শুরু করুন।

মণিকা প্রক্ষেপ করিল—কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, ব্যঙ্গরচনা যা খুশি।

তপন কৃত্রিম রোষে কহিল—দেখুন সহনশীলতার একটা সীমা আছে। আপনারা ভদ্রমহিলা, আপনাদের সঙ্গে হাতাহাতি করা যায় না কিন্তু অন্য উপায় আছে।

—কি উপায়?

—গাড়ি সমেত গঙ্গায় নামিয়ে দেব

রেণুকা হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ, বীরপুরুষ বটে। আপাতত রাস্তা দিয়ে চলুন ত, রাত্রি হচ্ছে।

তপন পুনরায় গাড়ি চালাইয়া দিল। মণিকাকে তাহার বাড়ির দরজায় নামাইয়া দিতেই রেণুকা কহিল—ব্যাক করুন, পিছনের রাস্তা দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি হবে।

তপন ব্যাক করিয়া কহিল—কোন্ দিকে যাবো ?

রেণুকা কহিল—সোজা ডাইনে যাবেন যতক্ষণ না বলি থামতে।

তপন যথারীতি রেণুকার কথামত থামিল। রেণুকা নামিতে নামিতে বলিল—ধন্যবাদ, আপনাকে ছুটি দিলাম। কিছু মনে ক'রবেন না।

তপন জবাব দিল—মনে করলেও বলবার যো নাই যেহেতু আপনারা ভদ্রমহিলা, এক্ষেত্রে আমি অনুগৃহীত হ'য়েছি বলাই ভদ্রতাসঙ্গত।

—মনে মনে ভাবলেও বলা ঠিক নয়। নমস্কার। একটু চা খাবেন কি ?

তপন গাড়িতে পুনরায় স্টার্ট দিয়া কহিল—বিনা নিমন্ত্রণে নয়। রাত্রি হয়েছে—আসি।

গাড়ি চালাইতে চালাইতে সে ভাবিল—এমনি করিয়া দুইটি মেয়ের কথা মত মাহিনা করা ড্রাইভারের ন্যায় বাড়ি বাড়ি পৌঁছাইয়া দেওয়াটা যেন সঙ্গত হয় নাই। তপনের আভিজাত্যে যেন আঘাত লাগিয়াছিল—সে ভাবিল এ দৈন্য না দেখাইলেই ভাল হইত; কিন্তু এক্ষেত্রে ভদ্রতা না করিলে উপায়ান্তর ছিল না। তথাপি এই দুইটি মেয়ের আদেশে এই শ্রম স্বীকার করিয়া সে যেন একটা অজ্ঞাত আনন্দবোধ করিতেছিল। ওরা কেমন সরল সহজ ভাবে তাহার নিকট দাবী জানাইয়াছে! এ দাবীকে অস্বীকার করা হৃদয়হীনতা—তপন একটি অভিযান করিয়া ফিরিয়া যাইতেছে এমনি আনন্দে বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

*

তপতী আজ দুইদিন লক্ষ্য করিয়াছে—ফিরিবার সময় পানের দোকানের সামনে সেই পরিচিত খঞ্জ ভদ্রলোকটি আর দাঁড়াইয়া থাকে না। পথেও কোথায়ও দেখা হয় না। তপতী অপেক্ষা করিতেছিল কিন্তু আজও হরিচরণ তাহার স্থানটিতে দাঁড়াইয়া নাই। তপতী মনে মনে বিচার করিয়া দেখিল, সে

যাহা বলিয়াছে তাহাতে হরিচরণের পক্ষে ক্ষুণ্ণ হইবার কিছু নাই বরং যদি তাহার কাণ্ডজ্ঞান থাকিত তবে সে উৎসাহিতই হইত। মুখের কথাই কথা নয়, মুখের নিন্দাস্তুতিই নিন্দাস্তুতি নয়। মনে মনে মানুষ যেমন একটা অজুহাত ঠিক করিয়া মনের অন্যায় আজ্ঞাও পালন করে তপতী তেমনি ভাবেই কি যেন ফেলিয়া আসিয়াছে এমনি ব্যস্ততার সঙ্গে পুনরায় কলেজে ফিরিয়া গেল। প্রতাপসিংহ হলদিঘাটের যুদ্ধক্ষেত্রে সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া যদি দেখিতেন মোগল সৈন্য কেহই উপস্থিত হয় নাই তবে তাঁহার বীর হৃদয় যেমন একটি অনাবশ্যক শূন্যতায় ভরিয়া উঠিত, তপতীর মনও যেন তেমনি একটি শূন্যতায় ভরিয়া উঠিল। রং করা এক টুকরা সোলাকে আধমণ লোহা মনে করিয়া সবলে তুলিতে গেলে যেমন লোকে বেকুব হয়, তপতীর মনটাও যেন অমনি বেকুব বনিয়া গিয়াছে।

তপতী হঠাৎ দেখে হরিচরণ নেঙচাইতে নেঙচাইতে আসিতেছে। সম্মুখীন হইতেই তপতী সহসা একটা নমস্কার জানাইয়া প্রশ্ন করিল—ভাল আছেন হরিচরণবাবু?

হরিচরণ অত্যন্ত সংক্ষেপে কহিল—হুঁ।

—বয়কট করলেন নাকি? তপতী হাসিয়া উঠিল।

—আপনার প্রয়োজন ত শেষ হয়ে গেছে—আর কেন?

তপতী ঈষৎ ব্রীড়াভঙ্গি করিয়া কহিল—আপনার?

—হ্যাঁ, শেষ হয়েছে।

—এত অকস্মাৎ?

হরিচরণ স্বভাবসুলভ তীব্রদৃষ্টিতে তপতীর মুখখানা দেখিয়া লইয়া কহিল—যে দরিদ্র, তাকে ব্যঙ্গ ক'রবার মধ্যে পৌরুষ নেই, যে অপরিজ্ঞাত তাকে ব্যঙ্গ করে লাভ নেই।

—স্ত্রীলোকের মাঝে পৌরুষ না থাকাই ত ভাল। চলুন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলা যায় না।

হরিচরণ চলিতে চলিতে বলিল—পৌরুষ মানে বীরত্ব বা বাহাদুরী নয়।

—ট্রামে যাবেন ত?

—না, হেঁটে যাবো।

—কেন?

—পয়সা নেই।

তপতী বলিল—তবে চলুন আমিও খানিক পথ আপনার সঙ্গে হেঁটে যাই—কেমন?

—না, আপনি ট্রামেই যান। আমার জন্যে আপনাকে এ কষ্ট করতে হবে না।

তপতী বলিল—আচ্ছা সেই ভাল; চলুন আজ আমাদের বাড়ি যাই।

হরিচরণ থামিয়া দাঁড়াইয়া একটু জড়িত কণ্ঠে বলিল—আর কেন? যথেষ্ট করুণাই ত আপনি করেছেন। আর সহৃদয়তা না হয় নাই দেখালেন, তাতে বিশ্বের কারও কোন ক্ষতি হবে না। যারা আপনার কৃপাপ্রার্থী তাদের প্রতি করুণা ক'রে তাদের ধন্য করুন। আমাকে মার্জনা করুন। হরিচরণ উত্তরের জন্য কোনরূপ অপেক্ষা না করিয়া অত্যন্ত উদ্ধত পদক্ষেপে চলিয়া গেল। তপতী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল। ওই ক্ষুদ্র কুৎসিত দেহের মাঝেও একটা অপরিসীম আভিজাত্য আছে—সেই আভিজাত্য তাহার সমস্ত দীনতাকে ঢাকিয়া যেন তাহাকে বড় করিয়া তুলিয়াছে। হরিচরণের তীব্র তিরস্কার যেন তপতীর অন্তরে একটা অনির্বচনীয় সুখাবেশের প্রলেপ দিয়া গিয়াছে—সে মনে মনে হরিচরণকে আজ প্রথম শ্রদ্ধা করিল।

*

তপনকুমার মানবেন্দ্রকে একটা অবান্তর আশ্রিতজীব বলিয়া অনুমান করিয়া লইয়াছিল কিন্তু দুই একদিন পরিচয়ের পরে অকস্মাৎ একদিন তাহাকে যেন বেশ ভাল লাগিয়া গেল। লোকটির কথাগুলি যেন বেশ চোখা চোখা—তাই তপন মাঝে মাঝে আসিয়া তাহার সহিত আলাপ করিয়া যাইত—আলোচ্য কোন বিষয় থাকিত না, অবান্তর কথাই হইত। নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে কলম দিয়া হিজিবিজি লেখার মত সে আলাপ—মানবেন্দ্র কি জবাব দিত সে তাহা অতটা লক্ষ্য করিত না।

তপন আজ দ্বিপ্রহরে আসিয়া একটু ব্যস্ততার সঙ্গে প্রশ্ন করিল—মানবেন্দ্র-বাবু, সামুদ্রিক বিদ্যা সম্বন্ধে একখানা ভালো বইএর নাম বল্‌তে পারেন?

—কেন কি হবে?

—কিনবো।

—হঠাৎ ? বসুন ভেবে চিন্তে বলি। তপন ব'সিয়া পড়িয়া বলিল—দামের কোন কথা নেই, বইখানা ভাল হওয়া চাই।

মানবেন্দ্র বলিল—এ সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা আছে—ওই বিদ্যাটার উপর তাদেরই বেশি ঝোঁক পড়ে যারা বেকার, তারপর আর তারাই, যারা প্রেমে পড় পড় ক'রছে। প্রথমটা আপনার বেলায় খাটে না। দ্বিতীয়টা হয় ত প্রযোজ্য হতে পারে।

তপন ব্যস্ততার সঙ্গে বলিল—ধরুন তাই। তাতে ত এমন কিছু পাপ হয় না—এখন বইখানার নাম বলুন দেখি ?

—কাল অত ব্যস্ততার সঙ্গে কোথায় গেলেন ?

তপন বিরক্তির সঙ্গে বলিল—নামটা ব'লতে পারলেন না ? বইখানার নামের জন্যে তপনের যতটা আগ্রহ ছিল তাহা অপেক্ষা মানবেন্দ্রের প্রশ্নের দিকটায় যে কম আগ্রহ ছিল তাহা বলা যায় না, তাই সে বইখানার নাম না পাইয়াও বসিয়া রহিল। তাহার অজ্ঞাতে সে ওই প্রশ্নকেই যেন আমন্ত্রণ জানাইতেছিল। সে তাই বলিল—কোথায় আবার ? কলেজের সেই সাহিত্য-সভার কাজ ছিল। কাল অধিবেশন ছিল কিনা।

মানবেন্দ্র আগ্রহের সহিত প্রশ্ন করিল—কি রকম হ'ল ?

তপন সবই সংক্ষেপে বর্ণনা করিল, রেণুকা মণিকাকেও যে অত্যন্ত বিরক্তি-সহকারে এবং একান্ত নিরুপায় হইয়াই বাড়ি পৌঁছাইয়া দিয়াছে তাহাও সে বাদ দিল না এবং সর্বশেষে মন্তব্য প্রকাশ করিল—আজকালকার মেয়েগুলিই যেন কেমন বেহায়া, অন্যের কাছে সাহায্য চাইতে এতটুকুও লজ্জা করে না।

মানবেন্দ্র কহিল—কাল আপনার জীবনে একটা স্মরণীয় অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।

—কি ?

—সেটা হ'চ্ছে এই যে কোন কোন ক্ষেত্রে সমস্ত আভিজাত্য বিসর্জন দিয়ে পরের আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মত কাজ ক'রে বেশ একটা পরিতৃপ্তি পাওয়া যায়।

তপন বলিল—তার মানে, ওদের পৌঁছে দিয়ে আমি আনন্দ পেয়েছি ! ছি ছি আমার সম্বন্ধে এমনি ধারণা হ'ল কি ক'রে ?

মানবেন্দ্র প্রতিবাদ করিল—পৌঁছে দিতে পেরেছেন বলে নয়—তারা আপনার উপর হুকুম চালানোর মত ঘনিষ্ঠতা ক'রে নিয়েছে বলে।

তপন হাসিয়া বলিল—মানুষ নানা রকম থাকে, একই আইনে সকলের বিচার চলে না। দুর্বলতা সকলেরই যে থাকে এমন নয়।

—না, সকলেরই যে সমান থাকে এমন নয়। কারও বেশি কারও কম।

—কারও কারও একেবারেই থাকে না।

মানবেন্দ্র কহিল—এমন যদি কেউ থাকেই তবে সে পার্থিব নর নয়। হয় জন্তু না হয় দেবতা, মানুষ সে নয়।

—পৃথিবীতে দেবতাও ত জন্মে।

—জন্মাতে পারে বটে কিন্তু বাঁচে না। তারা একেবারে দু'দিনে দেউলে হয়ে মরে যায়।

তপনকুমার বলিল—যাক্‌গে। তবে তাদের বেশ কিছু শুনিয়ে দিয়েছি।

মানবেন্দ্র হাসিয়া উঠিল। তপনকুমার যেন চুরি করিয়া ধরা পড়িয়া গিয়াছে এমন একটা বিহ্বল দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া চলিয়া গেল।

মানবেন্দ্র আবার হাসিয়া উঠিল। তপনের প্রস্থানের জন্য নয়, সামুদ্রিক বিদ্যার পুস্তকখানার নাম জানিয়া গেল না বলিয়া।

কিছুক্ষণ পরে।

অকস্মাৎ তপতী আসিয়া সহাস্যে অভিবাদন করিল—কি করছেন? পড়ছেন?

—না। কি সংবাদ, বেশ খুশি আছেন বলে মনে হয়।

—হ্যাঁ, একটা জিনিস আবিষ্কার ক'রেছি আজ, খোঁড়া মানুষেও খুব জোরে হাঁটতে পারে।—এ কথাটাও নিশ্চয়ই জান্‌তেন না।

মানবেন্দ্র একটু যেন চিন্তা করিয়া বলিল—ও, হরিচরণের কথা বুঝি? সে আজ কি ব'ললে? নিয়ে এলেন না কেন?

—ও বাবা, তাকে কি কথা বলা যায়। কথা ব'ল্‌তে না ব'লতেই ফোঁস ক'রে উঠে ছাইপাঁশ বলে যায়। আমি ব'ললুম—চলুন আমাদের বাড়িতে। সে বোকার মত চেয়ে থেকে বললে—আপনার করুণা পেতে যারা ব্যস্ত তাদের আপনি ধন্য করুন! কি বিশ্রী লোকটা বলুন ত? ওর সঙ্গে আর কথাই ব'লবো না। একটা সাধারণ ভদ্রতাবোধও নেই—ভদ্রমহিলার সম্মানটাও রক্ষা ক'রতে শেখে নি।

মানবেন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিল—ব্যাপারটা ঘনীভূত হ'য়ে আমাকে বিভ্রান্ত ক'রে দিচ্ছে—এমন ত সহসা হয় না।

—কি ?

—আপনি—তুমি যতই তার নিন্দে করছো ততই আমার সন্দেহ বেড়ে যাচ্ছে যে সে তোমার মনের মাঝে স্থান ক'রে নিচ্ছে। ব্যাপারটা ত ভাল নয় কারণ সে বিবাহিত, একটা দুর্ঘটনা ত ঘটতে পারে।

—দুর্ঘটনা আবার কি ? পরিচয় একটু হ'ল, ভুলে গেলেই সব ফুরিয়ে গেল।

মানবেন্দ্র সংক্ষেপে হুঁ বলিয়া চুপ করিল। তপতী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল—কি ভাবছেন ?

—ভাবছি যাবো কিনা ?

—কোথায় ?

—মিস্ চন্দনার বাড়িতে ?

—কেন ? সেখানে যাবেন কেন আপনি ? ছিঃ—

—একটা পার্টি হ'চ্ছে, নিমন্ত্রণ ক'রেছে। না যাওয়া কি ভাল ?

তপতী কহিল—তার নিমন্ত্রণ ক'রবার মত স্পর্ধাকে আমি মার্জনা ক'রতাম না। স্পষ্ট ক'রে বলে দিতাম, এমন নিমন্ত্রণ সুষ্ঠুতার বহির্ভূত।

মানবেন্দ্র হাসিয়া কহিল—সন্দেহ আরও বেড়েই চল্‌লো—তুমি কি শেষে আমাকেও ভালবাসলে নাকি ?

—বেশ ?—কেন ?

—নইলে এই sense of property তোমার মাঝে এল কি ক'রে ? আমার যাওয়াটা যেন আমার চেয়ে তোমাকে বেশি আঘাত করেছে।

তপতী কহিল—sense of property আবার কি, sense of decency, সেখানে গিয়ে আপনার লাভ ? আপনার যেতে ইচ্ছে হয়—

—যেতে ঠিক ইচ্ছে হয় তা নয় তবে অন্য কারণে যাওয়া প্রয়োজন। যেখান থেকে নিমন্ত্রিত হয়েছি সেটা দেখবার একটা ভয়াবহ রকমের কৌতূহল হয়েছে।

তপতী বলিল—বেশ যাবেন, আমার তাতে কি ? তবে—

মানবেন্দ্র হাসিয়া বলিল—ভয় নেই।

*

মানবেন্দ্র যখন চন্দনার ওখানে উপস্থিত হইল তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। নিমন্ত্রণের সময় হইয়া গিয়াছে কিন্তু একমাত্র সাহিত্যিক মলয়বাবু ছাড়া আর কেহ আসেন নাই। প্রবেশ দ্বারে চন্দনা তাহাকে অভ্যর্থনা করিল—আসুন, নমস্কার মানবেন্দ্রবাবু! আপনি যে আসবেন এত আশা করতে পারি নি।

—তবে নিমন্ত্রণ করলেন কেন ?

চন্দনা একটু সলজ্জ ভাবে অত্যন্ত স্নেহার্দ্রকণ্ঠে উত্তর দিল—দুরাশাও ত লোকে করে।

—হ্যাঁ। করুন।

বসিবার সজ্জিত ঘরে মলয়বাবু একখানি সোফায় বসিয়াছিলেন। মানবেন্দ্র ঢুকিতেই সাহিত্যিক বলিলেন—বসুন বসুন।

চন্দনা কহিল—মলয়বাবু, ব্যস্ত তা ত বুঝতেই পাচ্ছেন। আপনি ওঁর সঙ্গে কথা বলুন, আমি একটু দেখা শোনা করি। শেষে ত্রুটি হ'লে বড়ই লজ্জার কথা।

—তা সত্ত্বেও ত্রুটি হবে। ত্রুটি কেউ করে না, লোকে ধরে, যাক্ তা হ'লেও চেষ্টা করা দরকার।

চন্দনা চলিয়া গেল। মলয়বাবু কি যেন একটা বলি বলি করিতেছেন দেখিয়া মানবেন্দ্র কহিল—কে কে নিমন্ত্রিত, কোন খোঁজ [illegible] জানেন কি ?

—কিছু কিছু জানি। বেশি লোক নয়, সম্ভবত সাত-আটজন। লাহিড়ী ও তাঁর এক বন্ধু আছেন, ঘোষমশায় ও ডাঃ বিশ্বাস আছেন, আর বোধ হয় ডাঃ হালদার আছেন।

—ডাঃ হালদার আবার কেন ?

মলয় হাসিয়া বলিল—না না, তাঁর মধ্যে উদারতার অভাব নেই। তিনি যা বলেন তা বিশ্বাস করেন। কাজেই তাঁর চোখে সমাজ-সংস্কার সব অত্যন্ত অসার। সাহিত্যিক যেন একটু অর্থব্যঞ্জক ভাবে হাসিতে চেষ্টা করিলেন।

মানবেন্দ্র কহিল—বেশ বেশ! ডাঃ হালদার যে খুন ক'রতে পারেন সেটা ত আগেই অনুমান ক'রেছি। পরকেও পারেন, নিজেকেও পারেন।

মলয়বাবু পরিহাস করিলেন—এখানে এসে সবাই প্রায় খুনে হ'য়ে ওঠে।

মানবেন্দ্র টিপ্পনী করিল—হ্যাঁ, খুন না চাপ্‌লে আপনি আসতে পারতেন না। সে ত বটেই—

মিঃ লাহিড়ী একটু ব্যস্ততার সঙ্গে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—যাক্, দেরি হয় নি তা হলে সকলে এখনও আসেন নি। ইনি আমার বন্ধু, শ্রীঅনাদিনাথ চক্রবর্তী। বাল্যবন্ধু, এখানে কোনও সদাগরী আফিসে কেরানীগিরি করেন।

মানবেন্দ্র মলয়কে প্রশ্ন করিল—মিঃ লাহিড়ী কি সত্যই ডিরেক্টর?

লাহিড়ী হাসিয়া বলিলেন—কেন? সন্দেহ হয়?

—হ্যাঁ, ডিরেক্টর হ'য়েও কেরানীবন্ধুকে মনে রেখেছেন—এটা যে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য।

লাহিড়ী বলিলেন—কেউ কেউ রাখে।

—হ্যাঁ, প্রয়োজন ত অনেক সময়ে হয়ই। কেঁচোরও প্রয়োজন হয় মাছ ধরার সময়।

মিঃ লাহিড়ী সগর্বে বলিলেন—বন্ধুটি কেঁচো নয়—সাপ। একটু পরেই ঠিক পাবেন।

মানবেন্দ্র একটু হাসিয়া চুপ করিল। চন্দনা পুনরায় প্রবেশ করিয়া বলিল—ও আপনারা এসেছেন বসুন, বসুন মিঃ লাহিড়ী—

—ইনি, আমার বন্ধু অনাদি। তা আজ আপনার নিমন্ত্রিত অতিথিগণকে আপ্যায়িত করতে কি আপনি দু'একটা গান ক'রবেন?

চন্দনা একটু উষ্মার সহিত কহিল—আমার অতিথিগণের অভ্যর্থনা আপ্যায়নের ভার আমার, সেটুকু বন্দোবস্ত না থাক্‌লে অবশ্যই নিমন্ত্রণ করতাম না।

অতিথিগণ একে একে সকলেই উপস্থিত হইলেন। ডাঃ হালদার মানবেন্দ্রকে দেখিয়া কহিলেন—আপনি? আপনি এসেছেন?

—হ্যাঁ, আপনার মতই সশরীরে এবং সজ্ঞানে। মনের মানসীকে পৃথিবীর মাটিতে খুঁজে পাওয়া যাবে না জেনেও এসেছি তার কারণ আপনিও জানেন, "আশা গেছে, যায় নাই খোঁজার অভ্যাস।"

ডাঃ হালদার হাসিয়া বলিলেন— আপনি মনে রেখেছেন তা হ'লে? আমি কিন্তু এটাকে সত্যই বিশ্বাস করি কাজেই যাকে আপনারা বলেন দুর্নীতি আমি তাকে বলি প্রকৃতি।

—যেমন লাহিড়ীমশায় বলেন স্বভাব; কিন্তু খুঁজে যখন পাওয়াই যায় না

তখন ছুটে ছুটে খাম্‌কা গলদঘর্ম হ'চ্ছেন কেন? মিস্‌ চন্দনা কি বলেন, মানসীকে কি পাওয়া যাবে?

মিস্‌ চন্দনা কি যেন একটা কথায় ব্যস্ত ছিল তাই অপ্রাসঙ্গিক জবাব দিল—সম্ভব।

—তা নয়, মিঃ হালদারের মানসী মিল্‌বে কিনা সেইটে বলুন?

চন্দনা হাসিয়া বলিল—তা মিল্‌বে বই কি।

—হ্যাঁ, তবে গলদঘর্ম হওয়ার একটা সার্থকতা আছে বৈ কি?

ডাঃ বিশ্বাস বলিলেন—কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে বলে ওই না-পাওয়া বাতিকেরও একটা মানসিক হেতু আছে। যাঁরা সাধারণত নিজের প্রতি যথেষ্ট আশা পোষণ করেন না, বা করতে পারেন না তাঁদের মাঝেই ওটা দেখা যায়।

ঘোষ তাঁহার ব্যাগটা টেবিলের উপর রাখিয়া বলিলেন—কিন্তু জীবনের স্থায়িত্বই অর্থ। অর্থ জীবনের নির্ভর—কাজেই সঞ্চয় থাকলে আত্মপ্রত্যয় জন্মায়। তখন পেলাম না খেলাম না বলে দুঃখ থাকে না—ইচ্ছে করলেই পেতে পারি এই ধারণায় ক্ষুধা কমে যায়।

ডাক্তার বিশ্বাস উন্মুক্ত দরজার দিকে চাহিয়া চেয়ার বদলাইয়া ঘোষমশায়ের নিকট হইতে যথা সম্ভব দূরে গিয়া বসিলেন। চন্দনা মানবেন্দ্রের নিকটে একখানা খালি চেয়ার টানিয়া আনিয়া বসিয়া পড়িল। একটু ইতস্তত করিয়া কহিল—আপনারা সকলে অনুগ্রহ ক'রে আজ এসেছেন আমার কুটীরে এ আমার পরম সৌভাগ্য। আমার মত ব্যক্তির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন সেটা আপনাদের মহত্ব। আশা করি আমার ত্রুটি মার্জনা করবেন।

মিঃ লাহিড়ী বলিলেন—এখন বিনয় থাক—একটা—

চন্দনার চোখের দিকে চাহিযা লাহিড়ী থামিয়া গেলেন। ডাঃ হালদার বলিলেন—আপনার নিমন্ত্রণ আমাদের পক্ষে পরম আনন্দের।

মানবেন্দ্র বলিল—ওটা, গৌরবে বহুবচন। আমাদের প্রতিনিধি উনি নন।

লাহিড়ী বলিলেন—কেন আপনি কি আনন্দিত হন নি?

—না, অন্য অনেক কিছু হ'তে পারি, আনন্দের উপরেও কিছু হ'তে পারি কিন্তু সেটা আমি ব'লবো। ডাঃ হালদার তা ব'লবেন কেন?

ডাঃ হালদার হাসিয়া বলিলেন—আচ্ছা থাক্—এখন মিস্ চন্দনা কি একটা সঙ্গীত দিয়ে আমাদের আড্ডার উদ্বোধন করবেন ?

মিস্ চন্দনা মানবেন্দ্রের দিকে চাহিয়া কহিল—অনুমতি হলে পারি।

মানবেন্দ্র কিছু বলিবার পূর্বেই সকলে সোৎসাহে ও সাগ্রহে অনুমতি দিলে। মানবেন্দ্র হাসিয়া উঠিয়া বলিল—সকলের অনুমতি আমি উপেক্ষা করি কি ক'রে, সমাজে যখন চল্তে হয়।

চন্দনা গান করিয়া থামিল।

সকলে একবাক্যে তাহার কণ্ঠ, গান ও মাধুর্যের তারিফ করিতে যখন একটা হৈ চৈ করিয়া চলিয়াছে তখন চন্দনা অতি মৃদুকণ্ঠে মানবেন্দ্রকে কহিল—মানবেন্দ্রবাবু, আপনি যাবেন না। আপনার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে। সকলের যাবার পর একটু দেরি ক'রবেন।

মানবেন্দ্র বলিল—সকলে যদি যানই তবে দেরি করবো বই কি ?

চা ও আহার্য আসিল। তাহার সদ্ব্যবহার করিতে করিতে নানারূপ আলোচনা করিতে করিতে ক্রমশ রাত্রি হইতে লাগিল; কিন্তু কেহই যাইবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। ডাঃ বিশ্বাস তাঁহার মন-বিজ্ঞান, হালদার তাঁহার দার্শনিক মতবাদ, ঘোষ তাঁহার ইনসিওরেন্স প্রভৃতি সকল কথাই বলিলেন।

এতক্ষণে মলয়বাবু বলিলেন—দেখুন, আজকাল বাংলা ছবিগুলো বড় একঘেয়ে হ'য়ে যাচ্ছে এর কোন কারণ অনুমান করতে পারেন মিঃ লাহিড়ী ?

লাহিড়ী বলিলেন—একঘেয়ে! বলেন কি, নূতন নূতন ছবি নূতন আইডিয়া ও টেকনিক নিয়ে বেরুচ্ছে। জানেন, এবার দেশের শিল্পবিস্তারের জন্যে একটা ছবি ক'রবো।

মলয়বাবু প্রতিবাদ করিলেন—যতই যা বলুন, একঘেয়ে সেই প্রেমের কাহিনী। দু'জনে ভালবাসলো তার পরে হয় মিলন নয় বিচ্ছেদ। একই গল্প বার বার কি পড়া যায় ?

লাহিড়ী বলিলেন—তা যদি বলেন তবে রামায়ণ থেকে আজ পর্যন্ত যত বই বেরিয়েছে সবই ওই এক কাহিনী। মানুষের হৃদয়ের কাহিনী বদলায় নি, তার বলবার ভঙ্গি বদলেছে।

—বরং হৃদয় বদলায় নি কিন্তু তার বক্তব্য ও অনুভূতি বদলেছে এটা বলা যায়।

বাংলা ছবি এই অনুভূতি তথা বক্তব্যের দিক দিয়ে নূতন কিছু দিতে পাচ্ছে না বলেই একঘেয়ে হ'য়ে উঠেছে। কি বলেন মিস্ চন্দনা ?

চন্দনা বলিল—কথাটা কতকটা সত্যি। তবে আরও ভালো করবার সুযোগ আছে তাও সত্যি।

মানবেন্দ্র কহিল—একঘেয়ে হবার কারণটা অনুমান করতে আমি বরং পারি। মলয়বাবুর ছবি-সমালোচনা আমি পড়েছি। নতুন সাহিত্যিকগণকে ছবির আসরে পাতা পাত্‌তে দেওয়া হ'চ্ছে না বলেই একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে।

মলয়বাবু বলিলেন—হ্যাঁ, ঠিক তাই। একই লেখক যদি গল্প লেখে, তবে তার টেকনিক এক না থাকলেও বক্তব্য প্রায়ই একই থেকে যায়।

—অতএব মিঃ লাহিড়ী, আপনি এবার মলয়বাবুর একখানা গল্প নিয়ে ছবি করুন দেখবেন তাতে নূতন আইডিয়া থাকবে। এ রকম না করলে ছবির উন্নতি হবে কেন? পরীক্ষা—অকৃতকার্যতা—তার পরের অবস্থাই হচ্ছে উন্নতি।

মলয়বাবু বলিলেন—হ্যাঁ, না হয় দু'একখানা ছবি মার খাবে, তবুও উন্নতি করা দরকার।

মিঃ ঘোষ বলিলেন—রাত্রি হ'ল যাবেন না ডাঃ বিশ্বাস? তিনি তাঁহার ব্যাগটিকে টেবিলের উপর রাখিয়া খুলিতে আরম্ভ করিলেন।

মিঃ বিশ্বাস উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—হ্যাঁ, রাত্রি হ'ল—আসি, নমস্কার মিস্ চন্দনা।

ডাঃ হালদার বলিলেন—হ্যাঁ, রাত্রি হ'ল বৈ কি? এর পরে ট্রাম পাওয়া যাবে না হয়ত, না মিঃ ঘোষ?

—হ্যাঁ তাইত, তা আপনি!

—আমার কি? এইত কাছেই, একটা রিক্‌শ নিয়ে চলে যাবো।

মলয়বাবু বলিলেন—রিক্‌শ আজকাল পাওয়া বড়ই দুর্ঘট ব্যাপার। দশটার পর মেলেই না।

মিঃ লাহিড়ী বলিলেন—আপনি কি ক'রে যাবেন মলয়বাবু?

—আমার কি? আমি হেঁটেই ত যাই; কিন্তু আপনি?

—আমি? আমার কি রাত বেরাত আছে! স্টুডিও থেকে ফিরতে কত-দিন দু'টো তিনটে হয়।

অনাদিবাবু এতক্ষণ কথা বলেন নাই, তিনি বলিলেন—মানবেন্দ্রবাবু কিসে যাবেন ?

—গাড়িতে।

—ওঃ নিজের গাড়িতেই এসেছেন বুঝি ?

—না, মিস্ চন্দনার গাড়িতে যাবো। আপনারা সব গেলে তারও খানিক পরে যাবো—

মিঃ লাহিড়ী বলিলেন—তার মানে ? আপনি—

মিস্ চন্দনা জবাব দিল—ওঁর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

ডাঃ হালদার বলিলেন—আচ্ছা তবে উঠি। আমার একটা কথা ছিল আর একদিন বল্‌বো মিস্ চন্দনা।

ঘোষ বলিলেন—আচ্ছা নমস্কার, আর একদিন আস্‌বো।

একে একে সকলেই বিদায় লইলেন। মিঃ লাহিড়ী একটু উত্তেজিত ভাবে বলিলেন—আমি চললুম চন্দনা। এসো অনাদি—প্রয়োজন হ'লে খবর দিও আসবো।

লাহিড়ী চলিয়া গেলেন। চন্দনা হাসিয়া উঠিয়া বলিল—উনি যেন আমার প্রয়োজনেই আসেন। তাহার পরে মানবেন্দ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল—আপনি এসেছেন বলে তবু আজ দিনটা সার্থক হ'ল। সত্যিই খুব জরুরী কথা আছে।

মানবেন্দ্র বলিল—তার পূর্বে আমার কিছু কথা আছে। সত্যি উত্তর না দিলে চলে যাবো।

—বলুন। সকলের কাছেই কি মিথ্যে বলি আমরা ?

—আজকার এ পার্টি কেন দিলেন ?

চন্দনা স্মিতহাস্যে কহিল—আপনাকে ফাঁকি দিয়ে ডেকে আনবার জন্যে। এমনি বললে কি আর আসতেন ?

—মলয়বাবু কি প্রায়ই আসেন ? তাঁকেই বা নিমন্ত্রণ করলেন কেন ?

—ও, ওঁর সব বই বেরুলেই আমাকে দেন ; কিন্তু একখানাও ফিল্ম হয় নি তাই নিমন্ত্রণ করলুম—বেচারা সত্যিই বড় ভাল মানুষ—মুখচোরা।

—ডাঃ হালদার ?

—উনি ত প্রায়ই এসে নানারূপ দার্শনিক তত্ত্ব শোনান। ওঁকে না বল্‌লে ত অন্যায় হবে।

মানবেন্দ্র হাসিয়া ফেলিল। কহিল—মানসী কি খুঁজে পেলেন?

—না। সে পাওয়া যায় না। কি সব বলেন বুঝতেই পারি না।

মানবেন্দ্র ব্যঙ্গ করিল—বুঝতে পারেন, তবে না বোঝাটাই ভদ্রতা। যাক্, আমাকে ডেকে এনে আপনার লাভ? আর প্রয়োজনই বা কি?

—লাভ ক্ষতি জানি না। আপনি এসেছেন এই লাভ।

—ওঃ, শেষে কি একটা ভালবাসা-টাসা প্রকাশ করবেন নাকি?

চন্দনা কোন জবাব দিল না। সহসা এক ঝলক রক্ত সমগ্র মুখখানাকে রক্তাভ করিয়া দিল। সে ধীরে ধীরে কহিল—প্রকাশ করলেই বা বিশ্বাস করবেন কেন?

—কোন সঙ্গত কারণ নেই। তারপর কথা কি?

চন্দনা হৃষ্টভাবে বলিল—আমার বিশ্বাস আপনি খুব ভাল অভিনয় করতে পারেন। সামনের ছবিখানায় আপনি অভিনয় করুন না!

—আমি? অভিনয় ক'রতে পারি! এমন অপবাদ শত্রুতেও আজ পর্যন্ত দেয় নি।

—বলেন কি, আপনার কথা বলার ভঙ্গিই এমন চমৎকার। আপনি অভি-নয় ক'রলে চমৎকার অভিনয় হবে। দেখবেন কত নাম হবে।

মানবেন্দ্র বলিল—আমি যা বুঝি তাই বলি, তার মধ্যে অভিনয় নেই, যা বুঝি না তা ব'লবার ক্ষমতাই আমার নেই। আর আমি নাম ক'রতে চাইলেই বা লোকে ক'রবে কেন? হ্যাঃ মিঃ ঘোষ কি মাঝে মাঝেই আসেন

—সম্প্রতি আসছেন। দু'হাজার ইনসিওর করেছি আবার দু'হাজার করতে বলেন। ইনসিওর ক'রবো কার জন্যে বলুন ত?

—কেন? মিঃ ঘোষের জন্যে।

—যাক্‌গে, আপনি রাজি কি না বলুন।

—আমাকে নেবে কেন? কত লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা একটা মৃত সৈনিকের পার্ট পায় না।

—সে ভার আমার। আমি বললে নিতে বাধ্য।

—কেন? আপনি ত আর ডিরেক্টর নন্।

—তবে, আমরা ডিরেক্টর তৈরি করি। আমি আপনার opposite-এ অভিনয় ক'রবো, দেখবেন ফিল্ম চলে কিনা!

—আপনি থাকলেই চলবে। লোকে দেখবে? এটা কি বেশি বলা হ'চ্ছে না—

—মোটেই না। আচ্ছা আপনি কত লোক একসঙ্গে দেখেছেন?

—বিশ-ত্রিশ হাজার। সেবার মহাত্মা গান্ধী এবং জহরলাল এসেছিলেন—হাওড়া স্টেশনে অমনি একটা ভিড় দেখেছিলাম।

—আচ্ছা একটা ট্রেডশো'র দিনে চলুন, দেখবেন তার দ্বিগুণ ভিড়। যদি এত লোক আমাদের দেখতে আসে তবে ছবি দেখতে কেউ আস্‌বে না?

মানবেন্দ্র একটু গম্ভীর হইয়া বলিল—ওঁরা যে কেন কৃতকার্য হচ্ছেন না, এতদিনে বুঝলাম। তাঁদের কর্মপদ্ধতিতে ভুল রয়েছে—

চন্দনা কথাটার সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য না করিয়াই প্রশ্ন করিল—কি?

—তাঁরা ফিল্মে অভিনয় করলে নিশ্চয়ই আরও কাজ করতে পারতেন। হ্যাঁ মনে পড়েছে, আপনার ছবি যতবার খবরের কাগজে দেখেছি ওঁদের ছবি ত ততবার দেখি নি।

চন্দনা একটু অভিমানের স্বরে বলিল—কেন? আমরা কি ছবির মারফতে কোনরূপ সামাজিক শিক্ষা দি না?

—দেন ব'লেই ত ট্রেডশো'তে অত ভিড় হয়। আপনাদের শিক্ষাকে কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না এবং গান্ধীর শিক্ষা নিষ্ফল হয়েছে বলা যায়।

চন্দনা ব্যস্ততার সহিত বলিল—যাক্ গে—আপনি রাজি কিনা বলুন সত্যি?

—না।

একটু ভেবে ব'ল্‌বেন।

—ও সম্বন্ধে আমার চিন্তা করা আছে। আচ্ছা তা হ'লে, রাত্রি হ'ল উঠি।

—বসুন আর একটা কথা আছে। কথাটা বলা ঠিক হবে কিনা, অন্যায় হ'লে মার্জনা ক'রবেন।

—অবশ্যই ক'রতে বাধ্য।

—আপনার শক্তি আছে, বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, যেদিকে যাবেন সেই দিকেই উন্নতি ক'রতে পারেন, তা সত্ত্বেও আপনি কেন আদিত্যবাবুর অতিথি হয়ে আছেন? তার বদলে যদি স্বাধীন কোনো চাকুরি বা ব্যবসা করেন—

মানবেন্দ্র হাসিয়া বলিল—যাদের সত্যিকার বিদ্যাবুদ্ধি শক্তি থাকে তাদের পক্ষে উন্নতি করা অসম্ভব, চাকুরি তাদের থাকে না, ব্যবসায় তারা ফেল হয়।

তবে আমার বুদ্ধি কম বলেই পরের আশ্রিত, বুদ্ধি থাকলে ভাল একটা চাকুরি পেতামই। নমস্কার—উঠি—

হ্যাঁ, আর একটা কথা। আপনি যদি মাঝে মাঝে এখানে বেড়াতে আসেন তবে সুখী হব। সকালের দিকে বারটা পর্যন্ত কোথায়ও বেরুই না।

মানবেন্দ্র বলিল—জগতে কোন রকম পরোপকার আমি ক'রতে পারি নি, আপনার এখানে এসে যদি আপনাকে সুখী করতে পারি তবে মন্দ কি? পর-হিতে এটুকু করা আমার অবশ্যই উচিত। তবে আপনি খুশি হবেন না সে কথাও সত্যি।

চন্দনা ভ্রূভঙ্গি করিয়া কহিল—সত্যিই বলছি, খুব খুশি হব। জানেন আমি বড্ড একলা?

—কতকগুলো মানুষই আছে যারা হাটের মাঝেও একলা বোধ করে, আবার এমন লোক আছে আর একটি লোক থাকলেই হাট মনে ক'র।

—দাঁড়ান। আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে—গাড়ি বের ক'রতে বলি।

—না, আমি হেঁটেই যাবো। মানবেন্দ্র চন্দনাকে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করিবার সুযোগ না দিয়াই চলিয়া আসিল।

*

ডাঃ বিশ্বাস যখন বাসায় ফিরিলেন তখন রাত্রি দশটা হইয়া গিয়াছে। আহারাদি সম্পন্ন করিয়া তাঁহার স্ত্রী ঝি ও চাকর দ্বারা সমস্ত থালা ধোয়াইতে-ছিলেন। শয়নকক্ষ বাদে আর প্রায় সবই ধোয়া শেষ হইয়াছিল—বিশ্বাস ঘরে ঢাকা কয়েকখানা লুচি খাইয়া আরাম কেদারায় বসিয়া নানা কথা ভাবিতে-ছিলেন—তাঁহার মধ্যে একটা উষ্মা বিশেষত চন্দনাকে ঘিরিয়া ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। সে মানবেন্দ্রের নিকটে বসিয়া কি বলিল এবং এক রকম নির্লজ্জের সঙ্গেই সকলের প্রস্থানকে সমর্থন করিল। যদি তাহাই হয় তবে নিমন্ত্রণ করিবার কি প্রয়োজন ছিল?

বিশ্বাস-পত্নী আসিয়া বলিলেন—কই—খেলে না?

—খেয়েছি।

—বেশ, সবই ত পড়ে রয়েছে। তোমার হ'ল কি? রাত্রে খাওয়া যে ছেড়েই দিলে?

বিশ্বাস বলিলেন—তা হ'লে তুমি ত বাঁচো। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধোয়ানোর কি দরকার। জানো ওটা তোমার একটা ব্যাধি—ওকে বলে ক্যাপাফেলিয়া।

—হ্যাঁ রোগ বই কি? তা হ'লে রান্নাকরা চুলবাঁধা সবই রোগ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না করে কি নরকে বাস ক'রতে বলো?

—মনের রোগ ওই শুচিবায়ুটা। জানো—

স্ত্রী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—থাক্ আর দরকার নেই। বাবা পয়সা খরচ ক'রে কি বিদ্যেই তোমায় শিখিয়েছেন—এর চেয়ে মুখ্খু থাক্‌লেও ত ছিল ভালো।

ডাঃ বিশ্বাস হাসিলেন। বলিলেন, হ্যাঁ, সে ত ভালোই হ'ত।

—ব্যাগ দেখলে তুমি যে ভয় পাও—সেটা বুঝি রোগ হ'ল না?

—ভয় পাই? হাসালে, তবে ওটা পছন্দ করি না, দেখ্‌লে কেমন যেন বিরক্ত হই।

—আমিও আবর্জনা দেখ্‌তে পারি নে বিরক্ত হই।

বিশ্বাস গম্ভীরভাবে বলিলেন—ওটা ত তর্কের কথা নয়। যা রোগ তাকে অস্বীকার করা যায় না।

—না হয় নাই ক'রলুম। এত রাত কোথায় ছিলে?

বিশ্বাস বলিলেন—রাত কোথায়? ওই সিনেমা অভিনেত্রী চন্দনার বাড়িতে পার্টি ছিল, তাই একটু রাত হ'য়েছে।

স্ত্রী বিস্মিত হইয়া বলিলেন—ও তুমি সেখানেও যেতে আরম্ভ ক'রেছ? কেন? চন্দনার রূপ দেখে বুঝি মাথা ঠিক থাকে না? তোমার আক্কেল কাণ্ড হ'ল না—

—এতে দোষটা কি?

—তার মানে? তুমি অন্য মেয়ের পিছু পিছু হ্যাংলামী ক'রে ফিরবে এতে দোষের কি? তোমার লজ্জা ক'রলো না? আবার মন-বিজ্ঞানের দোহাই দাও—ভেবে ছাখো না, চন্দনার ওখানে কি ভাগবত পাঠ ক'রতে যাও?

বিশ্বাস শ্বশুর প্রদত্ত টাকায় লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন সে কথাটার পুনরুল্লেখ না হয় এই জন্য তাড়াতাড়ি বলিলেন—মানুষ স্টাডি করাই আমাদের ব্যবসা, সেই জন্যই যাই—কত লোক, কত রুচি, কত রকমের মতবাদ—

—কেন? হেদোয় কি গড়ের মাঠে গিয়ে স্টাডি করতে পারো না? ও সব বুঝি, তোমাকে আর বেরুতেই দেখো না। আর যদি যাও তবে বাবাকে পত্র দিয়ে আমি সেখানে থাকবো। তুমি চন্দনা বন্দনা নিয়ে থেকো—ছিঃ ছিঃ বুড়ো হলে একটা চক্ষুলজ্জা হ'ল না?

—আহা, তুমি কথাটাই বুঝলে না। তার ওখানে গেছি বলেই কি প্রেমে পড়ে গেছি নাকি?

—প্রেমে পড়েছ বলেই গেছ, নইলে সকলে ত যায় না। ও সব আর যেতে হবে না তোমাকে। আদিত্যবাবুর বাড়ি যাবে যাও—জমিদার লোক, আর সেটা বাড়ি—কিন্তু আর কোথাও না।

—কলেজেও ত অনেক মেয়ে আসে। তবে কি হবে?

—কি আবার হবে? তারা তোমাকে গিলবে নাকি? যেখানেই যাও চন্দনার ওখানে যেতে পারবে না। কেন? আমার একটা মান-অপমান নেই?

ডাঃ বিশ্বাস চুপ করিলেন। তিনি জানিতেন ইহার পর একটা দুর্দৈব অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে। মনে মনে তাই শঙ্কিত হইয়া বলিলেন—বেশ যাবো না।

তাঁহারা শয্যাগ্রহণ করিলেন কিন্তু বিশ্বাসের ঘুম হইল না। তাঁহার মনে হইল—সত্যই চন্দনার দেহ-কান্তি ও কণ্ঠস্বর কি মধুর; কিন্তু সে মানবেন্দ্রের অতি সন্নিকটে বসিয়া নিম্ন কণ্ঠে কি বলিল? তাহার স্ত্রী যেন সমস্ত কোমলতা বর্জিত—স্নেহ দিয়া আপনার করিতে জানে না, কাঁদিয়া ঝগড়া করিয়াই জিতিতে চায়—সান্নিধ্য ভীতিপ্রদ। অথচ এই দুর্ভাগ্য চন্দনা কাহারও গৃহকে সুন্দর করিয়া তুলিল না। তাহার বধূবেশে কোনও রাজপ্রাসাদ ধন্য হইল না—সে সকলের হইয়াই রহিল। ডাঃ বিশ্বাসের জানিতে ইচ্ছা হয়, ও কেন বিবাহ করিল না? একদিন নিভৃতে পাইলে এ প্রশ্ন করা যাইবে। পর্যায় নিজের দেহকে দান করিয়া ও অমনি সহজলভ্য হইল কেন?...

মানবেন্দ্র ধূমকেতুর মত উদিত হইয়া সমস্ত আকাশকে যেন প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে এবং যত কিছু তারকা গ্রহ যেন তাহার আকর্ষণে কক্ষচ্যুত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। যেমন অকস্মাৎ আসিয়াছিল তেমনি অকস্মাৎ চলিয়া যায় না কেন? চন্দনার পার্টিতে সে একা যেন সকলের কণ্ঠ চাপিয়া নির্বাক করিয়া দিয়াছে—কাহারও কিছুই বলা হয় নাই, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সকলেই বাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছে।

ডাঃ হালদার বাড়ি ফিরিবার পথে ভাবিতেছিলেন—চন্দনা সকলকে বিদায় দিয়া মানবেন্দ্রকে কি বলিবার জন্য রাখিয়াছিল; ইহাতে দুঃখিত হইলেও অভিযোগ করিবার কিছু নাই। তাহাকে যদি ভাল লাগিয়া থাকে তবে তাহা একান্তই স্বাভাবিক—তাহার শক্তি ও সাহসের মাঝে হয়ত ও ঈপ্সিত ব্যক্তিকে খুঁজিয়া পাইয়াছে! তথাপি চন্দনাকেই যেন একমাত্র ভালবাসা চলে—গৃহের নিরবচ্ছিন্ন অবরুদ্ধতা যেন ওর মনকে পঙ্গু করিয়া ফেলে নাই। তাঁহার জীবনে সে যদি আসিত তবে হয়ত তাঁহার কল্পনার মানসীকে একবার প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন···চন্দনা ত বহুদিন সশ্রদ্ধ আন্তরিকতার সহিত তাঁহার কথা শুনিয়াছে।

চন্দনার প্রতি অভিযোগ না করিলেও হালদার মনে মনে ব্যথিত হইয়াছিলেন—এবং নিরুপায় বেদনা মনটাকে ধীরে ধীরে উত্যক্ত করিয়া তুলিতেছিল—নিজের অক্ষমতা যেন তাঁহাকে আরও বেদনা দিয়াছে।

বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া দেখিলেন দ্বিতলে তাঁহাদের শয়নকক্ষে তখনও আলো জ্বলিতেছে। সম্ভবত তাঁহার স্ত্রী কোনো কিছু পড়িতেছেন। হালদার দরজায় কড়া নাড়িলেন—চাকর দরজা খুলিয়া দিল।

হালদার অত্যন্ত বিমনাভাবে নিজের গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—পত্নী একখানা উপন্যাস পাঠ করিতেছেন।

গৃহিণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন—এত রাত্রি হ'ল, কোথায় ছিলে?

—একটা পার্টি ছিল।

—চন্দনার বাড়িতে?

—হ্যাঁ।

গৃহিণী একটু ব্যথিত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—খাবার উপরেই এনে রেখেছি। হাতমুখ ধুয়ে এসো।

ডাঃ হালদার অন্যমনস্কভাবেই খাইতে লাগিলেন—মনে মনে ভাবিতেছিলেন—আমি যেমন করিয়া চন্দনার স্বপ্ন দেখি এমন করিয়াই চন্দনা হয়ত মানবেন্দ্রর স্বপ্ন দেখে, মানবেন্দ্র হয়ত আর কারও স্বপ্ন দেখে। স্ত্রীপুত্র আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত পৃথিবীতে মানুষ তবুও একা—একাকীত্ব তার জীবনের সাথী।

স্ত্রী বলিলেন—একটা কথা বলবো ?

—বলো।

—ছাখো তোমার এত বিদ্যা, এত বুদ্ধি, এত খ্যাতি, তুমি আর ওখানে যেও না। লোকে কি বলবে শেষে। সমাজকে ত না মেনে চলে না।

—আচ্ছা একটা কথার জবাব দাও। বিয়ের আগে তুমি তোমার ভবিষ্যৎ স্বামী সম্বন্ধে কোনরূপ স্বপ্ন পোষণ ক'রতে না—সে এমনি হবে অমনি হবে—

—না না, আমরা হিন্দুর মেয়ে, যে হবে তাকেই আমাদের ভালবাস্‌তে হবে—এই ত তারা শিক্ষা করে। মনে মনে বাছাবাছি তারা করে না।

—মিথ্যা কথা বল্‌লে। এটা সম্ভব নয়—যাক্‌ বিয়ের পর সেই মনের লোকটির সঙ্গে তোমার স্বামীটির নিশ্চয়ই মিল হয় নি। এখন তুমি যদি তেমনি কোন লোককে ভালবাস বা মনে মনে ভালবাস্‌তে ইচ্ছে করো তবে সেটা কি তোমার অন্যায় হবে ?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হবে। ও কথা ব'লো না, ওতে পাপ হয়।

—কোনো অন্যায় হয় না। ওটা মনের ধর্ম, মনের চলবার জন্যে কোন নীতির ব্যাকরণ নেই। আর আমিই যদি তেমনি ভালবাসি তবে তাতে দোষ দেওয়া যায় না। সামাজিকভাবে সেটা দোষের নয়—মনের এ কাহিনী সমাজ জানে না—ধর যদি তোমার কোন বাল্যবন্ধু প্রণয়ী থাকে তাতে কি দোষ দেওয়া যায় ?

—ছিঃ ছিঃ, তুমি ওসব ব'লো না। তোমার পায়ে পড়ি—ছাখো আজ ছেলেপুলের মা আমি, তার জন্যেও ত একটু রেখে বলা উচিত।

ডাঃ হালদার পত্নীর এই মূর্খতা ও বুদ্ধিহীনতা দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—অপ্রিয় সত্যকে গোপন করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বটে কিন্তু সেটা বুদ্ধিহীনতারও লক্ষণ।

আহারান্তে ডাঃ হালদার কি যেন একখানা বই খুলিয়া বসিয়া মনের মাঝে নানা হিজিবিজি লিখিতেছিলেন। পত্নী খাইয়া আসিয়া একটু উত্তেজিতভাবেই বলিলেন—আজ আট বৎসর তুমি অমনি করে আমায় গঞ্জনা দিচ্ছ—চাকর-বাকর দিয়েও কত কটু বলেছ—তোমার পায়ে ধরি, ওরকম আমি আর ত সহ্য ক'রতে পারি নে।

ডাঃ হালদার হাসিলেন—এ অভিনয় যেন তিনি বেশ উপভোগ করিয়াছেন এমনিভাবেই স্মিত মুখে বসিয়া রহিলেন।

গৃহিণী বলিলেন—আমাকে বিয়ে ক'রে যদি খুশি না হ'য়ে থাকো, তবে আর একবার যাকে ইচ্ছা বিয়ে কর, আমাকে দূর ক'রে দিও, চলে যাবো, কিন্তু ওখানে আর যেও না। লোকে কথা ব'লবে আমি সইতে পারি না।

—যা স্বাভাবিক তাকে গোপন করা চলে না। তোমার চলে যাওয়ার ইচ্ছাকে আমি বাধা দিতে পারি না। তবে একবার বিয়ে ক'রে তোমার মাঝে যা পেয়েছি পুনরায় বিয়ে ক'রলে তার চেয়ে বেশি কিছু পাবো না তাও জানি। সেই জন্যেই ত বলি তোমার স্বাধীন ইচ্ছাকে আমি বাধা দিতে চাই নি।

পত্নী অকস্মাৎ হালদারের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—তোমার ইচ্ছে হয়ত তাড়িয়ে দাও, ছেলেপুলের দিকে তাকিয়ে আমাকে আর অমনি কথা ব'লো না—আমি যে আর সহ্য ক'রতে পা'র নে। তিনি ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। এক ফোঁটা অশ্রু হালদারের পায়ের উপর আসিয়া পড়িল। তিনি হাসিয়া সান্ত্বনা দিবার সুরে বলিলেন—যাও শোও গিয়ে। মানুষে আগে কিছু বলুকই তারপর ব্যস্ত হয়ো—আর আমি যা বলি তা যখন বোঝো না তখন কাঁদলে আর আমি কি ক'রবো।

পত্নী চোখে আঁচল চাপিয়া ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং একটা অব্যক্ত যাতনায় যেন কাঁপিতেছেন বলিয়া মনে হইল। শয্যাপার্শ্বে কোলের ছেলেটিকে বুকের মাঝে জড়াইয়া ধরিয়া উৎসারিত অশ্রু ছাড়িয়া দিলেন—ভগবান তাঁহাকে এমনি করিয়া রিক্ত করিলেন কেন?

হালদার আরাম কেদারায় বসিয়া, বইখানা খুলিয়া ধরিয়া ভাবিতেছিলেন—মিস্ বসু শিক্ষিতা হইলেও যেন কেমন একটা আভিজাত্যবঞ্চিত। চন্দনার কণ্ঠ, সৌন্দর্য সব কিছুর মাঝেই একটা বেশ আভিজাত্য আছে—যত অনিচ্ছাকৃতই হউক কথায় একটা দরদ আছে—যা মানুষকে আকর্ষণ করেই—চন্দনা যদি ওই পত্নীর স্থানে শুইয়া তাহার পুত্রকে স্তন দিত তবে কি তাহার মাঝেও তাঁহার বাঞ্ছিতা অপ্রাপ্ত রহিয়া যাইত?...মানবেন্দ্র কেন এমন করিয়া বালল—সকলে চলিয়া গেলে তবে সে যাইবে। চন্দনা কি সে কথাটা মনে মনে অনুমোদন করিয়াছে? ডাঃ হালদার বই খুলিয়া বসিয়া চন্দনাকে ঘিরিয়া নানা অসম্ভব কথা ভাবিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিলেন।

*

ডাঃ দত্ত সেদিন একটু সকালেই আড্ডায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মানবেন্দ্র বসিয়া কাগজ পড়িতেছিল, অভ্যর্থনা করিল—আসুন আসুন ডাঃ দত্ত। কয়েকদিন আসেন নি। বাসায় অসুখ-বিসুখ কিছু হয় নি ত?

—হ্যাঁ, একটু অসুখই আছে, তাই বাসায় থাকতে হয়, অন্য কেউ ত নেই।

মানবেন্দ্র হাসিয়া টিপ্পনী করিল—আপনারা অর্থাৎ ডাক্তাররা তা হ'লে রোগ নিবারণ ক'রতে পারেন না—আরোগ্য করতে পারেন কি?

—এখন সেটা ঠিক পাবেন না, নিজের রোগ হ'লে তখন বুঝতে পারবেন।

—আহা চটেন কেন? যদি তাই সম্ভব হয় আপনাদের পক্ষে তবে এই জ্বালা ভোগ করেন কেন? নিবারণ ক'রলেই ত হয়।

—সব রোগ ত নিবারণ করা যায় না।

—তা ত আছেই, যেমন মনের রোগ তা আর মৃত্যু না হ'লে যায় না; কিন্তু ডাঃ বিশ্বাস বলেন, শতকরা নব্বইটা দেহের রোগ মনের রোগপ্রসূত।

ডাঃ দত্ত হাসিয়া বলিলেন—দিনে দিনে আরও কত শুনতে হবে, কিন্তু অসুখ ক'রলে তখন আমাদের মিক্শ্চার না খেলে আর ত চলে না—আবার কলেজেও যেতে হয়।

মানবেন্দ্র কাগজ উল্টাইতে উল্টাইতে অমনোযোগের সহিত বলিল—কিন্তু দু'চারটে না আছে এমন ত নয়, ধরুন ম্যানিয়া, হিস্টিরিয়া কি অবসেশন।

ডাঃ দত্ত বলিলেন—কেবল ডাঃ বিশ্বাসই সাইকলজি পড়ে মাথা খারাপ ক'রেছেন জানতুম, আপনিও তাই নাকি? ওসব রোগ মোটেই তা নয়, আমাদের অধীনে যথেষ্ট আরোগ্য লাভ করে।

মানবেন্দ্র কাগজটা নামাইয়া রাখিয়া বলিল—ও, ওগুলো তবে আরোগ্য ক'রতে পারেন··যা হোক্—বাড়িতে কি অসুখ?

—অন্তত হিস্টিরিয়া নয়, এটা জানবেন।

—স্ত্রীর রোগের জন্যে আপনি তা হ'লে একটু ব্যস্তই আছেন। আপনারও একটু অক্ষমতা কিন্তু এতে প্রকাশ পায়, নইলে রোগ এতদিনে অবশ্যই সারতো।

ডাঃ দত্ত যেন একটু বিরক্তির সঙ্গে বলিলেন—তার মানে? ডাক্তারের বাড়িতে রোগ হবে না? অন্যকে একটু ব্যঙ্গ করাটা যেন আপনার অভ্যাস।

মানবেন্দ্র ডাঃ দত্তের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল—ও আপনার স্ত্রী তা হলে হিস্টিরিয়ায় ভুগছেন? তা ত বলেন নি এতদিন—

—তার মানে? তার হিস্টিরিয়া হ'য়েছে বল্লুম নাকি? আপনার ত মাথা খারাপ হয় নি—জ্যোতিষশাস্ত্রও জানেন দেখ্ছি।

মানবেন্দ্র দরজার দিকে চাহিয়া বলিল—আসুন, আসুন ডাঃ বিশ্বাস, ডাঃ দত্ত ত আমার উপর চটে গেছেন—মানুষ ভুল করে এটা যেন উনি জানেন না। যাক্ ভুল ক'রবার কোন কারণ নেই কি?

ডাঃ বিশ্বাস দরজাটা বন্ধ করিতে গেলেন, ডাঃ দত্ত বলিলেন—আপনার কি বদ্অভ্যাস দরজা দেওয়া! খুলে রাখুন।

বিশ্বাস বলিলেন—বড্ড হাওয়া, অর্ধেকটা খোলা থাক্। হ্যাঁ মানবেন্দ্রবাবু, ভুল ক'রবার একটা কারণ আছে বই কি? অপ্রিয় একটা কিছু পিছনে না থাক্লে মানুষ ভুল করে না—মানুষের প্রতিটি ভুলেরই অর্থ আছে জানবেন।

—হ্যাঁ, আছে বই কি? রোগ ঠিক ধ'রতে না পারাও একটা অপ্রিয় ব্যাপার-প্রসূত না?

—হ্যাঁ, যেমন হিস্টিরিয়া ম্যানিয়া রোগে—

ডাঃ দত্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—আচ্ছা আসি আজকার মত— বাসায় অসুখ—আর ডাঃ বিশ্বাসের ঐ অপরূপ মনস্তত্ত্ব আমার হজম হবে না।

ডাঃ দত্ত অত্যন্ত দ্রুতপায়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন—যেন একটা কি অশরীরী ভীতিপ্রদ ভাবনা তাঁহার পিছনে তাড়াইয়া আসিতেছে। বিনা টিকিটে গাড়ি চড়িবার মত একটা অত্যন্ত বিশ্রী শঙ্কা তাঁহার মনকে যেন উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে।

দ্রুতপদে বাড়ি চলিবার পথে, সমস্ত অপমান, বেদনা ও শঙ্কা পুঞ্জীভূত হইয়া নলিনার উপরে গিয়া পড়িল। তাহার এই অযৌক্তিক অস্বাভাবিক প্রকৃতি যেন জগতের মাঝে তাহাকে ক্ষুদ্র করিয়া দিয়া উপহাস করিতেছে। তাহার জিদ ও তাহার অবাধ্যতা যেন তাহাকে আজ মরিয়া করিয়া তুলিল—ডাঃ বিশ্বাস ও মানবেন্দ্র যেন আজ তাহাকে উপহাস করে—তাহার অপদার্থতা লইয়া।' নারীর কাছে যে নর পরাজিত হইয়াছে তাহার আবার এতটা স্পর্ধা কিসের—দ্রুত পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মন একেবারে রাগে ক্ষোভে বেপরোয়া হইয়া

উঠিল—যেমন করিয়াই হোক্ মলিনার এই স্পর্ধা ও অবাধ্যতাকে জয় করিতেই হইবে।

ডাঃ দত্ত বাড়ি ফিরিয়া দেখিলেন মলিনা নিজের ঘরে বিছানায় বসিয়া বাহিরের জানালা দিয়া কি যেন দেখিতেছে—উর্ধ্বে দূরে তারায় ভরা আকাশের মাঝে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সে যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে।

ডাঃ দত্ত বলিলেন—মলিনা!

মলিনা চমকাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। কহিল—এত দেরি হ'ল যে! একা একা যে আমি থাক্‌তে পারি না। কোথায় যাও তুমি?

মলিনার বিশুষ্ক মুখের রক্ত যেন নিমেষে শুকাইয়া গেল—ডাঃ দত্তকে দেখিয়া সে যেন ভীত হইয়াছে, নীরব উৎকণ্ঠায় তাহার গলা যেন শুকাইয়া উঠিয়াছে এমনি দরদহীন কণ্ঠে সে কথা কয়টি বলিয়া ফেলিল।

ডাঃ দত্ত জামা কাপড় ছাড়িয়া মলিনার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বলিলেন—চিরদিন কি তুমি এমনি করবে? এমনি ক'রে আমার অবাধ্য হ'য়ে, আমাকে জব্দ করে তুমি সুখী হবে মনে ক'রেছ?

মলিনা কহিল—দাঁড়াও দরজা দিয়ে আসি।

ডাঃ দত্ত তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন—না, দরজা দিতে হবে না। আমার কথার জবাব দাও।

—আমি ত অবাধ্য হই নি?

—তবে দরজা দেবে কেন?

—আমার বড্ড ভয় করে।

—আমি রয়েছি ভয় কি? আমি থাক্‌তেও ভয়? ওটা তোমার একটা মিথ্যা অজুহাত। আমাকে যদি ভালবাস্‌তে তবে এম্‌নি ক'রে আমার জীবনটাকে ধ্বংস ক'রে দিতে পারতে না।

মলিনা অশ্রুপূত চোখ দুইটি মেলিয়া ধরিয়া কহিল—আমি ভালবাসি না?

—তাই যদি হ'ত, তবে কি আমি থাকতে এমনি ভয় করে বলে পালিয়ে যেতে?

মলিনা কম্পিত ওষ্ঠে কহিল—ভগবান জানেন, তোমায় ভালবাসি কিনা; কিন্তু তুমি কেন এমনি করে আমাকে বল—মলিনা আর বলিতে পারিল না। তীব্র একটা অভিমানে ও বেদনায় সে কাঁদিয়া ফেলিল।

মলিনার নিরুপায় চোখের জলকে একটা ছলনামাত্র মনে করিয়া ডাঃ দত্ত

ক্রমশ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তিক্ত কণ্ঠে কহিলেন—তোমার ও ছিচ্‌কান্না রাখো, তোমার ব্যবহারটা একবার দেখ্‌তে পাও না—ডাঃ তাহাকে জোর করিয়া খাটের প্রান্তে বসাইয়া দিলেন। মলিনা চীৎকার করিয়া উঠিল—না—না, ছাড়ো ছাড়ো—

মলিনা হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিল কিন্তু ডাঃ দত্ত জোর করিয়া তাহাকে বসাইয়া দিয়া বলিলেন—আজ তোমারই একদিন কি আমারই একদিন, তোমার রোগ আমি সারিয়ে দিচ্ছি। ডাঃ দত্ত হাতখানি মোচড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিলেন—মলিনা বিছানার উপর উঃ করিয়া পড়িয়া গেল। ডাঃ দত্ত দাঁতে দাঁত চাপিয়া ধরিয়া মলিনাকে নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিলেন কিন্তু তাহার দেহ কোন প্রতিবাদ করিল না—তা'হা সংজ্ঞা হারাইয়াছিল।

ডাঃ দত্ত মনে মনে বলিলেন—তোমার এ বজ্জাতি আমি ভাঙ্‌ছি। ঝি'র উদ্দেশ্যে বলিলেন—দু'টো মরিচ নিয়ে আয় ত।

ঝি মরিচ দিয়া গেল। দত্ত তাহা পোড়াইয়া মলিনার নাকের কাছে ধরিতেই সে চোখ মেলিয়া চাহিয়া কাতরোক্তি করিল—আমায় মেরো না, লক্ষীটি আমি কোন অপরাধ করি নি।

—না, তোমায় সোহাগ ক'রবে? তোমার ভূত আমি এবার ছাড়িয়ে তবে ছাড়বো। দাঁড়াও। তোমার এত বড় জিদ—

মলিনা কাতরতার সহিত কহিল—তোমার পায়ে ধরি, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—পায়ে ধরি।

—হ্যাঁ, দিচ্ছি।

দরজাটা উন্মুক্ত ছিল, দত্ত আলোটাকে নিভাইয়া দিয়া কহিলেন—হ্যাঁ এইবার ছাড়ছি।

মলিনা চীৎকার করিয়া উঠিয়া আবার বিছানার প্রান্তে পড়িয়া গেল—কিসের যেন একটা তীব্র ভয় তাহাকে আড়ষ্ট করিয়া পুনরায় সংজ্ঞাহীন করিয়া ফেলিল। দত্ত অন্ধকারে হাতড়াইয়া তাহার দেহটা অনুভব করিলেন, শরীর শক্ত হইয়া গিয়াছে, দাঁতে দাঁত চাপিয়া সে মেঝেয় পড়িয়া রহিয়াছে।

আলোটা আবার জ্বালিলেন—মলিনার মুখ দেখিয়া মনে হয়, হঠাৎ একটা প্রেতের ভয়ে সে যেন মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। দত্ত কোনরূপ করুণা প্রকাশ না করিয়া উচ্চকণ্ঠে ঠাকুরকে বলিলেন—ঠাকুর ভাত দাও।

দত্ত খাইতে নীচে নামিয়া গেলেন—মলিনা মেঝের উপরে সংজ্ঞাহীন দেহ এলাইয়া দিয়া পরম বিস্ময়কর বিস্মৃতির মাঝে সমাহিত হইয়া রহিল।

*

তপন কলেজে যাইয়া সেদিন যেন বার বার বিমনা হইয়া যাইতেছিল। মনের গোপন অন্তরালে রেণুকা তাহার সহিত আজ অবশ্যই আলাপ করিতে আসিবে এমনি একটা আশা বার বার উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল, কিন্তু মনে মনে সে বুঝিতেছিল—এমনি একটা হওয়া সম্ভব নয় এবং মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিকও নয়। সমিতির মারফতে সামান্য পরিচয় ত শেষ হইয়াই গিয়াছে—তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য এতটা আগ্রহ কেন তাহার হইবে?

তপন বারান্দা দিয়া কয়েকবার অকারণেই ঘুরিয়া বেড়াইল—অন্য ক্লাশ চলিতেছে। রেণুকা কোথায় তাহা বলা যায় না। আসিবে না বুঝিয়াও সে একটা আশা পোষণ করিতেছিল।

ব্যর্থ হইয়া চলিয়া আসিতেছিল—হঠাৎ রেণুকা একাকী সিঁড়ির সোপানে শব্দ তুলিয়া উঠিযা আসিতেছে। রেণুকা বলিল—বেশ ত তপনবাবু, আপনাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান, এমনকি রেঁস্তোরা পর্যন্ত খুঁজে এলাম।

—রেঁস্তোরায় গিয়েছিলেন?

—ভিতরে কি গেছি, রাস্তা দিয়ে আসতে আসতেই ত সব দেখা যায়। আপনার জন্যে শুধু শুধু মা'র কাছে বকুনি খেলাম।

—আমার জন্যে?

—হ্যাঁ, মা বললে, যে তোকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল তাকে একটু চা'ও খাওয়াতে নেই, ছিঃ ছিঃ—এটুকু ভদ্রতা জ্ঞান নেই। আপনি চা না খেয়ে এলেন কেন?

তপন হাসিয়া ফেলিল। কহিল—যাক্, ভেবেছিলুম কী-না একটা করে ফেলেছি!

রেণুকা কহিল—আজ আমাদের বাড়িতে যেতেই হবে, আর ক্লাশ আছে নাকি?

—ক্লাশ আছে কিনা তাই ঠিক নেই; কিন্তু—

রেণুকা যেন একটু ধমক দিয়া কহিল—কিন্তু-টিন্তু নেই—যেতেই হবে।

আপনার জন্যেই ত বকুনি খেলাম—ছিঃ ছিঃ আপনি বড্ডো খামখেয়ালী। রেণুকা হাসিয়া ফেলিল।

তপন বলিল—আপনারা চমৎকার! ঝগড়া করে জিতবার যো নেই—অপরাধ ক'রলেন আপনি অথচ অপরাধটা আমার ঘাড়ে বেশ নির্বিকার চিত্তে াপাচ্ছেন।

রেণুকা পরিহাস করিল—ওইটেই ত আমাদের গুণ।

—গুণ হতে পারে তবে সেটা ভয়াবহ।

—চলুন। এখুনি—আজকার মত ক্লাশ থাক্।

তপন কহিল—চলুন, আমারই যখন অপরাধটা হ'য়েছে—

রেণুকা কহিল—আমরা কিন্তু বড়লোক নয়। গরীবের বাড়ির চা, তাই বুঝে-সুজে যাবেন।

তপন বিস্মিত হইয়া কহিল—নিমন্ত্রণও ক'চ্ছেন, আবার বারণও ক'চ্ছেন।

—বারণ ত করি নি—বেশি কিছু আশা ক'রলে ঠক্‌তে হবে তাই ব'লছি।

তপন টিপ্পনী করিল—বেশি আশা ক'রলেই বা তা ব'লে ফেল্‌বো কেন?

—চলুন তবে।

*

তপন নিজের গাড়িতেই রেণুকাকে লইযা আসিল।

রেণুকারা তপনের মত বড়লোক না হইলেও বড়লোক। বাহিরের ঘরে সোফায় বসাইয়া দিয়া তপনকে কহিল—মা'কে খবর দিয়ে আসি, কেমন?

—দেবেন বৈ কি? না দিলে চা'র বন্দোবস্ত হবে কি করে?

—মা'র সঙ্গে আলাপ ক'রবেন না বুঝি?

—ক'রবো বই কি? সেই জন্যেই ত তাড়াতাড়ি খবব দিতে বল্‌ছি, কিন্তু একা ফেলে রাখবেন না। মা'দের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বড্ড ভয় করে।

রেণুকা হাসিতে হাসিতে উপরে উঠিয়া গেল।

রেণুকার মা আসিয়া কহিলেন—ব'সো বাবা! সেদিন এসেই চলে গেলে, আলাপও ক'রবার সুযোগ দিলে না। রেণুকা ত ভদ্রতাও করলে না। মনে মনে কি ভেবেছ কে জানে!

তপন লজ্জিত হইয়া কহিল—রাত্রি হ'য়ে গিয়েছিল তাই—

—হ্যাঁ তা ত বটেই, বাড়িতে মা হয়ত ভাববেন।

রেণুকা শাড়ি পাল্টাইয়া আসিয়াছিল। সে ব্যঙ্গ করিল—ওঁর জন্তে ওঁর মার ভাবনা নেই তবে গাড়ি নিযে বেরুলেই ভাবনা হয়।

মা প্রশ্ন করিলেন—কেন ?

—ও বাবা, ওঁর সঙ্গে একদিন গাড়িতে উঠ্‌লে ঠিক পেতে! কি র‍্যাশ্‌ ড্রাইভ করেন, মাঝে মাঝে মনে হয়, গেল বুঝি সব ছাতু হয়ে।

মা একটু উদ্বিগ্ন স্বরে কহিলেন—না বাবা, এটা ত তোমার ঠিক নয়। বাসের সঙ্গে তোমাকে ত আর রেস দিতে হবে না, তবে কেন ?

তপন যেন একটা অপরাধ করিয়া হাতে-নাতে ধরা পড়িয়া গিয়াছে এমনি করুণ স্বরে কহিল—না, তেমন জোরে ত চালাই না, তবে ফাঁকা রাস্তা পেলে—

—না না, তারই বা দরকার কি ?

খাবার আসিল। অল্প নয় বরং প্রচুর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঐশ্বর্য প্রকাশের ইচ্ছা খাদ্যের মধ্যে প্রকট না হইলেও তাহাকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার মত ইচ্ছা যে ছিল না তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। রেণুকা কহিল—খেয়ে নিন্, কলেজ ফেরত, ক্ষিধে নিশ্চয়ই পেয়েছে।

তপন লজ্জিতভাবে কহিল—ক্ষিধে অবশ্য পেয়েছে তবে বিশ্বগ্রাসী নয় যে এত পারবো।

রেণুকা কহিল—কি জানি, আপনার কোনটা পছন্দ কোনটা অপছন্দ তাই হাতের মাথায় যা পাওয়া গেছে সব দিযে দিয়েছি।

—ভালই করেছেন। এখন আমার পছন্দমত তুলে নেওয়ার জন্তে একখানা খালি প্লেট দেবেন কি ?

—না। সব খেতে হবে।

মা বলিলেন—এ ত বেশি নয় বাবা। তোমাদের বয়সে যদি না খাও তবে কবে আর খাবে।

রেণুকার মার সামনে সন্দেশ যেন গলায় আট্‌কাইয়া যাইতেছিল তবুও তপন যথাসাধ্য খাইয়া কহিল—আর পারি না।

রেণুকা একটু অনুরোধ করিল, মা আজকালকার ছেলেদের ক্ষুধাহীনতা তথা স্বাস্থ্যহীনতা সম্বন্ধে অভিযোগ করিলেন।

কিছুক্ষণ অকারণ আলাপ পরিচয়ের পরে মা বলিলেন—মাঝে মাঝে এসো।

বাবা, রেণু ত তোমার গল্পই দিবারাত্রি করে। দু'টিতে একসঙ্গে পড়াশুনো ক'রলে সুবিধে হবে—আমি আসি, আবার সবই ত দেখ্‌তে হয়। তিনি চলিয়া গেলেন।

তপন একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—আমাকে খুন করেন নি সেজন্য ধন্যবাদ।

রেণুকা কহিল—খুনই ক'রতে উদ্যত হ'য়েছিলাম ?

—উদ্যত! বদ্ধপরিকর, নইলে মা'দের সামনে এমন জোর জবরদস্তি করাটা কি ভদ্রতাসঙ্গত না মমতার লক্ষণ ?

রেণুকা হাসিয়া কহিল—বেশ বুঝলাম। খাবার পছন্দ হয় নি তাই বলুন, নইলে ওটুকু সবাই খেতে পারে।

—হা অদৃষ্ট! যাক্ ঝগড়া করে জিতবার দুঃসাহস নেই, আমি ক্ষমা চাইছি।

—ক্ষমা ক'রলুম।

—এতই যদি করুণা ক'রলেন, তবে অনুগ্রহ ক'রে আমাদের বাড়িতে একদিন কি যাবেন ? আমার মা'ও ত অনুরূপ অভিযোগ ক'রতে পারেন। পরের বাড়িতে গিল্‌তে পারো নিজের বাড়িতে ডেকে ত কাউকে খাওয়ালে না ?

—তিনি জান্‌বেন কি ক'রে ?

—আপনার মা যেমন ক'রে জান্‌লেন।

—সে ত আমি গল্প করেছি।

—আজ্ঞে আমিও অনুরূপ গল্প ক'রে থাকি, সেটা জানাতে ভুলে গেছি।

রেণুকা হাসিয়া কহিল—বেশ, দেখা যাবে।

*

তপন যখন বাড়ি ফিরিয়া আসিল তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। মোক্ষদা ঝি সঙ্গে সঙ্গে খাবার চা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। মোক্ষদা কহিল—আপনার জন্তেই ত এতক্ষণ কিছু করতে পারি নি দাদাবাবু, কোথায় ছিলেন ?

—শ্বশুরবাড়ি গেছ্‌লাম, খেয়ে এসেছি। চা-টুকু রেখে সব নিয়ে যাও।

মোক্ষদা তাহার ক্ষুদ্র দেহখানার একটা সর্পিল ভঙ্গি দিয়া কহিল—শ্বশুরবাড়ি নিজে নিজেই ঠিক করে ফেল্‌লেন ? আমাদের কিছুই ব'ল্‌লেন না ?

—কেন ব'লবো ?

মোক্ষদার ক্ষুদ্র দেহখানার মাঝে কি যেন একটা লাবণ্য আছে যাহা তপন না দেখিয়া পারে না। মোক্ষদা না করিলে যেন তাহার কিছুই ভাল হয় না— মণিকার ক্ষুদ্র দেহের মাঝেও এমনি একটা সস্নেহ আকর্ষণ আছে।

মোক্ষদা চলিয়া গেল। তপনের মনে পড়িল—মণিকা ত আজ তাহাকে কিছুই বলিল না। সেও ত রেণুকার মত ডাকিয়া লইয়া যাইতে পারিত কিন্তু সে কেন ডাকিল না ? মনে মনে তপনের অভিমান হইল—মণিকা যদি ডাকিত তবে কি সে অধিকতর খুশি হইত ? তাহার মাঝে প্রগল্‌ভতা নাই অথচ একটা অভিজাত সরস বুদ্ধি আছে যা কোন সময়েই অসুষ্ঠু হইয়া আত্মপ্রকাশ করে না। মনে মনে তপন মণিকাকে যেন বেশি করিয়াই চায়।

তপতী সেদিন কলেজ হইতে আসিতেছিল।

হরিচরণ অকস্মাৎ তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল—নমস্কার।

—নমস্কার।

—আমি সেদিন আপনার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছি তার জন্যে তখন না হোক পরে যেযে লজ্জিত হ'য়েছি। আপনি আমায় ক্ষমা ক'রবেন।

—ক্ষমা ক'রলাম।

—আজ কয়েকটা কথা শুনবার সময় আপনার হবে ?

—হবে ; কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে নয়—ট্রামে উঠে তারপরে ঠিক ক'রবো কোথায় যাওয়া যায়। কেমন ?

—চলুন।

একটা অখ্যাত পার্কের অপেক্ষাকৃত নির্জন প্রান্তে একখানা বেঞ্চে বসিয়া তপতী কহিল—বলুন, আপনার কি কথা।

হরিচরণ সহসা কোন কথা কহিল না। তারপর যেন একটা সংকল্প করিয়াই কহিল—আজ যা ব'ল্‌বো তা'তে যদি অপমানকর কিছু থাকেও তবে কিছু মনে ক'রবেন না।

—অসম্মান না ক'রেই ব'ল্‌তে চেষ্টা করুন।

হরিচরণ অনেকখানি সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল—আমি কুৎসিত, দরিদ্র

এবং বিবাহিত তা জানি কিন্তু মানুষের মন সমাজের এই সমস্ত বাধাবন্ধন কোন যুগে মানে নি। আমার মন যদি না মেনে থাকে তবে তাতে অন্যায় কিছু হয় নি নিশ্চয়ই।

---নিশ্চয়ই না হ'লেও সম্ভব বটে!

—আজ গৃহ, স্ত্রী, সমস্তকে ভুলেছি আপনার সঙ্গে, আপনাকে কতখানি ভালবাসি তা বোধ হয় জানেন না। হরিচরণ তীব্র ভাবাবেগে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া চুপ করিল, তাহার চোখ দুইটি সজল দৃষ্টি নিয়া তপতীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

তপতী যেন অত্যন্ত উল্লাসে কহিল—আমার কি করণীয় আছে?

হরিচরণ এ প্রশ্নের জবাব দিল না। তপতী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত কষ্টে হাসির বেগ সংবরণ করিয়া রহিল।

হরিচরণ ধীরে ধীরে কহিল—আপনার আলাপ পরিচয় আর এই সান্নিধ্যকে কি আমি স্নেহ বা ভালবাসা মনে ক'রতে পারি না?

তপতী কহিল—মনে ক'রে খুশি হ'তে চান হ'তে পারেন তবে এটা যে কি তা আমি নিজেই জানি না। আর যখন বিয়ে ক'রেছেনই তখন নূতন ক'রে আমাকে ভালবেসে লাভ কি?

---লাভ লোকসান বিচার ক'রে কি মানুষ ভালবাসে? ওটা তার ধর্ম, না বেসে পারে না তাই বাসে।

তপতীর আজ অকস্মাৎ মনে হইল—হরিচরণ যেন অত্যন্ত ক্ষুদ্র, এমনি ভাবে যে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করিতে পারে সে কি? তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখে বসন্তের গভীর ক্ষতে মুখখানা তাহার অত্যন্ত কুৎসিত—দুঃখের ভারে তাহা আরও কুৎসিত হইয়া উঠিয়াছে। তপতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—এই জন্যেই ডেকেছিলেন ত? আপনার কথা বোধ হয় শেষ হ'য়েছে?

হরিচরণ কহিল—হ্যাঁ, আর একটি কথা, আপনার কাছে কিন্তু আমি কিছু চাই নি—কেবলমাত্র আমার বক্তব্য বলেছি।

তপতী কহিল—ও আচ্ছা, আমার মনে থাক্‌বে। সরল বাংলা ভাষার অর্থ আমি বুঝি—তা ভুল হবার সম্ভাবনা কম।

তপতী চলিয়া আসিল। হরিচরণ তেমনি ভাবেই বেঞ্চখানির উপর বসিয়া রহিল—যেন বিশ্বের দরবারে তাহার নিবেদন আজ নিঃশেষে বলা হইয়াছে।

তপতী চলিতে চলিতে ফিরিয়া একবার চাহিল—দেখে হরিচরণ তেমনি ভাবে বসিয়াই একটা বিড়ি টানিতেছে।

*

হরিচরণ আজ বাড়ি আসিয়াছে।

তাহার স্ত্রী শোভারাণীকে সুন্দরী বলিলে বেশি বলা হয় তবে সুশ্রী বটে। বয়স আঠার হইবে—শ্বশুর শাশুড়ীকে সেবা যত্ন করিয়া গ্রামে লক্ষ্মীবধূ বলিয়া একটা প্রশংসাবাদ সে লাভ করিয়াছে। নির্বাক আনুগত্যের সঙ্গে সে সমস্ত কাজ করিয়া যায়, সেজন্য অনেকে তাহাকে সাধুবাদ দিয়াছেন। তাহার সমবয়সী বধূগণও তাহাকে সাধুবাদ না দিয়াছেন এমন নয়, কারণ যখনই পরিহাসচ্ছলে কেহ হরিচরণের দৈহিক অসৌন্দর্যের সমালোচনা করিয়াছেন তখনই শোভা উঠিয়া গিয়াছে এবং নানা কাজের অজুহাতে আর সভায় যোগদান করে নাই। কেহ কেহ ব্যঙ্গ করিয়াছে—সুন্দর পেলে না জানি কি ক'রতো!

হরিচরণ বাড়ি পৌঁছিয়াছিল সকালে। দ্বিপ্রহরে আহারান্তে একখানা বই হাতে লইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু সেটা অভিনয় মাত্র—মনে মনে সে শোভার আগমন আশা করিতেছিল তাই ঘুম আসে নাই। রান্নাঘর ও মায়ের ঘরে সে শতাধিকবার যাতায়াত করিয়াছে, হরিচরণ তাহা লক্ষ্য করিয়াছে কিন্তু শোভারাণী আসে নাই। মনে মনে সে একটা অসন্তোষ ভোগ করিতেছিল। ওঘরে সকলে বোধ হয় শুইয়া পড়িয়াছে কিন্তু শোভা বউও আসিল না। একটা অভিমান হরিচরণের মনকে বিষণ্ণ করিয়া দিল—অবশেষে অপ্রসন্ন মনেই সে ঘুমাইয়া পড়িল।

শোভা আসিয়াছিল সত্য কিন্তু নিদ্রিত হরিচরণের বিশ্রামের ব্যাঘাত না করিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। শোভা মনে মনে ভাবিয়াছিল—আর একটু পরে ঘুমাইলে কি হইত, বেলা ত যথেষ্টই ছিল। হয়ত ট্রেনে রাত্রি জাগিয়াছে—থাক।

তাহাদের বাড়ি গ্রামে। দিবাভাগে স্বামী-স্ত্রীর, বিশেষত নবপরিণীতাদের সাক্ষাৎ এখনও সেখানে চলতি হয় নাই। দেখা সাক্ষাৎ একেবারে কোথাও হয় না এমন নয়, তবে যে সমস্ত বধূ এ রীতিকে মানিতে চাহেন না তাঁহারা বেহায়া নামে পরিচিতা হন।

শোভা রাত্রে যখন ঘরে আসিল তখন রাত্রি গভীর। গ্রামে কেহ যেন আর

জাগিয়া নাই। অত্যন্ত সঙ্গোপনে শাশুড়ীকে ঘুম পাড়াইয়া দিয়া তবে সে আসিয়াছে। হরিচরণ একখানা বই অত্যন্ত অমনোযোগের সহিত পড়িতেছিল। শোভা আসিয়া শুইয়া পড়িল। হরিচরণ কিছুই বলিল না। দ্বিপ্রহরের অভিমানটা ভিতরে ভিতরে তাহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

শোভাই প্রথম কহিল—এখন রাখো, কত পড়বে আর?

হরিচরণ গম্ভীর ভাবে কহিল—এদিকে এসো, শোনো—

—বল না, কি?

—তুমি দুপুরে এলে না কেন?

—বেশ, এসে দেখলাম ত যে নাক ডাক্‌ছে—বাবা সে কি—শোভা হাসিয়া উঠিল।

—নাক যখন ডাক্‌ছিল তার বহু পূর্বেই আসা যেত, কিন্তু কেন আসো নি তা আমি জানি। আমার বুঝতে বাকি নেই।

—কি জানো বল ত?

—তোমার আস্‌তে ইচ্ছে হয় নি।

—ঠিক ধরেছ। তার পরে? কেন ইচ্ছে হয় নি ব'লতে পারো?

—হ্যাঁ। তবে তা ব'লে লাভ নেই। হরিচরণ পুনরায় পুস্তকে কৃত্রিম মনোনিবেশ করিল।

শোভা বুঝিল তাহার রাগ হইয়াছে। তাই কহিল—মা না ঘুমুলে আস্‌বো কেমন করে?

—এখন এলে কি ক'রে?

—বেশ! এখন আর তখন? এক কথা হ'ল বুঝি?

—ইচ্ছে থাকলে পারতে নিশ্চয়ই। ইচ্ছেই যখন হয় না তখন—

শোভা সকৌতুকে প্রশ্ন করিল—কেন ইচ্ছে হয় না, ব'ল্‌লে না?

—ব'ল্‌তে পারি তবে তা স্বীকার ক'রবে না।

—বল না, সত্যি হ'লে নিশ্চয়ই স্বীকার ক'রবো।

হরিচরণ একটু থামিয়া অত্যন্ত দীনকণ্ঠে কহিল—আমি কুৎসিত তা আমি জানি। ভগবান যা দিয়েছেন তার উপর আমার অভিযোগ নেই—আমাকে ভালবাসা তোমার পক্ষে তাই সম্ভব হয়নি—যদি হ'ত তবে ইচ্ছেটাও হ'ত। কেউ কাউকে ভাল না বাস্‌লে দুঃখ করা যেতে পারে কিন্তু অভিযোগ করা চলে না—

আমার কোন অভিযোগ নেই তোমার বিরুদ্ধে—কিন্তু দুঃখ পাই তাই ব'ললাম। নিজে খুশি না হলেও আমাকে আনন্দিত ক'রবার জন্যেও কি এটুকু ক'রতে পার না ?

শোভা তথাপি কৌতুক প্রশ্ন করিল—তুমি কুৎসিত কে ব'ললে ?

—আয়না।

—ভুলও তো দেখতে পারো।

—পারি, কিন্তু তুমি ভুল নিশ্চয়ই ছাখো নি—যাক্, তুমি ঘুমোও।

শোভার মনে মনে রাগ হইয়াছিল, সে ফিরিয়া শুইয়া রহিল। হরিচরণ আরও কিছুক্ষণ বই খুলিয়া উদাস মনে বসিয়া রহিল। ভাবিল—এই ত জগৎ! এখানে যে বঞ্চিত যে অভিশপ্ত সে কিছুই পায় না, যে ভাগ্য ও বিধাতার আশী-র্বাদ নিয়া জন্মিয়াছে সেই সব পায়। বিবাহিত পত্নী যদি ভাল নাই বাসে তাহার তাহাতে রাগ করিবার কি আছে ? নিজের অক্ষম জীবনে, চলার পথে লাঞ্ছনা ও দুর্ভাগ্যের বোঝা বাড়িয়ে লাভ কি ? হরিচরণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া বিড়ি ধরাইল।

শোভা প্রশ্ন করিল—বিয়ের আগে বুঝি তোমায় দেখেছিলাম ?

—দেখ লে ত বিয়ে ক'রতে না, আর এ দুর্ভোগও ভুগতে হ'ত না।

শোভা দেখিল সে যাহা বলিতে চাহিয়াছে তাহা বলা হয় নাই। তাই পুনরায় কহিল—বিয়ে যার সঙ্গে হ'ল তার বুঝি রূপের বিচার করে!

—করে! আর করে বলেই বিড়ম্বনা।

শোভা নিজের ভালবাসাকে অস্বীকৃত ও উপেক্ষিত দেখিয়া একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, তাই বলিল—আপন স্বপন পরকে দেখাও কেন ? বল্লেই পারো নিজের পছন্দ হয় নি।

—পছন্দ হয় নি ?

—হ্যাঁ, ক'লকাতায় কত সুন্দরী লেখাপড়া জানা মেয়ে দেখে মাথা ঘুরে গেছে তাই এখন একটা ছুতো ধরে ঝগড়া করা চাই।

হরিচরণ জবাব দিল না। কিছুক্ষণ হ্যারিকেন লণ্ঠনটার সাম্‌নে বসিয়া থাকিয়া শুইয়া পড়িল। শোভার উষ্ণ নিশ্বাস আপন বুকের মাঝে সে অনুভব না করিল এমন নয় তবুও সে রাত্রির মিলন অসম্পূর্ণ হইয়া রহিল—দুইখানা বুকের মাঝে সন্দেহ ও প্রবঞ্চনার সংশয় প্রাচীরের মত মাথা তুলিয়া স্বাভাবিক আকর্ষণকে খণ্ডিত করিয়া দিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে হরিচরণ তেমনি শুইয়া ছিল—একটু তন্দ্রাভাব আসিয়াছিল। একটু শব্দ হইতেই চোখ মেলিয়া চাহিল—শোভা অত্যন্ত সন্তর্পণে ঘরে ঢুকিল। দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া আসিয়া কহিল—কেমন আজ এসেছি, হয়েছে ত? কি ব'লবে বল।

সে শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিল। হরিচরণ কোন জবাব দিল না—শোভা উৎকর্ণ হইয়া কি যেন শুনিল তাহার পর দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া বাহিরের প্রাঙ্গণটা দেখিয়া আসিয়া কহিল—কি বললে না, কেন ডেকেছ?

—আমি ত ডাকি নি।

—বেশ, কাল এতগুলো কথা শোনালে! শুধু শুধু শোনালে?

হরিচরণ ধীর কণ্ঠে কহিল—আজ আসার ত কোন দাম নেই। আমার অনুরোধে এসেছ আমাকে খুশি ক'রতে যখন জানি তখন কেমন করে খুশি হ'ব! কাল যদি না ব'লতেই আস্তে তবে হয়ত খুশি হ'তে পারতাম।

শোভা গ্রীবাভঙ্গি করিয়া কহিল—এলেও দোষ, না এলেও দোষ! বেশ লোক তুমি।

হরিচরণ একটু হাসিয়া কি যেন ভাবিল, তাহার পর শান্ত কণ্ঠেই কহিল—তোমর দোষ ত আমি বলি নি। আমার কাছে যদি তোমার আস্তে না ইচ্ছে করে তবে তোমার দোষের কিছু নেই—আমার দোষ। আমার এমন গুণ নেই যাতে তোমার ভালবাসা আকর্ষণ ক'রতে পারি।

শোভা অভিমানস্ফুরিত কণ্ঠে কহিল—কেমন ক'রে বুঝলে ভালবাসি না?

—ওটা, বেড়াল কুকুরেও ঠিক পায়, আর আমি মানুষ হ'য়ে পাবো না, এটা কি সম্ভব? ভালবাসলে তা বলতে হয় না, মানুষ এমনিই ঠিক পায়।

—পেতে পারে কিন্তু তুমি পাও না। তোমার কাছে দিবারাত্রি বসে থাক্‌লেই বুঝি ভালবাসা হয়?

—না।

—তবে কি ক'রলে ভালবাসা হয়?

—কি ক'রলে? ভালবাসলেই ভালবাসা হয়, অভিনয় ক'রলে ভালবাসা হয় না।

—যাক্‌গে, তোমার সঙ্গে তর্ক ক'রে পারবো না ; কিন্তু শুধু শুধু মানুষকে দুঃখ দেওয়া ভাল নয়। যাই—কেমন ?

—যাও।

শোভা চলিয়া আসিল। আজ দ্বিপ্রহরে এত বিপদ ও বাধা অতিক্রম করিয়াও সে গিয়াছিল, ভাবিয়াছিল হরিচরণ নিশ্চয়ই খুশি হইবে কিন্তু সে তাহা হইল না। সে কেমন করিয়া বুঝাইবে যে ভালবাসাটা কেবল মাত্র সামান্য কাজের মাঝে বিচার করা যায় না—সংসারের মাঝে কি অমনি করিয়া কেহ পারে ? মনে মনে তাহার রাগ হইয়াছিল—এত করিয়াও ওই লোকটিকে সে খুশি করিতে পারিল না। দুই দিনের জন্য বাড়ি আসিয়া কেবল দুঃখকেই তীব্রতর করিয়া দিয়া যায়। কেমন করিলে ও সন্তুষ্ট হইবে, শোভা তাহা বুঝিয়া পায় না।

রাত্রিতেও হরিচরণ তেমনি উদাসীনভাবে ভাবিয়া যাইতেছিল—স্ত্রী সে যেমনই হোক্‌, ভাল না বাসিলে তাহাকে কেমন করিয়া ভালবাসানো যায়। শোভা যদি তাহার অক্ষমতাকে মার্জনা নাই করিতে পারিয়া থাকে তবে তাহার কি দোষ। যাহার যতটুকু পাওয়া উচিত জগতে সে ততটুকু পায়—অতি আশা করিলে বঞ্চিত হইতেই হইবে। তপতীকে যেমন দোষ দেওয়া চলে না তেমনি শোভাকেও চলে না।

শোভা অত্যন্ত শান্তভাবে শয্যার অপর অংশে শুইয়াছিল—সে কেবল মনে মনে আপনার ভাগ্যকে দোষারোপ করিতেছিল, এত করিয়াও সে এই লোকটির মন পাইল না। হরিচরণ ভাবিতেছিল—যে জীবনে কেবল বেদনা ব্যর্থতা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে সে জীবনে লাভ কি ? সে দুর্বহ জীবন ভার বহিয়া চলা কেবল নির্বুদ্ধিতাই নয় কাপুরুষতা ও ভীরুতাও বটে।

শোভা প্রশ্ন করিল—হিন্দু মেয়েরা কি স্বামীকে সুন্দর কুৎসিত বিচার ক'রে ভালবাসে ? তারা জানে স্বামী স্বামীই, আর কিছু নয়—তোমাদের মত তারা বাছাই করে ভালবাসে না।

হরিচরণ হাসিয়া উঠিল। শোভা অত্যন্ত ছেলেমানুষের মতই কথাটা বলিয়াছে। তাই হরিচরণ বলিল—ও কথায় ছেলে ভুলানো যায়, কিন্তু যারা বোঝে তাদের ভোলানো যায় না। হিন্দু মেয়েরাও মানুষ, তাদের মনও মানুষের মন, সুখ দুঃখ পছন্দ অপছন্দ তাদের আছে—তা না থাকলে তারা হ'ত জড় পদার্থ—নয় দেবতা।

শোভা তর্ক করিল না। তর্ক করিয়া কি সে ওই মনটার দীনতা দূর করিতে পারিবে? তাহার ইচ্ছা করিতেছিল চীৎকার করিয়া কাঁদে কিন্তু তীব্র অভিমানে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তুমি যে কি বুঝেছ তুমিই জানো। তবে একদিন হয়ত বুঝবে।

হরিচরণ হাসিল—কোন জবাব দিল না।

*

চন্দনা একখানা পত্র লিখিতেছিল মানবেন্দ্রের নিকটে।

কয়েকবার লিখিয়াছে কিন্তু তাহার পছন্দ হয় নাই, অবশেষে লিখিল—

মাননীয়েষু,

আজ একবার এই সঙ্গে আসিলে সুখী হইব। আশা করি, আমার মত শরণাগত লোককে সুখী করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। ইতি—

বিনীতা
চন্দনা

ড্রাইভারকে ডাকিয়া গাড়ি ও চিঠি লইয়া যাইতে হুকুম দিয়া আসিয়া বসিল। মনে মনে তবুও সংশয়—যদি মানবেন্দ্রবাবু না আসেন তবে ড্রাইভার লোকটা কি ভাবিবে! একটু উৎকণ্ঠিত ভাবেই সে অপেক্ষা করিতেছিল, অকস্মাৎ চাকর আসিয়া সংবাদ দিল—হালদারবাবু এসেছেন।

চন্দনা মনে মনে বিরক্ত হইয়াছিল তবুও বলিল—উপরেই নিয়ে এস। আমি আর নীচে যেতে পারি না।

ডাঃ হালদার আসিয়া স্মিতহাস্যে নমস্কার জানাইলেন। চন্দনা নমস্কার করিয়া কহিল—আসুন, বসুন। এমনি অসময়ে আমাদের মত মানুষের কথা স্মরণ হ'য়েছে। আশ্চর্যের কথা!

ডাঃ হালদার একখানা চেয়ারে বসিয়া কহিলেন—ব্যঙ্গ নয়। স্মরণ মানুষ ইচ্ছা ক'রে করে না, সে স্মরণ ক'রতে বাধ্য হয়।

—বাধ্য হয়! আপনাদের মত মানুষ,—এও কি বিশ্বাস করতে বলেন?

—বলি, কারণ এটা সত্য। সেদিন আপনার এখান থেকে যেয়ে একটা কথাই বার বার ভেবেছি। আমার স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, কন্যা আছে, পরিপূর্ণ

গৃহ থাকতেও আপনার এখানে আসবার একটা অদম্য প্রলোভন, একটা আকর্ষণ কেন অনুভব করি ?

চন্দনা সবখানিই বুঝিয়াছিল তবুও বলিল—আপনাদের মহত্ত্ব।

—না। মহত্ত্ব নয়—এটা প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে। মানুষ মনে মনে যাকে খোঁজে তাকে পায় না—এই আমার মতবাদ। আমি এটাকে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি, তাই সমাজ যাকে বলে দুর্নীত আমি তাকে দুর্নীতি ব'লতে পারি না—জানি মানুষের মন এমনি ব্যভিচারী। আমারও তাই মনে হয়, মনের সেই মূর্তিটার সঙ্গে আপনার যেন কোথায় একটা সাদৃশ্য আছে! তাই সম্ভবত এই আকর্ষণ—এর মধ্যে মহত্ত্ব নেই, করুণা নেই বরং আছে প্রয়োজন।

চন্দনা দার্শনিক মতবাদটা ব্যাখ্যা করিবার মত ভঙ্গিতে কহিল—কিন্তু মানুষ যখন জানে, যে সে কোনদিনই তাকে পাবে না, তখন খুঁজে মরার অহেতুক পরিশ্রম সে কেন স্বীকার করে ?

—ওইটা মানবজীবনের অভিশাপ। দেহ নিয়ে জন্মালে যেমন ক্ষুধা আছে, তেমনি মন নিয়ে জন্মালেও তার আকাঙ্ক্ষা আছে।

চন্দনা মনে মনে আনন্দ বোধ করিতেছিল। সে প্রশ্ন করিল—আপনি কি ভেবে দেখেছেন আমার এখানে আসার পিছনে আপনার কোন আকাঙ্ক্ষা আছে কি না ?

—দেখেছি। আসবার আকাঙ্ক্ষাই রয়েছে—এও ভেবেছি, আপনাকে আমার গৃহে পেলে খুশি হতাম কি না, তার উত্তর পেয়েছি—না। বিলাসের মাঝেও না, গৃহের মাঝেও না—পোষা পাখির মতও না।

—তবে কেমন ভাবে পেতে চান- চন্দনা মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

ডাঃ হালদার কথাটাকে লক্ষ্য করিলেন না, করিলে চন্দনার এই অশোভন প্রশ্নে হয়ত একটু বিব্রতই হইয়া পড়িতেন। তিনি ধীরে ধীরে পুরাতন সূত্র ধরিয়াই বলিয়া চলিলেন—মনে হয়, যেন সাহচর্য চাই। জগতের মাঝে মনে যে ক্ষত সঞ্চিত হ'য়েছে তার যেন একটা আরোগ্যকর প্রলেপ খুঁজি আপনার কাছে।

চন্দনা কহিল—আপনার মত সুখী কে ? অর্থ, নাম, পরিপূর্ণ গৃহ, এর মাঝেও আপনি ক্ষত সংগ্রহ ক'রলেন কি ক'রে ?

—একা আমি নয়, সকলেই করে। কেউ স্বীকার করে, কেউ সৎসাহসের অভাবে করে না।

চন্দনা একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিল—গৃহে কি ভালবাসা পান নি আপনি ?

ডাঃ হালদার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—পেলেও যা হ'ত, না পেয়েও তাই হ'য়েছে। সে আমাকে ভালবাস্‌তে বাধ্য এমন ধারণা আমার নেই—না ভালবাস্‌লেও অভিযোগ করবো না, কাজেই দুই-ই প্রকৃতপক্ষে সমান।

চন্দনা একটু বিরক্তির সঙ্গে কহিল—আপনি কি বলেন কিছুই বুঝি না। আপনার মতবাদ কিছু কিছু যেন বুঝি কিন্তু যতই তার ব্যাখ্যা আপনি করেন ততই সেটা দুরূহ হ'য়ে যায়।

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমিও যতই চিন্তা করি ততই দুরূহ হ'য়ে দাঁড়ায়। কিসে সুখী হব যতই ভাবি, ততই মনে হয় সুখী হওয়া সম্ভব নয়।

বাহিরে মোটরের শব্দ হইল। চন্দনা তাড়াতাড়ি জানালায় গিয়া দেখিল—হ্যাঁ মানবেন্দ্র আসিয়াছে, কেবল তাহাই নহে, কাহাকেও কোন প্রশ্ন না করিয়া সরাসরি উপরে উঠিয়া আসিতেছে।

ডাঃ হালদার প্রশ্ন করিলেন—কে ?

চন্দনা জবাব দিল—মানবেন্দ্রবাবু।

বলিতে না বলিতেই মানবেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া কহিল—ডাঃ হালদার যে! নমস্কার। এমনি একজনের সঙ্গে দেখা হবে আশা ক'রেছিলাম।

—আসুন। মানবেন্দ্রবাবু—বসুন।

—বসব বই কি ? আমি হঠাৎ আসায় কোন অসুবিধা হয় নি ত আপনাদের ?

—না না না, বসুন। আমি ব'ল্‌ছিলাম—আমি যতই চিন্তা করি আমার মতবাদটা যেন ততই দুরূহ হ'য়ে পড়ে। যেমন ওঁর এখানে আসি, আস্‌তে একটা আকর্ষণ বোধ করি, কিন্তু কেন তা ঠিক বুঝতে পারি না।

মানবেন্দ্র কহিল—আপনি বুঝবেন না। বুঝবেন চন্দনা—কিন্তু তিনিও অবুঝ, তাঁকে বোঝানো সবচেয়ে শক্ত।

—আমার কি মনে হয় জানেন ? মানুষ একা, একেবারেই একা, তার সঙ্গে অন্যের পদে পদে সংঘাত হ'চ্ছে—তার মন রুধিরাক্ত হ'চ্ছে, তার দুঃখ বেড়ে যাচ্ছে, অন্যের দুঃখ বাড়িয়ে তুলছে।

মানবেন্দ্র কহিল—আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ একমত, তবে আমি অমন একা বোধ করি না—আমার মনে হয় সবই আমার, চন্দনাই বলেন আর আদিত্যবাবুই বলেন, আর আপনিই বলেন, সবই। এ জগতে লোককে জোর ক'রে আপনার ক'রতে হয়—সংঘাত হয় তবে তার ফল খারাপ হয় না। যাদের জোর ক'রবার সৎসাহস নেই তারা সংসারের মাঝে দুঃখ আহরণ করে।

—কিন্তু মানুষ ত আপনার হয় না।

—হয়। জন্তু জানোয়ার হয় না। আপনার মতবাদটা বিশ্বাস করা আপনার প্রয়োজন। যেহেতু আমার মতবাদ বিশ্বাস ক'রবার সাহস আপনার নেই অথবা যেমন চন্দনার বাড়িতে এসেও আপনার দাবী না জানিয়েই আপনি বার বার বাড়ি ফিরে যান এবং মনে হয় আপনি সত্যই একা। হ্যাঁ, আপনি সত্যই একা।

চন্দনা এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল। সে কহিল—একটু চা'র জোগাড় ক'রবো কি? যদি সময় হ'য়েছে মনে করেন—

হালদার বলিলেন—না না, থাক।

মানবেন্দ্র বলিল—না কেন? চারটে ত বাজে, হোক চা মন্দ কি?

চন্দনা চা'র বন্দোবস্ত করিতে চলিয়া গেল। মনে মনে সে ডাঃ হালদারের উপস্থিতিতে একটু বিরক্ত হইয়াছিল এবং অনুমান করিয়াছিল তাহার অনুপস্থিতিতে মানবেন্দ্রের সম্মুখে পড়িলে হালদার নিশ্চয়ই বেশিক্ষণ থাকিবেন না।

ডাঃ হালদার তাঁহার চিন্তাধারার খেই ধরিয়া কহিলেন—আচ্ছা মানবেন্দ্রবাবু, আপনার কি মনে হয় আমি যা বুঝেছি তা ভুল?

মানবেন্দ্র কহিল—এ সংশয় কেন আপনার? ওটা আপনার জীবনে সত্য কিন্তু বহুলোক এমন আছে যাদের জীবনে সত্য নয়। আপনি চন্দনার এখানে কেন আসেন জানেন?

—জানি, ওর সংসর্গ সাহচর্য যেন ভাল লাগে।

চন্দনা যদি আপনাকে বিয়ে ক'রতে রাজি হয় আপনি তাকে বিয়ে করেন?

—না।

—কেন?

—জানি তা'তে সুখী হব না—অথচ এখানে আস্তে ভাল লাগে।

—অর্থাৎ গৃহে আপনার জীবনে যেটুকু না-পাওয়া রয়ে গেছে সেটুকু পেতে চান?

—হ্যাঁ, বোধ হয় তাই।

—চন্দনাকে চান না, তার সাহচর্য চান একথাটা কি একটু পরস্পরবিরোধী হ'চ্ছে না? মানবেন্দ্র একটু স্মিতহাস্যে প্রশ্ন করিল।

—বিরোধী অথচ সত্য, এর এতটুকু ভুল নেই।

মানবেন্দ্র বিস্মিতভাবে কহিল—আপনি তা হ'লে সত্যিই ত আপনার ফিলজফি বিশ্বাস করেন। আপনি ত আত্মহত্যা ক'রতে পারেন—নিজেকে এমনি ক'রে মনে মনে বঞ্চিত করা ত মেরে ফেলাই—ঘোর অবিচার করেছেন আপনার উপর।

—আমি? না—জগৎ যেমনভাবে তৈরি তাতে এই অবিচার হবেই।

—ভুল, ডাঃ হালদার। আমি ব'লতে পারি আপনি কেন চান না। আপনি সকল মন দিয়ে চন্দনাকে চান কিন্তু সমাজ সংসার আর সংস্কার আপনার কণ্ঠ চেপে ধরেছে তাই বল্তে পারেন না।

—না না, মানবেন্দ্রবাবু। আমি ভেবে দেখেছি আমি সত্যিই চাই না।

মানবেন্দ্র হাসিয়া উঠিয়া কহিল—আপনি বড্ড ভীরু, সেই জন্যেই আপনি গৃহে বঞ্চিত। দাবী ক'রে আদায় ক'রতে জানেন না। অন্যের ভরসায় থাকেন তাই মনের মত জিনিস না পেয়ে মনে মনে দুঃখ পান।

—আপনি কেন এসেছেন, ভেবে দেখেছেন?

মানবেন্দ্র কহিল—আমি আসি নি। চন্দনা গাড়ি পাঠিয়ে আমাকে আনিয়েছে আর এসেছি কেন, জানেন? যেহেতু এখানে আসবার জন্যে মনে কোনরূপ আকর্ষণ অনুভব করি নি। আমি জানি, চন্দনা সুন্দরী এবং গুণবতী, পৃথিবীর সকল মানুষেরই ওঁকে ভাল লাগা স্বাভাবিক, কারণ যা সুন্দর, যা ভাল, তা সবাই চায়, কিন্তু চন্দনার জীবন তা হ'লে টেঁকে না। এখানে যদি কেউ অতৃপ্তি নিয়ে দুঃখ করে তবে তাকে বল্‌বো—ভীরু। সে সংগ্রাম করে পারে নি—পরাজিত হ'য়ে, আহত হ'য়ে নিজের গা নিজে লেহন করছে মাত্র।

—তা হ'লে এ দুঃখ ত অনিবার্য।

—না, একমাইল একটা দৌড় দিলাম, সকলেই প্রথম হবে না। যে শ্রেষ্ঠ

সেই হবে, আমি পারলুম না বলে দুঃখ কি? যে দুঃখ পায় তার প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়া উচিত নয়।

—কিন্তু প্রতিযোগিতা ত চল্‌ছেই সর্বত্র।

—হ্যাঁ, কিন্তু সেটা আমাকে পরাজিত ক'রবার জন্যে নয়, সেটা প্রথম হবার জন্যেই।

চন্দনা চা লইয়া ফিরিল, সঙ্গে দু' একখানা ভাল বিস্কুটও আসিল। মানবেন্দ্র একখানার সদ্ব্যবহার করিতে করিতে কহিল—আদিত্যবাবুর মত আতিথেয়তা আপনার নেই কেন ভাবি।

—নেই বুঝলেন কি ক'রে?

—তা হ'লে আমার বিজ্ঞাপনের উত্তরে আপনার একখানা পত্র পেতাম নিশ্চয়ই।

ডাঃ হালদার কি যেন একটা ভাবিয়া বিষণ্ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি সহসা উঠিয়া বলিলেন—আমি আসি মিস্ চন্দনা। আমি অনেক সময় নষ্ট করে গেলাম, কিছু মনে ক'রবেন না।

—না না, নমস্কার। আপনারা আসেন এ ত আমার সৌভাগ্য।

ডাঃ হালদার মানবেন্দ্রকে কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেলেন। মানবেন্দ্র চা'র শূন্য কাপটি নামাইয়া রাখিয়া বলিল—একটা মিথ্যা কথা কেন ব'ললেন?

—কি! মিথ্যে আবার কি ব'লাম?

—কেন? ডাঃ হালদারের আগমন ত সত্যই সৌভাগ্য বলে মনে করেন না।

—করি না করি, কিন্তু বলাটা ভদ্রতা।

—ঐ ভদ্রতা ক'রে ক'রে লোকটাকে যে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে তুলছেন তা কি বুঝ্‌তে পারেন? আপনাদের এই করুণাই সর্বাপেক্ষা মারাত্মক।

চন্দনা প্রগল্‌ভ ভাবে উত্তর দিল—না না না, তাই ব'লে ভদ্রলোককে কি মুখের উপর বলা যায় যে, আপনি আস্‌তে পাবেন না। সে কি সম্ভব?

—সেটা সম্ভব নয় বলেই ত ওঁর গৃহকে অসম্ভব ক'রে তুলেছেন। সেই গৃহে একটি মহিলা যে নিরন্তর দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ছে তার জন্যে দায়ী আপনাদের এই ভদ্রতা।

—হোক্, যতই বলেন অমনি করে বলা আমাদের দ্বারা হবে না।

—না হোক্। এখন অধীনকে স্মরণ করেছেন কেন অনুগ্রহ ক'রে বলুন।

চন্দনা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একটু হাসিয়া কহিল—ব্যঙ্গ ?

—না, নিছক সত্যি কথা। সেবাব্রত আমার জীবনের আদর্শ—সকলকে সুখী করা তথা কাউকে সুখী না করাই আমার আদর্শ।

—এক কথা হল।

—হ্যাঁ, যে সকলকে সুখী ক'রতে চায় সে কাউকে সুখী ক'রতে পারে না। যেমন নিজেকে সুখী ক'রতে চান বলে, লাহিড়ীকে দুঃখ দিচ্ছেন, ডাঃ হালদারকে দুঃখ দিচ্ছেন ইত্যাদি।

—দুঃখ দেওয়াই আমার পেশা তা হ'লে ?

—হ্যাঁ, যেহেতু ভগবানের অশেষ দান নিয়ে জন্মেছেন।

—আর আপনার পেশা সুখী করা—না ?

—হ্যাঁ, তা নইলে—এত কষ্ট করে আসতে পারতুম না। যাক্—তারপরে কি ব'লবেন বলুন। কি কথা আপনার ?

—কথা না থাকলে বুঝি আসতে নেই ?

মানবেন্দ্র একটুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল—আস্তে পারা যায়, তবে ডেকে পাঠান যায় না।

—তাও যায় মাঝে মাঝে—আপনি কি ঠিক করলেন ?

—কিসের ?

—অভিনয় করার ?

—সে ত করবো না বলেছি। প্রশ্নটা অবান্তর জানি—আপনার কথাবার্ত্তা শুনে সন্দেহ হ'চ্ছে একটু পরেই ব'লে ব'সবেন আমাকে ভালবাসেন ?

—যদি বলিই, তাতেই বা অপমান কি ?

—অপমান কি মানে ? এর চেয়ে বড় অপমান কি আছে ? কুকুরকে মানুষ ভালবাসে সে প্রভুভক্ত বলে, বাঘকে ভয় করে সে স্বাধীনচেতা বলে। যদি ভালবাসেন তবে বুঝবো আমি কুকুরের দলে, তাই না ?

মানবেন্দ্র হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। এমন উচ্চকণ্ঠে সে হাসিয়া উঠিল যে সমস্ত ঘরখানা যেন সেই সঙ্গে কাঁপিয়া উঠিল। চন্দনা ভীত ভাবে বলিল—আপনি কি বলেন বুঝতেই পারি না।

—কেন ? এর চেয়ে সরল কি আছে ? আপনি আমাকে ভালবাসেন —ধরুন, কিন্তু আমি বলি সেটা ভালবাসা নয়, সেটা একটা খেয়াল—একটা ফিলজফির বাতিক ঐ হালদার সাহেবের মত।

—কেন ? বাতিক কি থাক্‌তে নেই ?

—থাকুক—সকলেরই যদি থাকে তবে সমস্ত দুনিয়াটাই বাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মজা মন্দ নয়—হালদারের বাতিক তিনি আপনাকে চান; আপনার বাতিক আমাকে চান, আমার বাতিক আমি মিস্‌ এক্স ওয়াই জেড্‌কে চাই, মিস্‌ এক্সের বাতিক তিনি মিঃ পি কিউকে চান, এই রকম ক'রে একেবারে এনেথ টার্ম (*Nth term*) যেয়ে দেখা গেল এনেথ ব্যক্তি ডাঃ হালদারকে চায় অর্থাৎ একটি বৃত্তের পরিধির উপর দিয়ে সকলই তার পূর্ব ব্যক্তিকে ধরবার জন্যে দৌড়চ্ছে! জগৎটা বেশ।

মানবেন্দ্র আবার হাসিয়া উঠিয়া বলিল—আচ্ছা আসি মিস্‌ চন্দনা। এই বেকুবের দলে যেয়ে আমি আর দৌড়তে চাই নে। আমি মানুষ মাত্র, ফিলজফি আর ভালবাসার এই ব্যূহচক্র আমার প্রয়োজন নেই।

কোনরূপ উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া মানবেন্দ্র ঘর হইতে দ্রুত বাহির হইয়া গেল। চন্দনা বিমর্ষ বিস্মিত আঁখি মেলিয়া দেখিল—মানবেন্দ্র চলিয়া গেল। সে প্রতিবাদ করিবার সাহস সঞ্চয় করিতে করিতে প্রতিবাদের সময় চলিয়া গিয়াছে।

তপতী সেদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া লক্ষ্য করিল—মানবেন্দ্র যেন একটু খোঁড়াইয়া হাঁটিতেছে। দেখা করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হঠাৎ মানবেন্দ্রের এইরূপ হইবার কি কারণ জানিবার জন্য তাহার কৌতূহল যেন অদম্য হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান মানবেন্দ্রকে প্রশ্ন করিল—অমন খুঁড়িয়ে হাঁটছেন যে ?

—সেটাও লক্ষ্য করেছেন ? কপাল আমার—ওটাকে এত কষ্টে গোপন রেখেছিলাম। হ্যাঁ, যা দেখেছেন তা সত্যিই, অর্থাৎ বাতে মাঝে মাঝে একটু খোঁড়া ক'রে দেয়।

—তবে আবার হেঁটে বেড়াচ্চেন কেন ?

—কেন ? না হেঁটে কি মানুষ পারে ? কতক্ষণ বসে থাকা যায় একা একা।

তপতী বলিল—চলুন, আমি গল্প ক'রবো। আর এত বই থাকৃতে—

মানবেন্দ্র হাসিল—বই আছে বটে কিন্তু ওটা মহৎ লোকের সংসর্গ। মহতের সংসর্গ কি সর্বদাই ভাল লাগে—ওটা বড্ড একঘেয়ে boring।

—আমাদেরটা ?

—মহৎ নয় বলেই একঘেয়ে নয়। নীচু দিকে যাবার মানুষের একটা স্বভাবগত প্রবৃত্তি আছে, উপরে ওঠাটাই অস্বাভাবিক, অতএব সামান্য সংসর্গের উপরেই লোকের ঝোঁক বেশি।

—তবে চলুন, আপনাকে সামান্য সংসর্গই দান করা যাক্—

মানবেন্দ্র তপতীকে ডাকিয়া লইয়া নিজের ঘরে গিয়া বসিল। পশ্চিমের জানালা দিয়া রক্তাভ আলোক ঘরের মেঝেয় আসিয়া পড়িয়াছে। মানবেন্দ্র কহিল—আপনার হরিচরণের খবর কি ? নিশ্চয়ই তার সঙ্গে পরিচয় শেষ হ'য়ে যায় নি ?

—না, সেদিন তার সাহস দেখে আশ্চর্য হ'য়েছি।

—সাহস তার কোনদিনই কম নয়। আগে যে রকম দুঃসাহসের সঙ্গে আপনাকে কটু কথা বলেছে, তাতে তাকে ভীরু বলা চলে না।

তপতী একটু ম্লান হাসিয়া কহিল—হ্যাঁ, পুরুষের সাহস ঐ রকমই। দুদিনে তুবড়ির মত বারুদ পুড়ে যায়, শেষে খোলটা মানুষের পায়ের চাপে গুঁড়ো হ'য়ে যায়।

মানবেন্দ্র বলিল—একটু ভুল রয়ে গেল, মেয়েমানুষের পায়ের চাপে গুঁড়ো হয়ে যায়। তা হ'লে হরিচরণকে ইতিমধ্যেই গুঁড়ো ক'রে ফেলা হ'য়েছে ? যাক্, আমি একটু চিন্তান্বিত হ'য়েছিলাম। আমার এক হাকিম বন্ধু ছিলেন, তিনি কাছারিতে ভয়ানক কড়া কিন্তু সর্বদাই স্বীকার ক'রতেন যে গৃহে তিনি পরাজিত ও পর্যুদস্ত। এই পরাজয়ের ফলটা ফ'লতো কাছারিতে—এখন হরিচরণের পরাজয়টা কি আকার ধারণ করে সেইটাই সমস্যা। যাক কি হ'য়েছে ব্যাপারটা বলুন ত।

তপতী একটু হাসিয়া কহিল—এই গল্প উপন্যাসে যেমনটি হ'য়ে থাকে। খুব ভূমিকা ক'রে ব'ললে যে সে বিবাহিত এবং দরিদ্র ইত্যাদি, তথাপি সে নাকি—

—আপনাকে ভয়ানক ভাবে ভালবেসে ফেলেছে এইত? আপনি কি ব'ল্‌লেন?

—ব'লব আবার কি? শুনে উঠে এলাম, এর কি কোন উত্তর আছে?

মানবেন্দ্র একটু চিন্তা করিয়া কহিল—সত্যিই নেই। বাক্য সেখানে মূক—একটা জিনিস বোধহয় লক্ষ্য ক'রেছেন, যতদিন সে আপনাকে কটু কথা বলেছে ততদিন আপনি তাকে ভালই মনে করেছেন কিন্তু যেদিন শরাহত পক্ষীর মত আপনার পদপ্রান্তে এসে পড়েছে তখন তাকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলে মনে হয়েছে। এটা আপনার মনের ধর্ম—কিন্তু সে আপনাকে ভালবাস্‌লো কেন ব'লতে পারেন?

—সম্ভবত—

—সম্ভবত আপনার দেহ কান্তি, কিন্তু সেটা ত খুব অতুলনীয় কি অলৌকিক ধরনের নয় যে তার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করা যেতে পারে—তবে আমার চোখ নিয়ে সে ত দেখে নি।

তপতী একটু লজ্জিত হইয়া কহিল—গালাগালিটা প্রত্যক্ষভাবে করাই কি ভাল?

—ভাল বটে, কিন্তু সর্বদা তা করা যায় না। আর অতিথি হ'য়ে সেটাও করা ঠিক নয়।

—আপনি যে আমাদের অতিথি এবং আর কিছু নয় এবং তা বারবার স্মরণ করিয়ে দেবার এ প্রলোভন আপনার কেন ব'লতে পারেন?

মানবেন্দ্র তথাকথিত বাত-ক্লিষ্ট পা'টাকে হাত দিয়া ধরিয়া একটু সরাইয়া রাখিয়া কহিল—পারি। তার কারণ এই যে, আপনাদের নৈকট্যকে আমি মনে মনে ভয় করি। শেষে হরিচরণের মত গুঁড়ো না হ'য়ে যাই।

তপতী একটু অপেক্ষা করিয়া কহিল—সবাই ত জগতে গুঁড়ো হয় না, কেউ কেউ গুঁড়ো করে।

—হ্যাঁ, তাও করে—তবে নিজেও আহত হয়।

তপতী ব্যঙ্গ করিল—আপনার আহত হবার সম্ভাবনা কম। যে রকম বচন—

—না না না, মিস্ রায় ভুল করছেন, যাদের আহত হবার সম্ভাবনা কম, তারাই সবচেয়ে অকস্মাৎ একেবারে খুন হ'য়ে যায়—আহত হওয়ার সময়ই পায় না। যেমন স্টিল নোয়ায় না কিন্তু ভাঙ্গে—কাজেই আমারই ভয়টা বেশি।

তপতী আবার হাসিল—মিস্ রায়? ভাল। সকলে আস্তে আস্তে আপনার করে, আর আপনি দূর করেন, এইটাই আপনার বিশেষত্ব।

—ভয় পেলে লোকে অস্বাভাবিক কাজই করে।

—ভয়টা কার জন্যে? আমার কি?

—হ্যাঁ। ব'লতে বাধা নেই, আপনার করে ভয়টা সমধিক—হরিচরণের মত যদি চুরমার হ'য়ে যাই—মানবেন্দ্র হাসিয়া উঠিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, সে আলোটা জ্বালাইয়া দিয়া কহিল—আচ্ছা আসুন—কিছু মনে ক'রবেন না।

তপতী উঠিল না, প্রশ্ন করিল—চন্দনা কি বলে?

—একই কথা। আপনার মতই অবোধ্য ভাষায় নানা কথা বলে, তবে তার মধ্যে একটা কিছু বোধ্য, সেটা হচ্ছে এই যে সে আমার সঙ্গে একটা ছবিতে অভিনয় করতে চায়।

—আপনি রাজি হয়েছেন?

—ভাবছি—টাকাও হবে, নামও হবে।

—ছিঃ ওই টাকা আর ওই নামে আপনার লোভ হয়?

—ওর চেয়ে প্রলোভনের আর ত কিছু দেখি না—চন্দনা আছে, টাকা আছে, নাম আছে।

তপতী ব্যস্ততার সঙ্গে কহিল—না না, ওর চেয়ে আপনি চাকুরি করেন সেও ভাল।

—অর্থাৎ গোলামী ক'রবো কিন্তু স্বাধীন ব্যবসা ক'রবো না।

—টাকা আর নামের গোলামী না হয় নাই ক'রলেন।

মানবেন্দ্র যেন একটু উষ্মা সহকারেই কহিল—আমাকে কি একটা যুগাবতার মহাপুরুষ পেলেন নাকি? সমস্ত পৃথিবী যার গোলাম আমি তাকে উপেক্ষা ক'রবো?

—না, আপনার কাছে এ যেন আশা করি না।

—ওইত আপনাদের দোষ, আমি যা নয় তা ভাবলে আপনাকে ঠকতে হবেই। তার জন্যে আমাকে দোষ দেওয়া যায় না, যেমন হরিচরণ আপনাকে ভুল বুঝে ঠকেছে।

তপতী তর্কের খাতিরে কহিল—দু'টো কি এক জাতীয় হ'ল?

—হুবহু এক। তফাৎ এই যে, একটা আপনার ব্যক্তিগত, আর একটা দুর্ভাগ্য হরিচরণের ব্যক্তিগত।

তপতী সবিনয়ে কহিল—আপনার সঙ্গে তর্কে জিতবার দুঃসাহস নেই। আচ্ছা আসি।

*

ডাঃ হালদার অত্যন্ত বিমর্ষভাবে বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন কিন্তু বিমর্ষতার কারণ নিজে সম্পূর্ণ ভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। যেন তাঁহার একটা ভয়াবহ রকমের পরাজয় হইয়া গিয়াছে এমনি গ্লানিতে সমস্ত মন উত্তেজিত হইয়াছিল—কাহার কাছে পরাজয়, কেনই বা পরাজয় তাহা কিছুই বোঝা যাইতেছে না—একটা অকারণ অসূয়া ও অতৃপ্তি তাঁহার মনটাকে বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে। তিনি যখন বাসায় ফিরিলেন তখন অপরাহ্ণ।

হালদার-পত্নী তখনও নিদ্রিত। ছেলে মেয়ে দুটি জাগিয়া কি যেন খেলা করিতেছে। বাড়ির চাকরটা একতলার ঘরে বসিয়া পাড়ার আর কয়েকটি চাকরকে একত্রিত করিয়া দ্বিপ্রাহরিক আড্ডা জমাইয়া তুলিয়াছে।

হালদার উপরে উঠিয়া গেলেন, তাঁহার চেয়ারখানায় বসিয়া যেন আপনার ক্ষতবিক্ষত মনটাকে লেহন করিতেছিলেন—এমনি অসময়ে ঘুমের প্রয়োজনীয়তা কি? রাত্রে প্রচুর ঘুমের ত কোন অন্তরায় নাই! যাক্—মানুষের মনের সম্বন্ধে কোন নীতির মাপকাঠি নাই, কিন্তু চন্দনার ব্যবহারে কোথাও ত এমন কিছু নাই যাহাতে সে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছে বরং তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির উপর একটা শ্রদ্ধার কথাই সে প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু মানবেন্দ্র যে বলিয়াছে তিনি ভীরু, সে কথা কি সত্য? আপনার দাবী জানাইবার সাহস নাই—চন্দনাকে যদি চাহিতেন তবে তাহা অকপটে বলিবার যথেষ্ট সাহস তাঁহার আছে। যাহারা কেবলমাত্র দৈহিক একটা প্রেরণাকে চায় তাহাদের এ বেদনা ত নিষ্প্রয়োজন—তাঁহার স্ত্রীর মত নির্বিকারচিত্তে তাহারা ঘুমাইতে পারে—মনে মনে তিনি স্ত্রীর প্রতি একটা ইঙ্গিত করিলেন। ও যেন কেবল দেহই, ওর মাঝে কল্পনাপ্রবণ কোন হৃদয় নাই।

স্ত্রী জাগিয়া উঠিয়া সহাস্যে কহিলেন—কখন্ এলে। ডাকোনি যে!

—তোমার ঘুমের ব্যাঘাত ক'রে লাভ হ'ত কি?

—বেশ, একটা লোক যদি অসময়ে ঘুমোয় তবে তাকে ডাকবে না ?

—মানুষ অসময়ে ঘুমোয় না। বিনা প্রয়োজনেও ঘুমোয় না -যাক্।

স্ত্রী কহিলেন—চা ক'রে আনবো, খাবে ?

—আনো, চা খাবার সময় ত হয়েছে, তবে আমার দরকার নেই খেয়েছি।

—কোথায় ?

—এক বাড়িতে। সে শুনে কি হবে ?

—কোন বাড়িতে বল না ?

—চন্দনার ওখানে।

—আবার সেখানে গিয়েছিলে ? সেখানে চা খেলে ?

—হ্যাঁ, কেন খাবো না ? যদি কেউ আদর ক'রে শ্রদ্ধা ক'রে ডেকে খাওয়ায় তবে তাকে না বলাও যায় না, আর তাকে প্রত্যাখ্যান করাও উচিত নয়।

চন্দনা যে তাঁহাকে শ্রদ্ধা দেখাইতে চা'এর নিমন্ত্রণ করিয়াছে এই সংবাদটি স্ত্রীর নিকটে পৌছিয়া দিবার জন্য যেন তিনি একটি উৎকণ্ঠা ভোগ করিতেছিলেন—পরাজয়ের যে অস্বস্তিটা এতক্ষণ বুকের মাঝে সূচের মত বিঁধিতেছিল তাহা সহসা যেন উবিয়া গেল। স্ত্রী কহিলেন—সেখানে কেন যাও ? লোকে যে তোমাকে নিন্দে করে।

—নিন্দে ? সাধারণের নিন্দে স্তুতির মূল্য একই, আজ তারা যেমন অকারণেই প্রশংসা করতে পারে কাল তেমনি বিনা কারণে নিন্দে করতে পারে।

স্ত্রী বাদানুবাদ না করিয়া চা করিয়া আনিয়া বলিলেন—মানুষে যা'তে নিন্দে করে তা কেন কর ? তোমার সম্মান কি এতে থাকে ? সেখানে যেয়ে তোমার লাভ ?

—লাভ ? যে শ্রদ্ধা করে তাকে প্রত্যাখ্যান করায়ও ত কোন লাভ নেই। তোমার পক্ষে এই যে অন্ধকে ভালবাসা তা'তে কি লাভ ?

স্ত্রী ব্যথিত স্বরে কহিলেন—ছিঃ ওসব কথা ব'লো না, ওতে পাপ হয়। তোমার কেন এমন মন !

ডাঃ হালদার বিজ্ঞের মত একটু হাসিয়া বলিলেন—হ্যাঁ, আমার মনের বিকার একটু আছে বই কি. কিন্তু সেটা আপনা আপনিই ঘটে নি। সত্য

হোক মিথ্যা হোক, তোমার ব্যবহারের মধ্যে এমন কোন ব্যাপার আছে, যাতে আমার মনে এ সন্দেহ হ'য়েছে—আর তাতে ত আমি তোমাকে দোষ দি না।

স্ত্রী ক্ষণিক চুপ করিয়া থাকিয়া যেন অনেকটা অসহায়ের মতই বলিলেন—যদি তাই মনে কর তবে আমার সঙ্গে ঘর ক'রতে তোমার ঘেন্না করে না? স্পষ্ট বলে আমাকে তাড়িয়ে দাও না কেন? আমি চ'লে যাই।

ডাঃ হালদারও উত্তেজিত হইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন—যেদিন যাবার দিন আসবে সেদিন আমাকে তাড়াতে হবে না, তুমি নিজেই যাবে। ইচ্ছা করলে আজই যেতে পার।

—তাই যেতে হবে, তুমি বার বার আমাকে এমনি অসম্মান করবে! আমি আর কত সহ্য ক'রবো? ছেলেমেয়েরা বড় হ'য়ে উঠল আজও তোমার এই কুৎসিত ইঙ্গিত ক'রতে একটু লজ্জা ক'রলো না?

—যা সত্য বলে বিশ্বাস করি তার ইঙ্গিত ক'রতে লজ্জা না করাই স্বাভাবিক।

স্ত্রী আঁচল চোখে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—বেশ, তাই হবে। চ'লেই যাবো।

*

ডাঃ দত্তের উষ্মা ও উত্তেজনা ক্রমশ বাড়িতেছিল। বিবাহিত পত্নীকে তিনি আপনার মত করিয়া লইতে পারিলেন না, সে তাঁহাকে ভালবাসিল না, তাঁহার সুখের জন্য এতটুকুও ত্যাগ করিল না, এ সমস্তই যেন তাঁহারই অক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করে। নিজের অশক্ততা ও অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে একটা ভয়াবহ প্রতিশোধ লইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া ফেলিল! ক্রোধে ক্ষোভে তিনি যাহা হয় একটা হেস্তনেস্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছিলেন।

মলিনা বাচনিক প্রতিবাদ করে, জানাইতে চায় যে সে সত্যই বঞ্চনা করে নাই কিন্তু তাহার মন ও দেহ অকস্মাৎ অজ্ঞান হইয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া দেয়। সে বুঝে, স্বামী তাহাকে বড় ভালবাসে তবুও সে সামান্য এইটুকু অক্ষমতা ক্ষমা করে না কেন!

ডাঃ দত্ত ঠিক করিয়াছিলেন, মলিনা যখন দরজা খুলিয়া রাখিতে দেয় না

তখন তাহাকে তালাবন্ধ করিয়াই রাখিয়া যাইতে হইবে—তাহার অন্যায় ও অহেতুক জিদের কাছে পরাজয় স্বীকার করাটা নিতান্তই অগৌরবের। আজ কয়েকদিন বাহিরে যাইবার সময় দত্ত তালাবন্ধ করিয়া যান—মলিনার কাতর ও ব্যাকুল অনুরোধকে উপেক্ষা করিয়া ভারী তালাব চাবিটা খুট্ করিয়া ঘুরাইয়া বন্ধ করিয়া দেন—এবং মনে মনে একটা পৈশাচিক প্রতিশোধের আনন্দ অনুভব করেন।

সেদিন ফিরিয়া তালা খুলিতেই দেখেন, মলিনা প্রায় বিবস্ত্র হইয়া বসিয়া আছে এবং তাঁহাকে দেখিয়া হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। মলিনার হাসি মিষ্ট এবং বহুদিন দত্ত তাহার প্রশংসা করিয়াছেন কিন্তু আজকার হাসি তাহাব নিকট যেন অত্যন্ত বিকট ও বীভৎস বলিয়া মনে হইল। দত্ত প্রশ্ন করিলেন—অমন হাস্‌ছো যে!

মলিনা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আবার হাসিয়া উঠিল—হাঃ হাঃ

—তার মানে?

মলিনা হঠাৎ তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিল—তুমি কে?

—চিনতে পাবো না?

—আমায় খুন ক'র্‌তে এসেছ?

—না, আমায় চিন্‌তে পারছো না?

—কে—বল না। আমাকে নিয়ে যাবে—আমি যাবো না, উঃ বড্ড অন্ধকার!

—সে কি? তুমি কি ব'ল্‌ছ!

মলিনা অমনি বিবস্ত্র অবস্থায়ই আসিয়া বলিল—তোমার পায়ে পড়ি আমায় নিয়ে যেও না।

—কোথায় নিয়ে যাবো?

—না, ঐ অন্ধকারে আমি যাবো না, ওখানে আমাকে মেরে ফেল্‌বে, উঃ দম বন্ধ হ'য়ে মরে যাবো।

ডাঃ দত্ত কহিলেন—কি পাগলের মত বকছো? আমি তোমাকে আবার কোথায় নিয়ে যাবো—তুমি ত আমাকে যমালয়ে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছো?

মলিনা চুপ করিল।

ডাঃ দত্ত পুনরায় উষ্মাপূর্ণকণ্ঠে কহিলেন—অমনি করে বসে রয়েছ, ভদ্রলোকের বৌ তুমি তোমার লজ্জা করে না ?

ডাঃ দত্ত চাহিয়া দেখেন মলিনা জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কিছুক্ষণ বাদে দেখেন সে কাঁদিতেছে। নিকটবর্তী হইতেই সে চীৎকার করিয়া উঠিল—আমায় মেরো না, মেরো না—উঃ আমি যাবো না, তোমার সঙ্গে যাবো না, বড্ড অন্ধকার।

ডাঃ দত্ত আর একটু আগাইয়া আসিয়া মলিনার হাত চাপিয়া ধরিলেন—মলিনা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—আমায় ছুঁলে, দিদি, আমি যে মারা গেছি—হাঃ হাঃ হাঃ—

ডাঃ দত্ত অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন—মলিনা কি বলছো ?

মলিনা আবার হাসিল।

ডাঃ দত্ত অত্যন্ত হতাশভাবে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। হায় ! মলিনা কি তাহা হইলে সত্যই পাগল হইয়াছে ! তিনি কাতরকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন—মলিনা শেষে এই করলে ? মলিনা আপন মনে বিড়বিড় করিয়া যাইতেছে, দত্তের প্রতি তাহার কোনরূপ মনোযোগ নাই।

*

হরিচরণ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিল।

কিন্তু একটা ভাবনা তাহাকে একেবারে উন্মনা করিয়া দিয়াছিল। ভগবান তাহাকে এমন অক্ষম, এমন কুৎসিত করিয়া সৃষ্টি করিলেন কেন ? একান্ত উপেক্ষিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত হইয়া অবান্তর বস্তুর মত জগতে বাঁচিয়া থাকিবার কি সার্থকতা আছে ! জগতে যদি সে শ্রদ্ধা ভালবাসা সম্মান না পাইল তবে জীবন ধারণ করা নেহাৎ কাপুরুষতা মাত্র। সে ভাবিয়া স্থির করিল—বাঁচিয়া থাকাটা তাহার পক্ষে একেবারেই নিরর্থক—অনাবশ্যক।

সমস্ত কর্ম, সমস্ত চিন্তা ব্যাপিয়া এই ভাবনাটাই তাহার মনে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিল—জগতে সব কিছুই যেন নিরর্থক, কলেজে যাওয়া, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করা, ওই তপতী, শোভা, সমস্তই তাহার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে যেন একেবারেই অনাবশ্যক হইয়া গেল।

কলেজে বসিয়া সেদিন কি যেন একটা পরীক্ষা করিতেছিল—হার্ড টেস্ট-

টিউবে একটা গ্যাস তৈয়ারি হইতেছিল, অকস্মাৎ সেটা ফাটিয়া চারিদিকে ছিটকাইয়া গেল। হরিচরণ এমনি বিমনা হইয়াছিল যে চমকাইতেও ভুলিয়া গেল। অধ্যাপক বকাবকি করিলেন—সে তাহা শুনিয়া নেপথ্যে একটু হাসিল মাত্র। আজ এই আকস্মিক দুর্ঘটনাটা যেন তাহাব কাছে হাস্যকর।

সাইনাইড গ্রুপ লইয়া একটা পরীক্ষা ছিল. তাহার মধ্যে মারাত্মক পোটাসিয়াম সাইনাইড হাতে পড়িতেই তাহার মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। হরিচরণের মনে হইল এই মহার্ঘ বস্তুটকে হাতছাড়া করা ঠিক হইবে না—এদিক ওদিক চাহিয়া সামান্য একটু একখানা পুরাতন চিঠির খামের মাঝে ফেলিয়া পকেটে রাখিয়া দিল। এটির ব্যবহার করাটা তাহার প্রয়োজন হইযাছে এমন নয়, তবুও প্রয়োজনের সময় পাছে না পাওয়া যায এই ভয়েই যেমন লোকে ব্যাঙ্কে টাকা রাখে, সেও তেমনি এটা সঞ্চয় করিয়া ফেলিল।

ছুটির পর আসিয়া পানের দোকানটার সামনে দাঁড়াইয়া বিড়ি খাইতেছিল। অন্যদিন যেমন অচঞ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে আজ ঠিক তেমনটি নয়—বুকের অতি সন্নিকটে ওই সামান্য বস্তুটুকুর অস্তিত্ব তাহাকে বার বার বিমনা ও উত্তেজিত করিয়া দিতেছিল। মনে হইতেছিল—এইটুকু গালে ফেলিয়া দিলে সমস্ত পৃথিবী মুহূর্তে চোখের সামনে ঘনান্ধকারে লেপিয়া একাকার হইয়া যাইবে, তাহার মাঝে শোভা, তপতী সকলেই সমাধিলাভ করিবে। উহাদের সমস্ত স্পর্ধা, সৌন্দর্যের অহঙ্কার, অর্থ বিত্ত সবই নিরর্থক হইয়া যাইবে। ওই বস্তুটা যেন মুহূর্তে সকলকে পরাজিত করিয়া দিতে পারে—তপতী হয়ত দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে, হয়ত অনুশোচনা করিবে, শোভা হয়ত বা দুঃখিত হইবে। জীবনে সে যে বেদনা অন্যকে দিতে পারে নাই মরণের মাঝে সে বেদনা দিয়া যাইবে। অন্যকে বেদনা দিবার শক্তি তাহার নাই, তাহার অভিমানের প্রত্যুত্তর নাই, এইটাই যেন তাহার নিকট অত্যন্ত অসহনীয় মনে হইতেছিল।

অকস্মাৎ চাহিয়া দেখে তপতী ধীরে শ্লথ পদক্ষেপে যাইতেছে। কিছু বলিবার ছিল এমন নয় তবুও একটু কৌতুক করিবার জন্যই সে নেঙচাইতে নেঙচাইতে তাহার পিছু লইল। মনে মনে হাসিল, দেখি ওর স্পর্ধা আর ঔদ্ধত্য* কতদূর-- সে মহীরুহ সে নিমেষে ধূলিসাৎ করি। দিতে পারে।

হরিচরণ হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিল—নমস্কার মিস্ রায়, বোধ হয় এখনও চিন্‌তে পারেন ?

তপতী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল—চোখ খারাপ এখনও ত হয় নি বলে বিশ্বাস।

—ধন্যবাদ, এত অল্পবয়সে চোখ খারাপ মানুষের হয় না, তবে দৃষ্টি 'বিভ্রম প্রায়ই ঘটে। কারণ, সেটা দৃষ্টি শক্তির প্রাখর্যের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে।

তপতী কঠিন কণ্ঠে কহিল—তার পর?

—আমার কিছু বক্তব্য ছিল সেটা শুনবার অবসর কি আপনার হবে?

—আপনি যা ব'লবেন তা আমি জানি।

—আশ্চর্য!

—হ্যাঁ, একই কথার পুনরাবৃত্তিটা পীড়াদায়ক, এটা বোধ হয় জানা আছে।

—সম্ভবত, যদি সেটা পুনরাবৃত্তি হয়ই।

—বর্ণনাভঙ্গি পৃথক হ'লেও গল্পাংশ একই বোধ হয়?

—হ্যাঁ, তবে সেটা ল্যাম্বের লেখা সেক্সপিয়ার নয়। সেক্সপিয়ারেরই লেখা—

—ওই একখানা ফোলিও এডিশন্ ত?

—যাই হোক্, যদি অনুগ্রহ করে একটু সময়ের অপচয় করেন।

—অপচয় জেনেও সেটা করা যায় না। আচ্ছা আসি, কিছু মনে করবেন না। ভালবাসলেই তার একটা প্রতিদান পাওয়া যায় না, অতএব অনুশোচনা ক'রে লাভ নেই।

তপতী উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সামনের অপেক্ষমান ট্রামে উঠিয়া বসিল।

হরিচরণ ব্যথিত বিস্মিত দৃষ্টিতে ক্ষণিক চাহিয়া থাকিয়া চলিল। তপতীর প্রত্যাখ্যানে যথেষ্ট রূঢ়তা ছিল তবুও হরিচরণ তেমন একটা দুঃখ বোধ করিল না। তাহার মনে হইল এটা যেন তাহার একান্তই প্রাপ্য এবং এইরূপ একটা ভিক্ষার প্রত্যাশা করিয়াই সে যেন তপতীর সঙ্গে আলাপ করিতে আসিয়াছে।

*

গভীর রাত্রিতে হরিচরণ একাকী জাগিয়াছিল।

নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে মনটা উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আর পকেটের সেই সামান্য বস্তুটা যেন তাহার চিন্তাধারাকে বেগবান করিয়া দিয়াছে।

তপতী যাহাই করুক, সে বড়লোকের মেয়ে, তাহার মত ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান

করাটাই তাহার যেন উচিত; কিন্তু শোভা তাহার বিবাহিত পত্নী, সেও যেন ভালবাসে নাই—সে যেন মাঝে মাঝে তাহার দৈহিক অসৌষ্ঠবকে ব্যঙ্গ করে। দাম্পত্য জীবনের অত্যন্ত খুঁটিনাটি ত্রুটিবিচ্যুতিকে মনের তাপে উষ্ণ করিয়া হরিচরণ তাহাদিগকে বড় করিয়া তুলিল।

একবার মনে হইল, তাহার মৃত্যুর পরে শোভা কি করিবে, তাহার জীবনটা ব্যর্থ হইবে কিন্তু হরিচরণ ভাবিল, একেবারে অলঙ্কারহীন হওয়া ভাল কিন্তু রুপার গহনা পরাটা যেমন অবশ্য দারিদ্র্যের চিহ্ন, তেমনি তাহার মত স্বামীর জীবিতাবস্থাও যেন তাহাকে পদে পদে বেশি লাঞ্ছিত করে। প্রতিবেশীর মুখে সে শুনিয়াছে শোভা সদাপ্রফুল্লচিত্ত কিন্তু তাহার উপস্থিতিই যেন তাহাকে বিষণ্ণ করিয়া তুলে—আর তাহার বড় মূল্য ধরা পড়িবে তাহার অনুপস্থিতিতে। হরিচরণ একখানা প্যাডের কাগজে লিখিল—

স্নেহের শোভা,

জানি, জীবনে তুমি সুখী হও নি এবং আমার মত কুৎসিত স্বামী তোমার সত্যই অযোগ্য। তাই তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, তুমি সুখী হ'য়ো। পরজন্মে যেন বিধাতার আশীর্বাদ নিয়ে জন্মাতে পারি এই প্রার্থনা ক'রো। আমাকে ভুলে জীবনকে সুখী ক'রো, সমাজ ও সংস্কারের নামে নিজেকে বঞ্চিত ক'রো না। ইতি—

তোমারই হরিচরণ

চিঠিখানা খামে পুরিয়া সেই রাত্রেই সে সেটা একটা বাক্সে ফেলিয়া দিয়া আসিল। তারপর তপতীর উদ্দেশ্যে লিখিল—

মিস্ রায়,

আমার যাহা প্রাপ্য তাহাই পাইয়াছি, তাহার জন্য অভিযোগ নাই। পরজন্মে যেন ভগবানের আশীর্বাদ লইয়া জন্মাইতে পারি। তবে কুৎসিত দেহেও প্রাণ থাকে, তার অনুভূতি থাকে, তাই তাহার বাঁচা চলে না। অতএব বিদায় লইতেছি। ইতি—

হরিচরণ

হরিচরণ বিছানায় শুইয়া ক্ষুদ্র মোড়কটা খুলিয়া বালিশের পাশে রাখিয়া দিল। একবার ভাবিল—ইচ্ছা করিলেই সে ত জীবন রক্ষা করিতে পারে, কিন্তু অক্ষমতা ও দৈন্যের বোঝা লইয়া বাঁচিয়া থাকা কাপুরুষতা। ভগবান কেন

এমন করিয়া তাহাকে সৃষ্টি করিলেন? হরিচরণের মন সেই অদৃশ্য মহাশক্তির উপর অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল—চোখ দুইটি সজল হইয়া উঠিল।

একটি নিদারুণ প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষায় সে শুভ্র বস্তুটুকু মুখে ফেলিয়া দিল।

*

মানবেন্দ্র দ্বিপ্রহরে ইজিচেয়ারে শুইয়া কি একখানা বই পড়িতেছিল—একটা মৃদু পদশব্দ কানে আসিতেই দরজার দিকে চাহিল। তপতী যেন একটু কি রকম ভাবে আসিতেছে, আশ্চর্য হইয়া সে প্রশ্ন করিল—কি মিস্ রায়, অসময়ে? কলেজে যান নি?

কোনরূপ আহ্বানের অপেক্ষা না করিয়া তপতী একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া কহিল—গিয়েছিলাম কিন্তু কলেজ ছুটি হ'য়ে গেছে।

—কেন? কোন্ বড়লোক আবার মারা গেলেন?

তপতী একটু বিমর্ষ ও বিচলিত কণ্ঠে কহিল—হরিচরণবাবু আত্মহত্যা করেছেন।

—ও সেটা ত আমি জানতুম কিন্তু এত শীঘ্রই ব্যাপারটা ঘটল? আশ্চর্য!

—আমাকে নাকি একটা পত্র দিয়ে গেছে।

তপতী থামিল। মানবেন্দ্র কি যেন ভাবিতেছিল তাই কোন প্রশ্ন করিল না। তপতী ক্ষণিক পরে একটা দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া কহিল—আমার জন্য একটি লোক মারা গেল—সংবাদটা শুনবার পর থেকে কেমন একটা অস্বস্তি কাঁটার মত বিঁধছে।

—ও সেরে যাবে। সে লোকটিকে সুখী ক'রতে যখন আপনি পারতেন না—তখন দুঃখ ক'রে লাভ কি?

—কিন্তু দুঃখ ত হয়।

—দুঃখ কিসের, ওটা আপনার পক্ষে গৌরবের। যে মেয়ের জন্য যতগুলি লোক আত্মহত্যা করে সে মেয়ে ততদূর গৌরবান্বিত। এতে দুঃখের কিছু নেই বরং আপনার মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে অর্থাৎ আপনি এমনই সুদুর্লভ যে আপনার জন্যে আত্মহত্যা করা চলে।

—আমি নিজে যেচে আলাপ করেছিলাম, সেইটেই বড় দুঃখ দিচ্ছে।

—ভবিষ্যতেও আবার অমনি ক'রবেন, আবারও দুঃখ ক'রবেন এবং আবারও পল্লীর নিভৃত কোণে অমনি আর একটি বধূ সিঁথির সিন্দূর মুছে চোখের জলে বৈধব্যকে বরণ ক'রবে—প্রতিবাদ ক'রবে না, অভিযোগ করবে না।

মানবেন্দ্র চুপ করিল, সুদূর অজ্ঞাত এক পল্লীর কোণে হরিচরণের সদ্য বিধবা স্ত্রী কেমন করিয়া চোখের জলে চরম দুর্ভাগ্যকে স্বীকার করিল তাহাই ভাবিয়া হয়ত ব্যথিত হইয়াছিল, সে জানিল না কে কেমন করিয়া তাহাকে মুহূর্তে নিঃস্ব করিয়া দিল। হঠাৎ বলিল—আর এক পল্লীর ব'ললাম কেন জানো? গ্রামের ছেলেরা একটু বোকা, কারণ তাদের মন কৃত্রিমতার মুখোসের অন্তরালে আত্মরক্ষা করতে শেখে না—শহরের ছেলেরা চালাক তাই। যাক্ এতে দুঃখের কি আছে! মানুষ আপন পথে চলেছে, পায়ের নীচে প'ড়ে কত পিঁপড়ে, কত কীট দিবারাত্রি মারা যাচ্ছে তার হিসাব করলে চলা যায় না। মানুষকে চলতে গেলে অন্যের জীবনকে ক্ষতবিক্ষত করতে হয়ই; আর পরের দেওয়া আঘাতে নিজের জীবনকে নিঃস্ব করে দিতেই হয়—দহনই প্রদীপের জীবন। কি বলেন মিস্ রায়?

—কিন্তু আমি যে কিছুতেই তাকে ভুলতে পারছি নে—হয়ত আমারই কোন ভুল—

—হয় ত হ'য়েছে, কলেজের যে সমস্ত শ্রীমানেরা এতদিনেও আপনার প্রতি খরদৃষ্টি দেন নি এবার তাঁরা দেবেন—হরিচরণ জীবন-মূল্যে সে প্রাধান্য দিয়ে গেছে। তার দানকে স্বীকার ক'রে সগর্বে ঘুরে বেড়ান।

তপতী বিমর্ষভাবে বসিয়া রহিল। মানবেন্দ্র বুঝিয়াছিল—ঐ অস্বস্তিটা সত্যই তাহাকে আজ বিমনা করিয়া দিয়াছে। মানবেন্দ্র একটু চিন্তা করিয়া তথাকথিত বাতক্লিষ্ট পা'টা চাপিয়া ধরিয়া কহিল—উঃ মিস্ রায়, দিন দিন বেদনাটা যেন বেড়েই যাচ্ছে, এবারে সত্যিই খোঁড়া হ'লাম। হাঁটতেই পারি না।

তপতী কহিল—সে কি, হাঁটতেই পারেন না? কাল বিকেলে ত বেশ হেঁটে বেড়ালেন।

—হ্যাঁ, কিন্তু আজ আর উঠতেই পারি না। দেখুন—

মানবেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া খোঁড়া পা'টাকে টানিয়া টানিয়া হাঁটিতে চেষ্টা

করিল কিন্তু না পারিয়া ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িল। একটু হাসিয়া কহিল—খোঁড়া পায়ে টেনে টেনে হাঁট্‌লে লোকে হাস্‌বে, না মিস্‌ রায়?

তপতী যেন পরিহাস করিল—না, আপনাকে খোঁড়া দেখ্‌তেই যেন ভাল লাগে।

মানবেন্দ্র হাসিল কিন্তু কোন জবাব দিল না। তপতী কহিল—ডাক্তার কি বলে?

—বলে আবার কি? ওরা কি আর এ সব সারাতে পারে?

তপতী একটু পরে কহিল—যাক গে, চন্দনার অনুরোধে তা হলে আপনি একটা ছবিতে অভিনয় ক'রছেন?

—সম্ভবত। দেখুন, চন্দনার মত মেয়েকে সামনাসামনি না বলা যেমন কঠিন, আপনার মত মেয়েকে না বলাও ততোধিক কঠিন কিন্তু দাঁড়িপাল্লার ওধারে আর দুটো জিনিস আছে তার একটা খ্যাতি, অপরটি অর্থ।

—টাকা ত আপনি চান না। তা হলে ত রোজগার ক'রতেন।

—রোজগার করতে পারি না বলেই চাই না—এইটেই সত্যি।

—আর ঐ খ্যাতির মোহ আপনারও আছে?

—কেন নয়, আমি মানুষ, দেবতা নয়। রামচন্দ্রের মত দেবোপম মানুষও নয়, কাজেই মোহ আমার আছে।

—মিথ্যা কথা।

—বেশ। তা হ'লে নেই, কিন্তু সেটা সর্বদাই নেই, চন্দনার বেলায়ও যেমন নেই আপনার জন্যেও নেই। কারও জন্যেই নেই।

—তা কি হয়, কারও জন্যেই নেই এমন হয় না।

—তবে তাই, কোন একটি লোকের জন্যে আছে, তবে তা হরিচরণের মত কখনই স্বীকার ক'রবো না যে আপনার জন্যে আছে।

তপতী ব্যস্ততার সঙ্গে জবাব দিল—থাক্‌লে স্বীকার করতে ক্ষতি কি?

মানবেন্দ্র হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল—এর পরেই হয়ত বল্‌বেন আত্মহত্যা ক'রলেই বা ক্ষতি কি? মানবেন্দ্র আবার হাসিয়া চলিল—সে হাসি এমন যে দেখিলে সন্দেহ হয় যে সে মাতলামি করিতেছে।

তপতী সহসা কহিল—হাস্‌ছেন যে!

—একটু আগেই হরিচরণের জন্যে প্রায় কেঁদে ফেলেছিলেন আবার এখনই

আমার মুখে অন্য একটা জিনিস স্বীকার করাবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়েছেন তাই দেখে।

মানবেন্দ্র হাসিয়া উঠিয়া কহিল—মিস্ রায়, এমন নির্জন দুপুরে আমাদের হাসাহাসিটা সমাজের চোখে খুব প্রীতিকর নয়। তপতী নিরুপায় হইয়া উঠিয়া আসিল।

ডাঃ দত্ত কয়েক দিন যাবৎ ভাবিতেছিলেন এই রুগ্ন বিকৃত মস্তিষ্ক মলিনাকে লইয়া কি করিবেন। একদিন যাহাকে আপনার করিবার জন্য ব্যগ্রতা ও ব্যাকুলতার অন্ত ছিল না, আজ তাহাকেই জীবনের রঙ্গমঞ্চ হইতে সরাইয়া দিবার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। রাঁচির হাসপাতালে রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন কিন্তু এখনও কোন সংবাদ পান নাই।

মলিনা রুদ্ধ গৃহে একাকী বসিয়া বিড় বিড় করিতেছিল। ডাঃ দত্ত ঢুকিতেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—তাহাকে দেখিয়া নয়, অনেকটা আপন মনেই। দত্তকে দেখিয়া হঠাৎ যেন চমকাইয়া উঠিল, তাহার পরে কাতর ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—না না, আমায় মেরো না, আমি কিচ্ছু করি নি। কোন ক্ষতি করি নি তোমার।

দত্ত শয্যাপার্শ্বে অত্যন্ত বিমর্ষভাবে বসিয়া বলিলেন—আমি কি কেবল তোমাকে মারি মলিনা?

—আমাকে মারবে না বল?

—না।

মলিনা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অন্যমনস্ক হইয়া উঠিল। দত্ত তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—মলিনা, তুমি একেবারেই বুঝলে না?

মলিনা চীৎকার করিয়া উঠিল—ছাড়ো ছাড়ো, ম'লুম—ছুঁয়ো না, আমাকে ছুঁয়ো না।

দত্ত হাত ছাড়িয়া দিলেন—মলিনা যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—আমাকে শুধু শুধু মারো কেন—উঃ কেটে গেছে। রক্ত বেরুচ্ছে—মলিনা কাঁদিয়া উঠিল।

দত্ত বিমর্ষ ব্যথিত চোখের দৃষ্টি দিয়া মলিনাকে অবলোকন করিলেন—

দেহ, সৌন্দর্য সবই তাহার রহিয়াছে—যাহা দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। নাই কেবল মস্তিষ্কের সুস্থতা—একদিনের জন্যও মলিনা তাঁহার হইল না—তাঁহার অন্তর একটা শূন্য হাহাকারে ভরিয়া উঠিল। মলিনার অবাধ্যতায় এতদিন কেবল রাগই হইত, আজ যেন সমস্ত সংযম ছাপাইয়া কেবল কান্নাই পাইতেছে।

কে যেন ডাকিতেছে—অত্যন্ত শ্লথ ও অনিচ্ছুক পদক্ষেপে দত্ত নীচে নামিয়া গেলেন—মলিনার ভাই সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন যে রাঁচিতে স্থান পাওয়া গিয়াছে এবং এখুনি তিনি মলিনাকে লইয়া যাইবেন এবং কল্য রাঁচি রওনা দিতে হইবে।

এতদিন রাঁচিতে স্থান পাইবার জন্য ব্যস্ততা ছিল—আজ স্থান পাইয়াও মনটা ব্যস্ত হইয়া পড়িল। আজই হয়ত শেষ বিদায়।

মলিনার ভাই তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিলেন—মলি, কাপড় ছেড়ে নে, চল্ আমাদের বাড়ি যেতে হবে।

মলিনা তাহাকে চিনিয়াছে এরূপ কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। সে তেমনিভাবে বসিয়াই রহিল। দত্ত বলিলেন—যাও, তোমার দাদা তোমাকে সিনেমায় নিয়ে যেতে এসেছেন।

মলিনা হাসিয়া বলিল—সিনেমা ?

—হ্যাঁ, যাবে না ?

—যাবো বই কি। দাঁড়াও কাপড় ছেড়ে আসি।

মলিনা কাপড় বদলাইতে কক্ষান্তরে গেল না। দত্ত ও আগন্তুক বাহিরে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে লাগিলেন। মলিনার ভাই যেন একটু সন্দেহের সুরে কহিলেন—মলি কি আর ভাল হবে না ? এম্‌নি থাক্‌বে চিরদিন ?

ডাঃ দত্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া জবাব দিলেন—সম্ভবত আর হবেনা।

চিরদিনের মত মলিনা স্নায়বিক সুস্থতা হারাইয়াছে একথাটা বিশ্বাস করিতে যেন বুক ফাটিয়া যায়।

ভাই কেবল কহিলেন—ভাগ্য ! ভেবেছিলাম সুখী হবে কিন্তু ভাগ্যে তা সইল না।

দত্ত অবনত মস্তকে নীরবে দাঁড়াইয়াই রহিলেন।

মলিনা বাহির হইয়া আসিল। প্রসাধনে, শাড়ি পরিধানে কোন জায়গায় এতটুকু খুঁত নাই। এমনি আধুনিক অভিজাত বেশভূষায় ও দৈহিক লাবণ্যে

সে একদিন দত্তকে জয় করিয়াছিল। মলিনা যেন আজও ঠিক তেমনি—মৃতের প্রতিকৃতির মত প্রাণহীন।

দুয়ারে গাড়ি দাঁড়াইয়াছিল। ভাই বোন দুইজন গাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া যেন একটু ইতস্তত করিতেছিল। ভাই কহিলেন—দত্তকে প্রণাম কর মলি।

মলিনা যন্ত্রচালিতের মত একটা প্রণাম করিল। দত্তের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অত্যন্ত সম্মানে ও সবিনয়ে প্রশ্ন করিল—আপনি যাবেন না?

—যাবো। একটু পরে।

মলিনা ভাইয়ের সঙ্গে সেডান বডি গাড়িখানায় উঠিয়া বসিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া কি যেন দেখিল।

দত্ত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন—আজ যেন মলিনাকে আরও সুন্দর দেখাইতেছে—সে যেন আরও মাদকতাপূর্ণ। অথচ এই মলিনা, এত ভালবাসা পাইয়াও সমস্তই ফিরাইয়া দিয়া নিঃস্ব-ভাবে চলিয়া যাইতেছে।

গাড়ি চলিয়া গেল।

দরজায় দাঁড়াইয়া দত্ত অশ্রু সজল চোখে অসহায় মনে গাড়িখানার পানে চাহিয়া রহিলেন—বুকের উপর দিয়া তীব্রবেগে যেন সেটা চলিয়া যাইতেছে। একটা অশান্ত অপ্রকাশ্য ক্রন্দন এতক্ষণ বুকের মাঝে রুদ্ধ হইয়াছিল, হঠাৎ যেন মুক্ত হইয়া কণ্ঠের মাঝে আর্তকণ্ঠে হায় হায় করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

দত্ত অসহায়ের মত বলিয়া উঠিলেন—উঃ!

মলিনা আজ সমস্ত মান অভিমান, বোঝা না বোঝার ওপরে—মুহূর্তে সমস্ত অন্তরাকাশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

দত্ত একটা চরম অনুশোচনায় ও তীব্র বেদনায় অসহায়ের মত অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে আর একবার বলিলেন—ভাগ্য বলবান।

সামনের ঝাপসা দৃষ্টির মাঝে তখন মোটরখানা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

*

মানবেন্দ্র সন্ধ্যায় স্বল্পান্ধকারে বসিয়াছিল—চন্দনার শোফার আসিয়া সেলাম জানাইল। ক্ষুদ্র একখানা পত্র দিয়া দাঁড়াইল।

মানবেন্দ্র পড়িল।

সবিনয় নিবেদন,

বিশেষ কাজ না থাকিলে একবার আসিয়া উপকৃত করিবেন। আজ এ নির্জন অবসরে বড়ই একাকী বলিয়া মনে হইতেছে। মনে মনে যেন আপনাকে চাইছি। আশা করি মোটর ফিরিয়া আসিবে না। ইতি—

আপনার "চন্দনা"

মানবেন্দ্র হাসিল—কেন তাহা বলা কঠিন। সম্ভবত পত্রের ভাষার মাঝে প্রচ্ছন্ন একটা ইঙ্গিত আছে। মানবেন্দ্র পাঞ্জাবীটা পরিয়া লইয়া মোটরে উঠিয়া বসিল।

চন্দনা নীচের ড্রাইংরুমেই ছিল, সে অভ্যর্থনা করিল—আসুন, ভাগ্য আজ সত্যই সুপ্রসন্ন। সেদিনের মত মোটর ফিরে আসে নি।

মানবেন্দ্র স্মিতহাস্যে কহিল—আপনার মাঝে এত দৈন্য আশা করি নি। আমার মত ব্যক্তির পক্ষে আপনার এখানে আসাটা ভয়ঙ্কর গৌরবের সেটা বুঝতে পারেন।

—বাবা, আজ যে সুর উল্টো ঠেকছে।

—সোজা আর উল্টোটা ঠিক পাওয়া কি জগতে এতই সোজা? মানুষ যা হ'তে ইচ্ছে করে অথচ হ'তে পারে নি তাই প্রতিপন্ন ক'রতে সে ব্যস্ত হয়, জানেন? যেমন আপনাদের পরিচয় পাই নি বলেই চাই না বলে বেড়ানোটা আমার বেশি প্রয়োজন।

—হ্যাঁ, যে ফিল্মে পাঠ বলার জন্যে উমেদারীর অন্ত থাকে না, আপনি সেটা কিছুতেই ক'রতে রাজি না; কাজেই আপনার ঐরকম গৌরব বোধ করাটা ত স্বভাব নয়।

মানবেন্দ্র কহিল—ব্যাপারটাই বোঝেন নি। পাঠ বলার উমেদারী করে আপনাদের সাহচর্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়, কিন্তু যে পেয়েছে তার ত, পাঠ বলার প্রয়োজন নেই।

—এইটে নাকি পাওয়ার নমুনা, যে গাড়ি পাঠিয়েও আনা যায় না?

—নমুনা ত বটেই, তবে গাড়ি আছে তাই যায়, নইলে চিঠি যেত ডাকে। আর আমার আসাটা সর্বদাই একটা ভয়ঙ্ক ব্যাপার হবে এমন অনুমান করাটা কি বেশি রকম আত্মপ্রত্যয় নয়?

—আপনার বিনয় প্রশংসাযোগ্য।

—যাক্, বার বার আমাকে ডাকেন কেন বলুন ত?

—আপনি এত বড় মেধাবী লোক হ'য়েও বুঝতে পারেন না ?

—না, মেধার জন্যে ছোটকালে মাস্টারমশায়ের কানমলা অনেক খেয়েছি, বড় হ'য়েও সর্বসাধারণের কাছে সর্বদা খাচ্ছি। তবে যতদূর বুঝি আপনি যেন আমাকে একটু ভালবেসে ফেলেছেন বলে মনে হয়। কেমন ? অনুমানটা কি সত্য ?

—সম্ভবত।

—ঐ ত আপনাদের দোষ। কালদার সাহেবকে এমনি করে জ্যান্ত মেরে রেখেছেন—মলয়বাবু ও লাহিড়ীকে মেরেছেন—আর এ দরিদ্র অবধ্যকে কেন বধ ক'রবেন ? খুলেই বলুন।

—হ্যাঁ সত্যি।

—তা হলে প্রেমের পরিণতি পরিণয়ে, কেমন ? আমাদের বিয়ে হওয়া দরকার, কেমন ?

—ঠাট্টা করেন ? কেন তা কি সম্ভব নয় ?

—কেন নয়, খুবই সম্ভব তবে আমার যে টাকা পয়সা নেই।

—না-ই থাক্, তার দরকার নেই।

—কিন্তু আমার বিড়ির খরচা আপনি দেবেন কি ?

চন্দনা অধৈর্য হইয়া বলিল—পরিহাস না ক'রে কি আপনি পারেন না ? আমাদের মন কি এতই সস্তা, এতই মূল্যহীন যে তাকে যেমন খুশি অসম্মান করা যায় ?

—না না, রমণীর মন, সহস্র বর্ষেরই সখা-সাধনার ধন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ; কিন্তু দেবেন কিনা বলুন।

—সবই ত আপনার।

—তা হ'লে দত্তার নরেন্দ্রর মত এই সব বাড়ি ঘর টাকা পয়সা মায় তার অধিশ্বরীকে পর্যন্ত দাবী ক'রতে পারি ?

—ইচ্ছে ক'রলেই পারেন।

—কিন্তু তাহ'লে পাকাপাকি কথাই হ'য়ে যাক। তারপরে দিনস্থির করা যাবে—তাহ'লে আপনার টাকা আমার টাকা হ'বে এবং আমার মত ব্যতীত আপনি কিছু করতে পারবেন না—আপনার বাড়ি আমার হবে।

—উত্তম।

—কিন্তু আমার একটি শর্ত আছে, আপনি সিনেমায় আর অভিনয় ক'রতে পারবেন না। একবারে পর্দানশীল গৃহবধূ হ'য়ে থাকতে হ'বে।

—বসে খেলে রাজার ভাণ্ডার ফুরিয়ে যাব—উপার্জন না ক'রলে খাবে কি?

—এই সব বেচে দেব, তার পরে এক পাড়াগাঁয়ে যেয়ে, কয়েক বিঘা খামার জমি কিনবো—আবাদ ক'রবো। আর নিভৃতে বসে দু'জনে কাব্যকূজন ক'রবো, কেমন? সেথা এক বাড়িতে কেবল তুমি আমি—

—তা হ'লে এত শিক্ষা দীক্ষা, আর্টচর্চা এ কোন্ কাজে লাগবে?

—দু'জনে ক'রবো। কাব্য লিখ্‌বো, পড়বো—আর ব'লবো 'যদিদং হৃদয়ং মম তদিদং হৃদয়ং তব'! আর্টের পরিণতি হবে প্রেমে—সেই ত তার চরম বিকাশ।

—তাই বলে কি গ্রামে থাকা যায়? আর অভিনয় ছেড়ে দিলে—

—নাম লোকে ভুলে যাবে—তা যাক্। নাম খ্যাতি অর্থ এ সবই ত বাঞ্ছিতকে পাবার জন্যে। যখন বাঞ্ছিত আসে তখন এ সব ত অবান্তর।

—কিন্তু—

—তবেই ত গোলমাল। আমার ইচ্ছেটা ত ঐরকম, আপনার ইচ্ছে অন্যরূপ, এক্ষেত্রে আমাদের বিবাহ হ'লে ত হবে সংঘাত; অতএব—

চাকর আসিয়া জানাইল—ডাঃ হালদার আসিয়াছেন।

চন্দনা উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিল—এসেছেন ত কৃতার্থ করেছেন আর কি। বল্ গিয়ে আমি ব্যস্ত আছি অন্য সময় যেন আসেন।

মানবেন্দ্র বলিল—সেদিন যাঁর আগমনে গৌরব বোধ করেছেন, আজ তাঁরই প্রতি এমনি বিরক্ত হ'লে চলে না।

চাকরের উদ্দেশ্যে মানবেন্দ্র বলিল—যাও, বল গিয়ে যে উপরে আসুন। চাকর চলিয়া গেল। মানবেন্দ্র পুনরায় কহিল—তা হ'লে আমাদের পরিণয় প্রস্তাব আপাতত এখানে স্থগিত থাক্, ভবিষ্যতে পুনরালোচনা করা যাবে।

চন্দনা স্মিতহাস্যে কহিল -তবে তাই থাক্—ইস্ এত ঠাট্টাও ক'রতে পারেন।

মানবেন্দ্র হাসিল—চন্দনার এই অত্যন্ত মেয়েলী ন্যাকামি দেখিয়া।

ডাঃ হালদার আসিয়া সহাস্যে কহিলেন—নমস্কার মানবেন্দ্রবাবু, আপনাকে

এমনি সময়ে পাবো এত আশা ক'রতে পারি নি। বেশ বেশ, আড্ডাটা বেশ জম্‌বে।

মানবেন্দ্র কহিল—আমাকে দেখে সুখী হ'ন নি বলেই ত মনে হয়, অথচ এতখানি চাটুকারিতা ক'রে ফেল্‌লেন ?

—না না, সত্যই ব'লছি। আপনাকেই যেন চাইছিলাম।

—কিন্তু সত্য কথা ব'ল্‌তে কি, আমি কিন্তু আপনার আগমনে খুব খুশি হই নি, কারণ চন্দনাকে নানা কথা নিরিবিলি ব'লছিলাম, তা ছাড়া একটা একক সাহচর্যও ছিল সেটা থেকে বঞ্চিত হ'লাম।

—না না, তা হ'লে আমি উঠি।

—উঠ্‌লে আমি অবশ্য খুশি হতাম কিন্তু আর একটি লোক দুঃখিত হ'ত—যাঁর বাড়ি তার অধিকার বেশি, অতএব আপনার সাহচর্য তারই প্রাপ্য। আমাকে খুশি করতে তাকে দুঃখিত করাটা ভদ্রতা হবে না।

ডাঃ হালদার হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন—আপনার কথাগুলি সর্বদাই হেঁয়ালী-পূর্ণ—প্রথম শুন্‌লে মনে হয় কদর্থটাই সত্যি।

মানবেন্দ্র কহিল—আমি ছিলাম বটে কিন্তু উনি আলোচনা ক'রছেন আপনারই কথা, এতে আমার হিংসা হ'লে কি আপনি আপত্তি করতে পারেন! আর তাতে আপনার গৌরব। যেমন জনৈকা কুমারীর পাণিপ্রার্থী জনৈক আই, সি, এস এবং অপর একব্যক্তি যিনি সাধারণ ভদ্রলোক; এক্ষেত্রে যেমন শেষোক্ত ব্যক্তিকে আই, সি, এস মহোদয়ের গুণাবলী শ্রবণ করে হৃষ্টমনে আনন্দ জ্ঞাপন করতে করতে বাড়ি ফিরতে হয়, আমার অবস্থাও ঠিক তেমনি।

ডাঃ হালদার খুশি হইয়া কহিলেন—না না, অত মিথ্যা কথা বলবেন না মানবেন্দ্রবাবু।

—চন্দনা, তুমিই বল আমি একটুও মিথ্যা কথা বলেছি ? তুমি ওঁর বিদ্যা-বুদ্ধির প্রশংসা কর নি ?

চন্দনা জবাব দিল না। একটু পরে কহিল—বিদ্যাবুদ্ধি থাকলে বলবো না ?

—বলবেই ত, কিন্তু সেটা আমাকে কেন ?

চন্দনা লক্ষ্য করিয়াছিল মানবেন্দ্র অকস্মাৎ তাহাকে তুমি সম্বোধন করিতেছে, এবং মনে মনে একটু পুলকিত হইয়াই সে কহিল—যে আস্‌বে সকলকেই বল্‌বো।

ক্ষণিক পরে মানবেন্দ্র প্রশ্ন করিল—আপনার বাড়ির সব ভাল?

—হ্যাঁ।

—আপনার স্ত্রী এখানে না তাঁর বাপের বাড়িতে?

—এখানেই। কেন?

—না তাই প্রশ্ন করলুম—তিনি আপনাকে এমন ছেড়ে দেন কেন তাই ভাবি?

—ছেড়ে দেওয়া মানে? আমি ত কারও সম্পত্তি বা পোষাকুকুর নয় যে বগলস্ না খুলে দিলে বেরুতে পারবো না?

মানবেন্দ্র সহাস্যে কহিল—মাপ্ করবেন, বিয়ে করি নি তাই বুঝ্তে পারি না। মনে হয় বুঝি বগলস্ আঁটা কুকুরই। ভাল কথা, মিঃ লাহিড়ীর খবর কি চন্দনা?

—তিনি ত আজকাল আসেন না। যেহেতু আমি তাঁর হুকুম মত তাঁর বইতে অভিনয় করি নি। দেখুন না তাঁর আব্দারটা।

—ডাঃ হাল্দারের মতই আপনিও একটু দেখুন না কেন? বিয়ে করেছেন অথচ পত্নীর সম্পত্তি হতে চান্ না। এ আবার কেমন বিয়ে তা হ'লে?

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ডাঃ হালদার কহিলেন—তিনিও ত আর আমার সম্পত্তি নয়, মানুষ স্বাধীন তার মনোজগতে।

—হায় হায়, মোটেই নয়, ওই জগতেই সে বেশি পরাধীন। যেমন ধরুন আমি চন্দনাকে বিয়ে করতে চাই অথচ উনি চান না, তা হ'লে আমার স্বাধীনতাটা থাক্লো কোথায়? আমি ত স্বাধীনভাবেই ভালবেসে ফেল্লাম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পরাধীন হলাম ওঁর—যেহেতু উনি না ভালবাস্লে আমার উপায় নেই। ভাল যে বাসে সে পরাধীন হবেই, যে স্বাধীনচেতা তার পক্ষে ভালবাসা সম্ভব নয়।

চন্দনা হাসিয়া কহিল—কার প্রতি কটাক্ষের পূর্বাভাষ?

—ডাঃ হালদারের প্রতি অর্থাৎ ওঁর স্বাধীনতা দেখে মনে হয়, উনি স্ত্রীর উপর একটু অত্যাচার ক'রছেন। যাক্ আমি অবান্তর এখানে, অতএব উঠি।

—চা খেলেন না? চন্দনা সচকিতভাবে প্রশ্ন করিল।

মানবেন্দ্র সংক্ষেপে না বলিয়া চলিয়া গেল। নীচে হইতে মানবেন্দ্রের কণ্ঠ শোনা গেল অত্যন্ত সরলভাষায় শোফারকে আদেশ করিতেছে—শোফার,

আমাকে পৌঁছে দিয়ে এসো। মানবেন্দ্রের প্রস্থানে চন্দনা মনে মনে হালদারের প্রতি বিরক্ত হইয়াছিল, তাই অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ডাঃ হালদার কহিলেন—আমি হঠাৎ এসেছি বলে কি দুঃখিত হয়েছেন?

চন্দনা কহিল—দুঃখিত নয় তবে একটা কথা বলতে চাই যদি কিছু মনে না করেন।

—বলুন, মনে করবার কি আছে?

চন্দনা মানবেন্দ্রের আকস্মিক প্রস্থানে যেন আহত হইয়াছিল তাই উত্তেজিত-ভাবে মনের কথাটা আর গোপন রাখিতে পারিল না। বলিল—আপনি আসেন, এটা অবশ্য আমার পক্ষে গৌরবের সন্দেহ নেই। আমরা সমাজে অপাংক্তেয়—আমাদের সাহচর্যও খুব সম্মানকর নয় আপনাদের কাছে।

হালদার তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ প্রক্ষেপ করিলেন—না না, মানুষ মানুষই। তার জাতিভেদ হয় মনের ঐশ্বর্য দিয়ে—জন্মের অবস্থা নিয়ে নয়।

—বাজে কথা। বইতে লিখে ফেলা সোজা, কিন্তু সমাজে স্থান তাদের থাকে না। তাই বলছিলুম, আপনার দিক থেকে আমাদের কাছে আসা আপনার উচিত নয়। আপনার ছাত্র, আত্মীয়-পরিজন সেটা ভাল চোখে নাও দেখতে পারেন। উনি যে বললেন—আপনার পত্নীর কথা, তিনিও হয় ত মনে দুঃখ পান।

—যদি কেউ নিজের মনের দোষে দুঃখ পায় তবে সেটার জন্যে কি আমি দায়ী?

—আপনিও ত আপনার মনের জন্যে দুঃখ পাচ্ছেন—স্ত্রী-পুত্র থাকতে আমাদের মত লোকের কাছে বসে অসম্মান আহরণ করছেন।

হালদার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—আপনার কি সে ইচ্ছা নয়?

—সত্যিই নয়। আমি যদি স্বার্থপর হতাম এবং কেবল নিজের আনন্দকেই চরম বলে মনে করতাম তবে একথা বলবার সৎসাহস আমার হ'ত না; কিন্তু আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী এবং আপনার অসম্মানে দুঃখ পাই, সেই জন্যই বলছি। আপনার জন্যেই আপনাকে অসম্মান করছি।

হালদার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—শরৎচন্দ্র এক জায়গায় বলেছেন, বড় প্রেম শুধু কাছেই আনে না তা দূরেও ঠেলে ফেলে। ব্যাপারটা তেমনি নয়?

চন্দনা কি যেন ভাবিয়া কহিল—অনেকটা তেমনি।

—ও কথাটা অর্থহীন। যা বড় প্রেম তা আনন্দময়, তার মধ্যে কণ্টক নেই। আচ্ছা আমি উঠি, কিছু মনে করবেন না।

—কিন্তু, আমার কোন অপরাধ নেবেন না বলুন?

—না না।

হালদার হাসিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু কণ্ঠের মধ্যে যেন সেটা থামিয়া কেমন একটা বিকট কান্নার মত শুনাইল। তিনি তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিলেন।

*

রাস্তায় আসিয়া হালদার দেখিলেন, পথ চলা যায় না। চোখ দুইটি জলে ঝাপ্সা হইয়া আসিয়াছে, পথ চলা সম্ভব নয়। একটা নিস্ফল ক্রোধে ও ক্ষোভে তাঁহার অন্তর উত্তেজিত হইয়া উঠিল—যে অসম্মানকে তিনি ডাকিয়া আনিয়াছেন তাহার ফলাফলকে স্বচ্ছন্দ মনে গ্রহণ করিবার মত অবস্থা আর রহিল না। নিজের অক্ষমতা ও অসম্মানকে অন্তরের উত্তাপে ক্রমেই বাড়াইয়া তুলিতে তুলিতে যখন বাড়িতে ফিরিলেন তখন রাত্রি হয় নাই—মাত্র ন'টা! হালদার-পত্নী রান্না করিতেছিলেন, এবং চাকরটি দরজার পাশে বসিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ শিশুটিকে ঘুম পাড়াইতেছিল এবং কি একটা লইয়া গল্প করিতেছিল। হালদার নিঃশব্দে উপরে উঠিয়া গেলেন। উপরে উঠিয়া একটা বই পড়িতেছিলেন; কিন্তু মনটা বার বার বিমনা হইয়া রান্নাঘরের দরজায় ঘুরিয়া মরিতেছিল।

মনে মনে চন্দনার কথাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেন, সত্যই ত তাহার কোন দোষ নাই, তাহাকে যদি সে ভাল না বাসে তবে তাহাকে কেমন করিয়া দোষ দেওয়া যায়—মনে মনে সান্ত্বনা দিলেন কিন্তু নিজের দৈন্য প্রকাশ পাইয়া তাঁহাকে বার বারই উত্তেজিত করিয়া তুলিল।...তারপরে হঠাৎ ভাবিতে আরম্ভ করিলেন—তাঁহার স্ত্রী ত এমনি করিয়া কখনও তাঁহার সহিত গল্প করেন নাই, তবে ঐ চাকরটির সহিত অমনি গল্প তিনি নিত্য কেন করেন? মনে মনে একটা সন্দেহ তাঁহাকে আরও উত্তেজিত করিল।

নিঃশব্দে আহারান্তে হালদার উপরে উঠিয়া আসিলেন। হালদারপত্নী স্বামীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—আজ কি হ'য়েছে তোমার, অত গম্ভীর কেন?

—গম্ভীর? কই না।

—হ্যাঁ, একটাও কথা ব'ল্‌লে না। ভাত না খেয়েই উঠে এলে।

—না খিদে নেই, তাই।

—কোথায় খেয়ে এসেছ? চন্দনার বাড়িতে?

—হ্যাঁ খেয়েছি বটে কিন্তু সেটা খিদে না থাকার মত নয়। আচ্ছা তোমাকে একটা কথা বল্‌বো?

—বলো।

—তুমি চন্দনার ওখানে যাওয়াটায় এমন প্রতিবাদ কর কেন?

—তোমার সেখানে যাওয়াটা কি উচিত? তোমার ছাত্রেরা যদি তাই শোনে তবে তারা কি মনে ভাব্‌বে, ভেবে ছাখো ত।

হালদার সংক্ষেপে কহিলেন—'হুঁ', তারপর একটু দেরি করিয়া কহিলেন—তোমার এমন সন্দেহ হয় কেন? এই ত তুমি আজ চাকরটার সঙ্গে গল্প ক'রছিলে, আমার সঙ্গেও ত কোনদিন অমনি আগ্রহ নিয়ে তুমি গল্প কর নি। আমি যদি এক্ষেত্রে কিছু মনে করি তবে কি তোমার কোন উত্তর আছে?

—তোমার মনটা এমন কেন? ছিঃ!

—ওটা ত আমাকে গালাগালি করা হ'ল, আমার কথার জবাব হ'ল না।

—তুমি কি সত্যিই এমনি সন্দেহ কর?

হালদার একটু থামিয়া কহিলেন—হ্যাঁ।

—তবে আমায় নিয়ে ঘর করতে তোমার ঘেন্না করে না?

—না, ঘেন্নার কি আছে, তোমার স্বাধীনতায় আমার বাধা দেওয়ার শক্তি কোথায়?

হালদারপত্নী কাঠের পুতুলের মত ক্ষণিক দাঁড়াইয়া থাকিয়া হালদারের পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন—তুমি কি সত্যই বিশ্বাস করো, না কেবল আমাকে যাতনা দেওয়াই তোমার ইচ্ছা? যদি বিশ্বাসই করো তবে আমাকে ত্যাগ করো না কেন?

হালদারের মনটা উত্তেজিত হইয়াই ছিল—আঘাতটা যাহাকে হয় ফিরাইয়া দিবার জন্য মনটা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল—তিনি তাই ব্যঙ্গ করিলেন—তুমি আমায় ত্যাগ ক'রবে এই অপেক্ষায় আছি—আমার ত্যাগ করার প্রশ্ন তাই ওঠে না।

হালদারপত্নী অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে কহিলেন—একবার স্পষ্ট করে বলো, তুমি আমায় অবিশ্বাস করো। তারপর আমি আমার যা করণীয় ক'রবো—এমনি ক'রে আমায় আর লাঞ্ছনা ক'রো না। বলো, সত্যি ক'রে বলো।

হালদার অত্যন্ত কঠিন কণ্ঠে কহিলেন—বিশ্বাস না ক'রলে লাঞ্ছনা ক'রবো কেন?

হালদারপত্নী পদপ্রান্তে বসিয়া ক্ষণিক চোখের জল ফেলিলেন। হালদার মনে মনে একটা আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন—তাঁহারই পদপ্রান্তে বসিয়া একটি রমণী এমন করিয়া চোখের জল ফেলিতেছে এটা যেন তাঁহার কাছে বড়ই আনন্দদায়ক বলিয়া বোধ হইতেছিল। হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন—তোমাদের সবচেয়ে এই বড় অস্ত্রটি অত্যন্ত সুলভ হওয়ায় তোমরাই জয়ী। যত দোষ, যত কলঙ্ক সবই দু'ফোঁটা চোখের জলে ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে ফেল্‌তে পারো।

হালদারপত্নী উঠিয়া দাঁড়াইয়া চোখের জল মুছিয়া কহিলেন—ভগবান তোমার মত মানুষের হাতে আমাকে কেন ফেললেন জানি না। তোমার মত কুৎসিতমনা লোকের সঙ্গে ঘর ক'রতে সত্যিই আমার লজ্জা করে। আমি কালই চলে যাবো। ইচ্ছা করলে তুমি নতুন ক'রে সতীবউ এনে সুখী হ'তে পারো। আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। তবে যদি ভগবান থাকেন, আর আমি যদি মনেপ্রাণে সতী হ'য়ে থাকি তবে একদিন এমনি ক'রে কেঁদে তোমাকে ফিরিয়ে আন্‌তে হবে।

হালদারপত্নী উৎসারিত অশ্রু গোপন করিতে চোখে আঁচল চাপিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

হালদার পরম আনন্দে একটা সিগারেট ধরাইয়া মনে মনে একটা অনাবিল পরিতৃপ্তি বোধ করিতে লাগিলেন।

পরদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া হালদার দেখিলেন গৃহ শূন্য। চাকরটি বাজার হইতে কিছু খাবার আনিয়া টেবিলে রাখিয়া দিয়াছে এবং তাঁহার আগমনে নিঃশব্দে চা করিতে রান্নাঘরে প্রবেশ করিল।

হালদার কিছু মনে করিলেন না, বরং যেন এই শূন্যতার মাঝে একটা

স্বাধীনতা পাইয়া সুখী হইলেন। চাকর চা দিতে আসিলে প্রশ্ন করিলেন—ওরা কখন্ গেল?

—দুপুরে।

—কে নিয়ে গেল?

—মামাবাবু এসেছিল।

—বেশ।

চাকরটা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া যাইতেছিল। তিনি বলিলেন—শোন, বাজার ক'রে এনে রান্না করবি, পারবি ত?

চাকরটা কহিল—পারবো; কিন্তু মা চলে গেলেন—

—তাতে তোর কিরে ব্যাটা! গেছে গেছে—ভাল ভাল জিনিস কিনে এনে রেঁধে খাবি, এমন কষ্টসাধ্য কাজটা পারবি না? বাজারের সবচেয়ে পছন্দসই মাছ আর তরকারি নিয়ে আয়।

*

ডাঃ সেন কাপড় জামা পরিয়া বাহির হইতেছিলেন। সন্ধ্যা হইবার কিছু বাকি আছে তবে মেঘলা হইয়া ঘরে অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল। পত্নী [illegible] পাশে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, ডাঃ সেন সযত্নে মাথার চুল আঁচড়াইলেন, চাদরটাকে তিনবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পরিলেন। জুতাজোড়া পায়ে দিয়াও একবার বুরুশ করিলেন। বাহির হইবেন এমনি সময়ে পত্নী আসিয়া কহিলেন—এখন কোথায় যাবে?

—যেখানে যেয়ে থাকি।

—না। নিশ্চয়ই অন্য কোথাও যাবে, নইলে এত সাজগোজ কেন?

—সাজগোজ আবার কোথায় দেখলে? তবে কি একটা উজবুকের মত যেতে বল?

—আজ বাড়িতেই থাকো না। ছেলেপুলেগুলোর কাণ্ডখানা দেখ, মাস্টারে কি ক'রবে?

কি জানি কেন ডাঃ সেনের মনটা ভাল ছিল না, তিনি কহিলেন—বাড়িতে থেকে তোমার পুত্র কন্যার কিচির-মিচির আর তোমার আলু পটলের হিসাব না শুনলেই কি নয়? দু'টো ভাল কথা আলোচনা ক'রলে তোমার ক্ষতি কি?

সেনপত্নী আশ্চর্য হইলেন, এমন স্পষ্ট উত্তর তিনি কখনও শোনেন নাই। তিনি ক্ষণিক দেরি করিয়া কহিলেন—ছেলেপুলে কি কেবল আমারই, আর আলু পটল কেবল আমারই লাগে?

—আমারও লাগে, কিন্তু সারাদিন পরিশ্রম ক'রে একটু বিশ্রাম ক'রলে তোমার ক্ষতি কি?

—না হয়, নেচে গেয়ে ইংরিজি বলে তোমার মনের মত কাজ ক'রতে পারি না, তাই বলে এমন করা—

ডাঃ সেন সংক্ষেপে কহিলেন—আমি যদি অন্য মেয়ের সঙ্গে ইয়ার্কি দিতেই যাই এই সন্দেহ তোমার হয়, তবে আমার সঙ্গে যেতে পারো। আর ঝগড়াটা এখনকার মত স্থগিত থাক্, রাত্রে যখন রীতিমত পরিশ্রান্ত হ'য়ে ফিরবো সেই সময়ে ক'রলেই ভাল হয়। জমবে ভাল।

ডাঃ সেন আর কোনও কথা না বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। মিস্ বসুর সহিত ঠিক ছিল তাঁহারা আজ একসঙ্গে আদিত্যবাবুর আড্ডায় যাইবেন।

মিস্ বসু প্রস্তুত ছিলেন। ডাঃ সেনের আগমনে একটু চা'র বন্দোবস্ত করিয়া কহিলেন—একটু চা খেয়েই বেরোনো যাক্, কেমন?

সেন সংক্ষেপে কহিলেন—সেই ভাল।

চা-পান নিঃশব্দেই হইতেছিল। মিস্ বসু কহিলেন—আজ আপনাকে বড় বিমনা দেখা যাচ্ছে। গৃহবিবাদ নাকি?

ডাঃ সেন কহিলেন—আর পারি না, অবুঝ পত্নী আর অপগণ্ড ছেলেপুলেরা মিলে জীবন্ত কবর দেবার চেষ্টায় আছে। তাই পালিয়ে এলাম।

মিস্ বসু ব্যঙ্গ করিলেন—বিবাহিত লোকেদের মুখে এই জাতীয় নালিশ শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হ'য়ে গেল, কিন্তু আমার হাসি পায়। যে স্ত্রীর চতুষ্পার্শ্বে কলুর বলদের মত ঘুরে ঘুরে জীবন সাঙ্গ করা ছাড়া উপায় নেই, সেই সম্বন্ধে এ কথাটা যেন কেমন দেখায়। তারাই যেন আপনাদের সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কেড়ে নিয়েছে আর আপনারা তাদের সুখে রেখে দিয়েছেন।

—এটা ঝগড়ার জিনিস নয়। প্রত্যক্ষ না 'বলে বোঝানো যায় না এসব জিনিস। আপনার এখানে কেন ছুটে আসি জানেন? কারণ, তার মানসিক প্রয়োজন ও আমার মানসিক প্রয়োজন এক নয়। আপনার এখানে এসে যেন একটা মানসিক সাথী পাই।'

মিস্ বসু হাসিয়া কহিলেন—তা ত বুঝলুম কিন্তু আপনি হিন্দু আদর্শকে এত উঁচু মনে করেন, বর্তমান শিক্ষাকে এত গালাগালি করেন অথচ গৃহে যেটুকু পান না সেইটুকু পেতে আসেন এখানে।

—বর্তমান শিক্ষাকে গালাগালি ক'রেছি; কিন্তু শিক্ষাকে গালাগালি করি নি। হিন্দু আদর্শ কি কিছু শিক্ষা দেয় না? তবে মানুষ স্ত্রী ছাড়া আরো অনেক কিছু চায়—তাই পূর্ণ ক'রতে সে সমাজ ও বন্ধু খুঁজে বেড়ায়।

মিস্ বসু চা'র কাপে শেষ চুমুক দিয়া কহিলেন—তবে ওঠা যাক্ চলুন।

*

দুইজনে যখন ট্রামস্ট্যাণ্ডে দাঁড়াইয়া ট্রামের অপেক্ষা করিতেছিলেন তখন ডাঃ সেন অকস্মাৎ লক্ষ্য করিলেন যে সে রাত্রিটা বেশ জ্যোৎস্নাময়। জ্যোৎস্না এত প্রখর যে গ্যাসের আলোককেও খানিকটা নিষ্প্রভ দেখাইতেছে। মনের মধ্যে একটা আকস্মিক আনন্দ অনুভব করিয়া কহিলেন—মিস্ বসু, ক'লকাতা শহরে জ্যোৎস্না আর অন্ধকার বুঝবার উপায় নেই! কেমন সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে দেখেছেন?

মিস্ বসু আকাশের দিকে চাহিয়া চাঁদটিকে প্রত্যক্ষ করিয়া কহিলেন—সত্যই ত!

বসুর মুখশ্রী সুন্দর নয়, তবু ত এই জ্যোৎস্নায় যেন তাহা ডাঃ সেনের কাছে সত্যই সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। মিস্ বসুর দেহকে একটু স্পর্শ করিবার দুর্দমনীয় প্রলোভন তাঁহাকে পাইয়া বসিল।

ট্রাম আসিয়া থামিল। প্রয়োজন ছিল না তবুও ডাঃ সেন মিস্ বসুর হাত ধরিয়া টানিয়া কহিলেন—আসুন।

মিস বসু ডাঃ সেনের সঙ্গে এক বেঞ্চে বসিলেন, মিস বসুর সান্নিধ্য যেন তাঁহাকে আজ রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিল। নিজের গৃহের মাঝে বন্ধুরূপে মিস বসুকে কল্পনা করিয়া যেন একবার আনন্দ পাইলেন, তাহার পর তাঁহার হাতখানাকে নিজের হাতের মধ্যে লইয়া কহিলেন—বর্তমান শিক্ষা আর কিছু করুক আর নাই করুক একটা জিনিস করেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মিস বসু হাতখানায় ডাঃ সেনের উষ্ণ স্পর্শ পাইয়াও আপত্তি করিলেন না, স্মিতহাস্যে কহিলেন—সেটা কি?

রুচি ও সৌন্দর্যবোধকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

—হঠাৎ একথা মনে হ'ল কেন?

—কেন? এ প্রশ্ন অবশ্য আপনি করতে পারেন কিন্তু উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে যেন সম্ভব নয়।

এদিক ওদিক একটু চাহিয়া নিম্নকণ্ঠে কহিলেন—নইলে আপনার সঙ্গে আলাপের মোহ এমনভাবে পেয়ে বসবে কেন?

—ও সেই জন্যে! মিস্ বসু অনিচ্ছার সঙ্গে হাসিলেন। ডাঃ সেন মিস্ বসুকে লইয়া ট্রাম হইতে নামিলেন এবং একটু আগ্রহের সঙ্গেই কহিলেন—একটা রিক্‌সা ডাকি।

—না থাক্ হেঁটেই যাই।

ডাঃ সেন মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন তবুও মিস্ বসুর সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। মিস্ বসু বলিলেন—ট্রামে বাসে চ'ল্‌তে একটা ব্যবহার লক্ষ্য করি। কোন মেয়ে ট্রামে বাসে উঠলে সকলে বার বার সেইদিকেই চায়। এটা বড় পীড়াদায়ক।

ডাঃ সেন প্রতিবাদ করিলেন—কই না, আজ অন্তত তেমন কিছু লক্ষ্য করি নি।

—আপনারা এটা লক্ষ্য করেন না।

*

মিস্ বসু ও ডাঃ সেন যখন আদিত্যবাবুর আড্ডায় উপস্থিত হইলেন তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং আজ যেন হঠাৎ লোক সমাগমও একটু বেশি হইয়াছে। অক্ষয়বাবু দেশনেতা, তিনিও আসিয়াছেন, তাহা ছাড়া লাহিড়ী কিছুকাল অনুপস্থিত থাকিবার পর আজ উপস্থিত হইয়াছেন এবং আশ্চর্য এই যে চন্দনার আগমনের অনেক পরে তিনি আসিয়াছেন। একটা উত্তেজিত আলোচনা চলিয়া হঠাৎ যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে এমনি একটা অস্বস্তিকরভাবে ঘরটা নিস্তব্ধ। সভার একপ্রান্তে বসিয়া মানবেন্দ্র নিবিষ্ট মনে কাগজ পড়িতেছে। চন্দনা লাহিড়ী হইতে বহু দূরে এবং মানবেন্দ্রের সন্নিকটে বসিয়াছে! ডাঃ সেন মিস্ বসুকে পাশের খালি চেয়ারটা দেখাইয়া বলিলেন—বসুন; কিন্তু মিস্ বসু মানবেন্দ্রের নিকটে চন্দনার পাশের চেয়ারটায় যাইয়া বসিল।

পুরাতন আলোচনার খেই ধরিয়া অক্ষয়বাবু হঠাৎ উত্তেজিত উচ্চকণ্ঠে কহিলেন—আপনারা দেশের শিক্ষিত লোক, অনেকেই অর্থবান, শক্তি আছে, বুদ্ধি আছে, অর্থ আছে, অথচ আপনারা যদি দেশের কথা না চিন্তা করেন তবে কি হবে? দেশ সকলেরই, সমবেত চেষ্টা ব্যতীত কোন কাজ হ'তে পারে না। আপনারা যদি স্ব-সর্বস্ব হ'য়ে বেঁচে থাকেন মাত্র তবে সে বাঁচার কি মূল্য আছে, এ শিক্ষার কি সার্থকতা আছে? আজ আপনারা যদি কেবলমাত্র বেঁচে থাকবার শিক্ষাই লাভ ক'রে থাকেন তবে সে শিক্ষা কুশিক্ষাই হ'য়েছে ব'লতে হবে।

সভামধ্যে একে অন্যের মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ডাঃ দত্ত কহিলেন—অবশ্যই আমাদের যথাসাধ্য করা উচিত। অর্থ দিয়ে, বিত্ত দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে আমাদের দেশসেবায় নিয়োজিত হওয়া উচিত।

কিন্তু কি ত্যাগ করিতে হইবে, কি দিতে হইবে তাহা না বুঝিয়া সকলেই নির্বাকভাবে বসিয়া রহিলেন। ডাঃ বিশ্বাস যেন একটু বেশি রকম অসহায় বোধ করিতেছিলেন, তিনি কহিলেন—ডাঃ হালদার কি বলেন?

ডাঃ হালদার কি যেন চিন্তা করিতেছিলেন, একটু বিমনাভাবে কহিলেন—দেশের সেবা ব'লতে কি বুঝি না। আমরা কি দেশের সেবা করি না, শিক্ষা দিয়ে ছেলেদের মনে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে দিয়ে? তবে অর্থের প্রাচুর্য যাদের আছে তাদের অর্থ সাহায্য করাই উচিত।

আদিত্যবাবু বলিলেন—কেউই মনে করে না যে তার অর্থের প্রাচুর্য আছে, অতএব সাহায্য কে ক'রবে?

অক্ষয়বাবু কহিলেন—হ্যাঁ, সত্যিই তাই, আকাঙ্ক্ষা ও প্রলোভন আমাদের এত বেড়ে গেছে যে কোন অর্থই আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

ডাঃ দত্তের মনে ডাঃ বিশ্বাসের প্রতি একটা অকারণ বিদ্বেষ ধূমায়িত হইতেছিল এবং তাঁহার প্রতি একটা শ্লেষ নিক্ষেপ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। দরজাটার দিকে তাকাইয়া কহিলেন—মিঃ বিশ্বাস আবার দরজাটা বন্ধ ক'রেছেন। ছিঃ ছিঃ আপনার এ কি বদঅভ্যাস! আপনি আবার মনবিজ্ঞানী!

ডাঃ বিশ্বাস বলিলেন—দরজা খোলা রাখাটাও আপনার একটা মানসিক রোগ সেটা মনে রাখবেন।

—হুঁ, সবই রোগ।

মিঃ ঘোষের ব্যাগের প্রতি আঙুল দিয়া মিঃ বিশ্বাস কহিলেন—ওটা নামিয়ে রাখুন—ওটা দেখলেই ইন্‌সিওরের কথা মনে হয়।

ডাঃ ঘোষ হাসিলেন কিন্তু ব্যাগ নামাইলেন না।

আদিত্যবাবু কহিলেন—দেশরক্ষার্থে এখন—

অক্ষয়বাবু আদিত্যবাবুর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন—হ্যাঁ, সেকথা আপনারা ভেবে দেখুন, কতদূর কতখানি আপনারা ক'রতে পারেন।

ডাঃ হালদার কহিলেন—মানবেন্দ্রবাবু কি বলেন, কি ভাবে দেশের সেবা ক'রতে পারি ?

মিস্ বসু কহিলেন—হ্যাঁ, আপনার মতামতটা আগে শোনা যাক্।

মানবেন্দ্র কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া কহিল—আমার মতামত সর্বদাই অপ্রিয় ও অপ্রীতিকর হয় কাজেই সেটা না শোনাই ভাল।

লাহিড়ী ব্যঙ্গ করিলেন—যা ভাল নয় এমন কাজ আমরা সবাই করি, আর একটা না হয় ক'রলামই এতে আর এমন কি হবে ?

মানবেন্দ্র একটু অর্থব্যঞ্জকভাবে হাসিয়া কহিল—আপনাদের সকলেরই কি এই মত ?

চন্দনা কহিল—হ্যাঁ।

মানবেন্দ্র কহিল—আপনারা দেশের জন্য চিন্তা না ক'রে, নিজের জন্য চিন্তা করুন তা হ'লেই সবচেয়ে বড় দেশ সেবা হবে। দেশের কথা ভেবে ভেবেই দেশকে আপনারা নষ্ট ক'রলেন।

অক্ষয়বাবু প্রতিবাদ করিলেন—বলেন কি ? ব্যক্তিগত স্বার্থকে ত্যাগ না করলে কখনও কি দেশ সেবা করা যায়—ত্যাগই সেবার মূল। সেবার মূলে রয়েছে ত্যাগ।

মানবেন্দ্র কহিল—ত্যাগ আজকার জগতে একটা কথামাত্র, তার দ্বারা কোন কাজই হ'তে পারে না—হয় না।

ডাঃ হালদার কহিলেন—ত্যাগ দ্বারা শত্রুকেও জয় করা যায়—ত্যাগ দ্বারা পাপীকে উদ্ধার করা যায়, চরম স্বার্থপরকে ত্যাগী করে তোলা যায়।

—ওসব মুখস্থ কথা ব'লছেন ইউসুফের কবিতায় যেমন পড়েছেন। যে ত্যাগ ক'রবে সে বোকা বলে গণ্য হবে. যে ভালমানুষ সে আহাম্মক নাম নিয়ে

বিরাজ ক'রবে। সব জিনিসেরই ক্ষেত্র আছে—বর্তমান অবস্থায় ত্যাগটা বোকামী। অর্থাৎ আমাদের দেশের এমন অবস্থা নয় যেখানে ত্যাগটা কার্যকরী হবে—সততা এখনও বোকামী। চরিত্র এখনও ভীরুতা বলে গণ্য—

অক্ষয়বাবু প্রতিবাদ করিলেন—কেন চিত্তরঞ্জন যে ত্যাগ ক'রেছেন তা কি ব্যর্থ হয়েছে? তিনি যে ত্যাগ ক'রেছেন তাতে তিনি চিরস্মরণীয় থাকবেন।

—হ্যাঁ, থাকবেন। জনৈক ভদ্রলোক লাখো লাখো টাকা নিয়ে ব্যবসা করতে নেমে যদি রিক্ত হস্তে বাড়ি ফিরে আসেন তবে তাঁকে যতখানি প্রশংসা করা যায়, তাঁকে তার চেয়ে বেশি প্রশংসা করা যায় না। তিনি অর্থ ও মস্তিষ্কের অপচয় ক'রেছেন মাত্র।

চন্দনা কহিল—এটা কি ব্যবসায় নাকি?

—হ্যাঁ, দেশসেবার ব্যবসায়। চিত্তরঞ্জন লালবাতি জ্বেলেছেন, তবে এমন লোকও আছেন যাঁরা কিছুটা কৃতকার্য হয়েছেন। যেমন, দাম্পত্য বচসার সময় জনৈক দেশসেবক বলেছিলেন তাঁর স্ত্রীকে যে, একবার একটা দুর্ভিক্ষ পেয়ে ক'লকাতায় তিনি জায়গা করেছেন, আর একটা পেলে বাড়িখানা হবে—একে প্রকৃত দেশসেবা আমি বলতে পারি।

হালদার উত্তেজিত ভাবে কহিলেন—চুরিকে আপনি দেশসেবা বলেন?

—হ্যাঁ, অন্যদেশ থেকে চুরি করে দেশকে সমৃদ্ধ করাই দেশসেবা; অর্থাৎ দেশের প্রত্যেক লোক যদি বড়লোক হয় তবেই দেশ বড় হ'ল।

অক্ষয়বাবু কহিলেন—ওটা পাশ্চাত্য আদর্শ কিন্তু প্রাচ্য আদর্শ ত্যাগে।

—সেই জন্যেই প্রাচ্য আজ প্রপীড়িত। রাজার রাজ্যবিজয় লুণ্ঠন নয়, অভিযান তথা দেশসেবা। ছোটখাটো চুরিই ঘৃণ্য; বড়চুরিই দেশসেবা। অতএব আমার উপদেশ আপনারা বড় রকমের চুরি করুন তাতেই প্রকৃত দেশসেবা হবে—যেমন ভাবে চন্দনা ও লাহিড়ী দেশসেবা ক'রচেন, যেমনভাবে অক্ষয়বাবু ক'রতে যাচ্ছেন এবং ডাঃ দত্ত শীগ্‌গিরই ক'রবেন আশা করা যায়।

লাহিড়ী উত্তেজিত ভাবে কহিলেন—আপনি আমাদের এই সুন্দরের পূজাকে চুরি ব'লতে চান—এটা ভদ্রতা বিগর্হিত।

—চুরি শুধু নয়, ওটা ক্লোরোফর্ম করে চুরি। মানুষের দুর্বলতার সুযোগে

ভার পকেট মারা। যেমন বানর নাচ দর্শন রত পথিকের পকেট থেকে ব্যাগ তুলে নেওয়া।

চন্দনা কোন প্রতিবাদ করিল না দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য হইল। সকলে চন্দনার মুখের দিকে তাকাইতেই চন্দনা কহিল—অনেকটা তাই বই কি? নাচ গান দেখিয়ে মানুষের যৌন ব সন বৃত্তিকে প্রবুদ্ধ ক'রেই ত আমরা বড় হই।

লাহিড়ী কহিলেন—একথা তোমার মুখে মানায় না। মানবেন্দ্রবাবুর কথা তাঁরই, আর একজনের মুখে সেটা মানায় না।

—যেমন 'আর্ট শাশ্বত চিরন্তন' এসব কথাও মুখস্থ করা। এটাও সকলের মুখে মানায় না।

মানবেন্দ্র অকস্মাৎ প্রশ্ন করিল—আপনার সেই কেরানী বন্ধু কোথায়? তাঁর খবর কি?

লাহিড়ী বলিলেন—কেন? তাঁর খবর হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রছেন?

—আমি একটা অনুমান ক'রেছিলাম, সেটা কতদূর এগিয়েছে তাই জানতে ইচ্ছে—

আদিত্যবাবু কহিলেন—কি অনুমান?

—তাঁর কোন নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে মিঃ লাহিড়ীর বিয়ে হবে এই আশঙ্কা ক'রেছিলাম।

চন্দনা হাসিয়া কহিল—তাঁর বোনের সঙ্গে ওঁর বিয়ে হ'যে গেছে।

মানবেন্দ্র হাসিয়া উঠিল। অন্যান্য অনেকেই হাসিলেন। মানবেন্দ্র টিপ্পনী করিল—আপনার সে ফিলজফিটার কি হ'ল?—জেনে শুনে এমন পাপকর্মটা ক'রলেন?

মিস্ বসু কহিলেন—ওটা পাপকর্ম হিসেবে করেন নি, তবে ভুলটাকে সংশোধন ক'রেছেন মাত্র।

ডাঃ হালদার কহিলেন—একটা ভুল সংশোধন ক'রতে আর একটা ভুল ক'রেছেন এইমাত্র—চন্দনাও এমনি একটা ভুল হয় ত শীগ্‌গিরই ক'রবে।

মানবেন্দ্র কহিল—না, অমন ভুল চন্দনার চরিত্র বহির্ভূত, ওরা জগৎ চেনে—আর যাই করুক বিয়ে কখনই ক'রবে না, ক'রলেও টিকবে না।

অক্ষয়বাবু বিরক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যাইবার পূর্বে কহিলেন—নমস্কার, আমার কাজ আছে, আমাকে উঠতে হবে। আর দেশসেবা সম্বন্ধে

আপনাদের অভিমত জেনে খুশি হ'লাম—ভবিষ্যতে আর বিরক্ত ক'রবার দরকার হবে না।

মানবেন্দ্র কহিল—একটু দাঁড়ান।

সমবেত সকলের উদ্দেশ্যে সে কহিল—আপনারা দেশ সম্বন্ধে সকলেই আমার মতাবলম্বী একথা বলা যায় না, এক্ষেত্রে অক্ষয়বাবুর দেশের জন্য যে যা পারেন দান অবশ্যই ক'রবেন। কেন, কি জন্য, টাকার প্রয়োজন—তা আপনাদের জানবার কোন ইচ্ছে থাকা উচিত নয়।

অক্ষয়বাবু বলিলেন—কেন নয়, দেশে প্রচার কার্যের জন্য, নানাস্থানে কার্যকরী প্রতিষ্ঠান সংস্থাপনের জন্য সর্বদাই টাকার প্রয়োজন।

ডাঃ দত্ত সহসা কহিলেন—আমি এক হাজার টাকা দেব, কিন্তু চার কিস্তিতে। আপাততঃ আড়াইশ' টাকার এই চেকখানা নিন।

ডাঃ দত্ত চেক লিখিতেছিলেন। চন্দনা কহিল—আমি যৎসামান্য কিছু দেব কিন্তু কত তা এখন ব'লতে পারি নে।

সভাস্থলে অনেকেই চেক দিলেন, একমাত্র লাহিড়ী ও ডাঃ হালদার নীরব রহিলেন। অক্ষয়বাবুর প্রস্থানের পরে মানবেন্দ্র কহিল—আমিও দেশসেবক, আপনারা ইচ্ছে ক'রলে আমাকেও কিছু কিছু দিতে পারেন।

মিঃ লাহিড়ী উষ্মাসহকারে কহিলেন—আপনাকে দেশসেবক বলে বিশ্বাস ক'রবার কোন কারণ নেই।

—আজ্ঞে অক্ষয়বাবুকেও কি ঐ একই কারণে বঞ্চিত ক'রেছেন?

ডাঃ হালদার এতক্ষণ পরে সহসা কহিলেন—মিস্ চন্দনার এই দানে আমি সত্যই আনন্দপ্রকাশ ক'রছি, তার হৃদয় এত মহৎ একথা আমি আগে জানতাম না। আচ্ছা, আমি উঠি, নূতন একটা বই লিখছি, সেজন্য পড়াশুনো ক'রতে হচ্ছে।

মানবেন্দ্র কহিল—বইটা বোধহয় প্রেম ও বিবাহ নিয়ে?

—হ্যাঁ, আমার থিওরিকে আমি প্রতিষ্ঠা ক'রবো।

—আপনি কৃতকার্য হবেন আশা করি।

ডাঃ হালদার চলিয়া গেলেন। মিঃ লাহিড়ীও নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন। মিস্ বসু কহিলেন—মিঃ লাহিড়ী যে বিবাহ ক'রবেন একথা আপনি পূর্বেই জানলেন কি ক'রে?

ডাঃ বিশ্বাস বলিলেন—মনস্তত্ত্ব বিচার ক'রে। মানুষ নিজে যদি খাঁটি মন নিয়ে বিচার ক'রতে পারে তবে ওটা অনুমান করা কঠিন নয়।

ডাঃ সেন প্রশ্ন করিলেন—খাঁটি মন ব'লতে কি বুঝেন?

—খাঁটি মন ব'লতে, যার মনে কোন কমপ্লেক্স নেই। যেমন বাড়িতে যদি কেউ স্ত্রীর দ্বারা নিষ্পিষ্ট হন, তবে বাইরে সর্বদাই তিনি অন্য মেয়েকে নিষ্পিষ্ট করতে চাইবেন, অথবা নিজে খুব খুশি এই কথা প্রচার ক'রবেন এবং অন্য মেয়ের সঙ্গে flirt ক'রবেন। কাজেই তাঁর কাছে খাঁটি বিচার পাওয়া যাবে না।

ডাঃ সেন কহিলেন—অর্থাৎ আমাদের মন তথা বিচার নির্ভর করে অন্যের ব্যবহারের উপর।

—হ্যাঁ, পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর ও মনের গঠন প্রণালীর উপর।

মানবেন্দ্র কহিল—অর্থাৎ আপনার বর্তমান শিক্ষাকে নিন্দা করার যেমন কারণ আছে, তেমনি ডাঃ দত্তের দেশসেবায় দানেরও হেতু আছে, এবং লাহিড়ী ও হালদারের না দেওয়ারও কারণ আছে। কারণ বিনা কার্য হয় না।

মিস্ বসু কহিলেন—এ কারণকে দূর করা যায় না?

—না, সে কারণ চিরন্তন তাই মানুষের সঙ্গে মানুষের সংঘাতও চিরন্তন। লাহিড়ী ও হালদার তাই সভায় টিক্‌লেন না। ডাঃ সেন টিক্‌লেন এবং চন্দনাও টিক্‌লেন আর আমি বটবৃক্ষ বসে আছিই। মিস্টার ঘোষও টিকে আছেন।

আদিত্যবাবু কহিলেন—আর আমি?

—আপনি ত থাকবেনই। যেহেতু আপনিই এই চিড়িয়াখানার মালিক। যদিও জগতটাই বিশাল এক চিড়িয়াখানা, সেখানে খুনোখুনি ভালবাসাবাসি যে সবই একসঙ্গে চ'লছে—তার জন্যে পরিতাপ ক'রে লাভ নেই।

মিস বসু বলিলেন—তবে ডাঃ হালদার ত সত্যি কথাই বলেছেন।

—হ্যাঁ লাহিড়ীর মত তাঁর কথাও সত্যি, তবে ক্ষেত্র বিশেষে। পার্থক্য এই, লাহিড়ী বিশ্বাসটা ছেড়ে দিয়েছেন তাই বেঁচে গেছেন—অর্থাৎ সুবিধাবাদী হ'য়ে বেঁচে থাকবেন কিন্তু হালদার একটা ভয়াবহ অনর্থ ঘটিয়ে দুঃখ দেবেন এবং পাবেন। সেই জন্যেই বলি আত্মসেবাই দেশসেবা।

তপন কলেজ হইতে ফিরিয়া নিজের ঘরে বসিয়া চিন্তা করিতেছিল। চিন্তার বিষয়বস্তু ছিল রেণুকা ও মণিকার প্রসঙ্গ। সেদিন দুইজনের সহিতই কলেজে নানারূপ কথা হইয়াছিল তাহার পরে সকলে মিলিয়া রেণুকার বাড়িতে গিয়াছিল —সেখানে চা প্রভৃতি সহযোগে নানা কথাই হইয়াছে। তাহার মধ্যে দুর্বোধ্য কয়েকটি কথার ইঙ্গিত সে মনে মনে বিচার করিতেছিল।

মোক্ষদা চা দিতে আসিয়া কহিল—দাদাবাবু কখন্ এসেছেন, একটু ডাকও ত দিতে পারেন নইলে আমি বুঝবো কি ক'রে ?

মোক্ষদার ক্ষুদ্র দেহখানার মাঝে কি যেন একটা অপূর্ব মাদকতা আছে। তাহার চলন ছন্দের মাঝে এমন একটা সৌন্দর্য আছে যাহা তপনের অন্তরকে আকৃষ্ট করে, কাজেই তপনের ব্যবহার অনেক সময়েই প্রভু-দাসীর সম্পর্কের দূরত্ব রক্ষা করে না, বরং পরিহাস ও ব্যঙ্গে নৈকট্য জন্মাইয়া দেয়।

তপন মোক্ষদার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল—কেন ? আমি কখন্ আসি সেজন্যে না হয় একটু কান পেতেই রইলে, তাতেই বা ক্ষতি কি ?

মোক্ষদা দেখিতে ক্ষুদ্র ও অল্পবয়সী হইলেও বয়স পঁচিশ পার হইয়াছিল ; সে জগতের অনেক কিছুই জানিত, তাই বলিল—আপনি হুকুম ক'রলেই কান পেতে থাকতে পারি। না হয় অন্য কাজগুলো পরেই ক'রবো।

—হুকুমের অপেক্ষা না ক'রেও ত কান পাততে পারতে—এমন দুষ্কর্ম জীবনে না করেছ এমন ত নয়।

মোক্ষদা একটু হাসিয়া ব্রীড়াভঙ্গি সহযোগে কহিল—আমরা কান পাতলে আর কি হবে দাদাবাবু, বৌদিকে তাড়াতাড়ি আনুন, তিনি কান পেতে সারাদিন থাকবেন।

—তাতে আর তোমার লাভটা কি হবে ?

—লোকসানই বা কি ? আপনার বকুনি অনেকখানি এড়ানো যাবে।

—ও, আমি তাহ'লে কেবল বকাবকিই করি—কেমন ?

—তা কেন ? মেজাজটা অনেক ভাল হবে, তাই ব'লছি।

তপন চা'র বাটীতে চুমুক দিয়া কহিল—তুমি চা তৈরি করেছ ? বেশ হয়েছে।

—আমি ত করি নি, সারদা করেছে।

— তবে ত খারাপ হয়েছে।

মোক্ষদা হি হি করিয়া হাসিয়া কহিল—মানুষ বুঝে চা'র স্বাদ হয় বুঝি?

—হয় বৈ কি? যেমন তোমার তথাকথিত বৌদি করলেই অমৃত তুল্য হবে।

—কবেই সেই অমৃত খাবে! মোক্ষদা আনন্দে পিছন ফিরিয়া কয়েকবার চাহিয়া চলিয়া গেল।

তপন ভাবিতে লাগিল—মণিকা বিবাহ সম্বন্ধে এরূপ একটা কথা কহিল কেন? কথাটা অনাবশ্যক—বিয়ে করে পাগলে, খাঁটি মানুষ বিয়ে ক'রতে পারে না। যতদূর পুস্তকে পড়া যায় তাতে মেয়েদের বিবাহবিতৃষ্ণাটা খুব স্বাভাবিক নয়, অতএব মণিকার এমনি মতবাদের পিছনে কোন নৈরাশ্য আছে কি? থাকাটা আজকালকার জগতে খুব অসম্ভব নয়। তাহার মত আরও অনেকের সঙ্গেই তাহার পরিচয় আছে, তাহার মধ্যে একজনকে ভালবাসিয়া ফেলা একটা আশ্চর্য কিছু নয়। অথবা—

রেণুকা একটা কথা বলিয়াছিল—বিবাহ যদি করিতেই হয় তবে লোক বাছিয়া কি হইবে? পুরুষমানুষ সবই এক, যাহাকে হয় বিবাহ করিয়া ফেলি-লেই হইল। যাহাকে সামনে পাওয়া যাইবে তাহার গলেই বরমাল্য দেওয়া যাইতে পারে। তপন টিপ্পনী করিয়াছিল, সে শুভদিন জানা কুলে আমাদের মত অভাগ্য দু'চার জন হাজির থাকতে পারে। রেণুকা পরিহাস করিয়াছিল—আপনার মত পুরুষসিংহ উচ্চ পুচ্ছ হ'য়ে পালিয়েই যাবে। রেণুকার এই পরিহাসের মাঝে একটা যেন ইঙ্গিত রহিয়া গিয়াছে, বিবাহটাকে সে যেন জীবনের কোন রকম ঘটনা বলিয়া মনে করে না, অথবা এতখানি আত্মপ্রত্যয় তাহার আছে যে, যে কোনও পুরুষ মানুষকেই সে নিজের মত করিয়া গড়িয়া নিতে পারে।

রেণুকা যেন শতবাহু দিয়া তাহাকে আকর্ষণ করে, তাহার কথা, তাহার অবাধ পদক্ষেপ, তাহার স্বচ্ছন্দগতি তাহাকে মুগ্ধ করে—চোখে স্বপ্নের প্রলেপ বুলাইয়া দেয়—তপন ভাবে—মোক্ষদার দেহখানা মণিকার মতই লঘু, লঘু পক্ষ মেলিয়া প্রজাপতির মত নাচিয়া ফিরে।

তপনের মা অকস্মাৎ আজ অসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চেয়ারে বসিয়া কহিলেন—তপন, আমার মনে হয় বেশিদিন আর বাঁচবো না।

তপন অভিমানের সহিত কহিল—অন্তত তার সঙ্গত কোন কারণ নেই। তুমি যে অত্যাচার কর, তাতে যে বেঁচে আছ এই আশ্চর্য। আত্মহত্যায় পাপ যদি থাকে তা তোমার হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

—যত্ন ক'রলেই যদি মানুষ বেঁচে থাকতো, তবে বড়লোক রাজাবাদশারা ম'রতো না—সে যাক্‌গে—তুই যদি মত করিস্‌ আমি তোর জন্যে মেয়ে দেখি।

—আমার বিয়ে দেবে? কেনো?

—কেনো আবার কি! বয়েস হ'য়েছে, বিয়ে দেব তার আবার কারণ থাক্‌বে কি? তুই ছাড়া আর ত দশটা ছেলে নেই যে বিয়ে না ক'রলেও চলে।

তপন গম্ভীরভাবে কহিল—হ্যাঁ, বুঝেছি। তা কবে দেবে?

মা হাসিয়া বলিলেন—মেয়ে ঠিক হ'ল না তার কবে? মেয়ে দেখি, পছন্দ করি।

—আমার যখন বয়স হ'য়েছে তখন তোমাদের পছন্দ করা মেয়ে বিয়ে ক'রবো কেন? আমারও ত পছন্দ আছে।

—বেশ, তোর পছন্দ মত মেয়েই বিয়ে কর। তবুও তার কুলশীল ত দেখা দরকার।

মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া হাসিয়া সে কহিল—বেশ, তোমার চিন্তার কোন দরকার নেই, শরীরও খারাপ, মেয়ে খোঁজাখুঁজি বড় পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার। আমিই কাল থেকে খুঁজতে আরম্ভ করি, গোটাকয়েক জোগাড় ক'রে নিয়ে আসবো একদিন।

মা হাসিয়া কহিলেন—ওই তো তোর দোষ, কথা ব'ললেই কেবল ফক্কুড়ি ক'রবি।

—তুমি বিশ্বাস করো না, তার আমি কি ক'রবো। মা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

মোক্ষদা ঘরে আসিয়াছিল, কথার শেষ অংশের কিছুটা তাহার কানে গিয়াছিল। মায়ের প্রস্থানের পরে মোক্ষদা সহাস্যে কহিল—তা হলে কবে বৌদি আন্‌ছেন?

তপন কোন জবাব দিল না। মোক্ষদার দেহখানাকে স্পর্শ করবার একটা

দুর্দমনীয় লোভ তপনকে পাইয়া বসিয়াছিল। সে ডাকিল, শোনো, এদিকে শোনো—মোক্ষদা নিকটে আসিলে তাহার একখানা হাত ধরিয়া নিজের মাথার উপরে রাখিয়া কহিল—গ্যাখো ত, চুল পেকে গেছে নাকি? যা নইলে এত ব্যস্ত হ'ল কেন?

মোক্ষদা তপনের চুল সস্নেহে সমান করিয়া দিতে দিতে কহিল—সবই ত পেকে গেছে, আর দেরি ক'রলে ত বিয়ে হবে না।

তপন চোখ বুজিয়া মোক্ষদার স্নেহস্পর্শটুকু অনুভব করিতেছিল, মায়ের কল্যাণ স্পর্শের মত মধুর সুন্দর, মণিকার আকাঙ্ক্ষিত স্পর্শের মত মোহময়। একটু পরে সে একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল—তবে আর বিয়ে হ'ল না।

মোক্ষদা কহিল—বছরখানেক দেরি ক'রলে আর হবেই না।

—হুঁ, তবে কালই একটা বিয়ে ক'রতে হবে।

—সর্বনাশ, কাল কেন? একটু দেখে শুনে।

—না, কালই সকালে বেরিয়ে যাকে পছন্দ হয় বিয়ে ক'রে আনবো।

মোক্ষদা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। তপন তবুও চাহিয়া চাহিয়া দেখিল—তাহার গমনভঙ্গী সুন্দর। বিপরীত দিক হইতে সারদা আসিতেছিল, তাহার প্রকাণ্ড শরীরটা দেখিলেই যেন তপনের মাথায় বিপর্যয় ঘটে—সে মনে মনে কহিল—হাঁটছে যেন ভূমিকম্প হচ্ছে।

*

মানবেন্দ্র সকালে বসিয়াছিল—অতি অকস্মাৎ মিস্ বসু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মানবেন্দ্র বিস্মিত হইয়াছিল, সে কহিল—বসুন বসুন, কি সৌভাগ্য?

মিস্ বসু বসিয়া কহিলেন—কি? সৌভাগ্য কেন?

—আপনি এমন অকস্মাৎ আমার মত পরাশ্রিত জীবের নিকটে উপস্থিত হবেন এটা যে পরম সৌভাগ্য।

মিস্ বসু হাসিয়া বলিলেন—এ সকল কথা কি আপনার মুখে মানায়?

—কেন? বেমানান হ'চ্ছে? যাক্, হঠাৎ এলেন কেন?

—কেন? আসতে নেই?

—এমন কথা ত বলি নি। হঠাৎ কেন এলেন এইটেই প্রশ্ন।

—অর্থাৎ নোটিশ দিয়ে আসতে হবে। নোটিশ না দিলেই ত সেটা হঠাৎ হবে।

মানবেন্দ্র কহিল -নোটিশ দেবার কোন প্রয়োজন নেই। যখন খুশি এসে আমাকে ধন্য ক'রবেন।

—আপনার বলা উচিত ছিল, ধন্য হবেন।

—তা হ'লে ধন্য হতে এসেছেন, তাই বলুন। আপনারা মানুষের কাছে আসবেন এ আশা করা যে পাগলামী।

—তবে কোথায় যাবো।

—কেন, আই, সি, এস-রা রয়েছে, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরা রয়েছে—তাদের কাছে।

মিস্ বসু হাসিয়া কহিলেন—কেন? আই, সি, এস হ'লে মানুষ হয় না?

—না, তারা, আই, সি, এস-ই হ'য়ে যায়, মানুষ থাকে না।

—দেবতা হয়?

—আপনাদের কাছে।

মিস্ বসু ক্ষণিক অকারণ হাসিলেন। তাহার পর তাঁহার অসুন্দর মুখের উপর ক্ষুদ্র একখানা উগ্র সুগন্ধি রুমাল বুলাইয়া লইয়া কহিলেন—আপনিই ত অনেকের সম্বন্ধেই অনেক কিছু অনুমান করেন, আমার সম্বন্ধে কি অনুমান ক'রেছেন?

—সকলের সম্বন্ধেই করি এমন নয়, তবে লাহিড়ীর সম্বন্ধে ক'রেছিলাম এটা সত্য।

—আর কারও সম্বন্ধে করেন নি?

—ক'রেছি তবে তা বলি নি। বলা সর্বদা সঙ্গতও নয়।

—আমার সম্বন্ধে কিছুই অনুমান করেন নি?

—এইটুকু ক'রেছি যে আপনার শিক্ষাই আপনার জীবনে বড় বিড়ম্বনা হ'য়ে দেখা দিয়েছে।

মিস্ বসু উপেক্ষার হাসি হাসিয়া কহিলেন—এত থাকতে শিক্ষাই বড় বিড়ম্বনা হ'ল?

—হ্যাঁ, শিক্ষা লাভ না ক'রলে এতদিন যেখানে হয় স্বামী পুত্র কন্যা নিয়ে

বেশ জমে যেতে পারতেন, আর তাই হয় নি বলেই জীবনে যেন বড় অসহায় বলে বোধ করেন।

—অসহায়? আমি স্বাধীন চাকুরিজীবী, আমি অসহায় বোধ করি?

—করেন। সবই আমার অনুমান, ভুল হ'তে পারে। আমার অনুমানই শুনতে চেয়েছেন, আপনি কি তা আমার কাছে না শুনলেও আপনি জানেন।

—আরও কিছু অনুমান ক'রেছেন কি?

—যথেষ্ট। শুনতে চান?

—অবশ্যই চাই। অনুমান শোনাটা এমন কষ্টসাধ্য ব্যাপার ত নয়।

—কষ্টসাধ্য একটু হ'বে। তা হোক, যখন জানতে চাইলেন তখন বলি। জীবনের প্রথমে কলেজে পড়তে পড়তে আই, সি, এস, জীবনদেবতার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ ক'রলেন। স্বপ্নটা ভূতে পাওয়ার মত পেয়ে ব'সলো। সারাটা জীবন খুঁজলেন, কিন্তু আই, সি, এস-এর সংখ্যা বড় কম, দেবতা হ'ল দুর্লভ। হারানো স্পর্শমণি খুঁজতে খুঁজতে জীবনের মধ্যাহ্ন এসে হাজির হল, তার পরে এলো অপরাহ্ন। এখন আশা গেছে, যায় নাই খোঁজার অভ্যাস—ফলে গৃহ পেলেন না, নির্ভর পেলেন না, কাজেই ডাঃ সেনের গৃহকে হিংসা হয়, মনে মনে শিক্ষাকে তিরস্কার করেন।

—তিরস্কার করি?

—হ্যাঁ, তিরস্কার করেন বলেই, ডাঃ সেনের সঙ্গে বাদ প্রতিবাদ করতে হয়। যেন নিজেই শিক্ষার সুফলে বিশ্বাস ক'রতে পারেন না। মনের মাঝে যেমন কুচিন্তা এলে নানা ভাবে নানা অজুহাতে তাকে আমরা ক্ষমা করি, এও ঠিক তেমনি।

—আরও কিছু আছে?

—হ্যাঁ। এখন ইচ্ছে হয়, এ শিক্ষা যদি না থাকতো তবে যাকে হয় বিয়ে ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তেন। শিক্ষাটাই গুরুভার হ'যে জীবনের অন্তরায় হ'য়ে রইল।

—আর?

—আর আজকে আমার এখানে এসেছেন তাই যাচাই ক'রতে যে আমার কাছে তেমনি কোন লোক আছে কিনা?

—এটা কি নিজের সম্বন্ধে ব'লা হ'ল না?

—না, কারণ আপনি দেবতার খোঁজে আসেন নি, এসেছেন একটা নরাধমের খোঁজে, যে ভৃত্য হ'য়ে আপনার সেবা ক'রবে, আপনার অর্থে প্রতিপালিত হবে এবং আপনার বাহন হবে—এবং হ'য়ে নিজেকে ধন্য বলে মনে ক'রবে।

—সকলের সম্বন্ধেই কি এমনি কথা বলা চলে ?

—না, কেবলমাত্র আপনাদের মত যারা তাদের সম্বন্ধেই বলা চলে—অর্থাৎ যারা শিক্ষাভিমানের যূপকাষ্ঠে আত্মাহুতি দিয়েছে এবং সেই জন্য জগতকে মনে মনে তিরস্কার ক'রছে।

মিস্ বসু একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন যাক্, আপনার অনুমান যে সর্বদা অন্তত সত্য হয় না এটা জেনে কিছুটা নিশ্চিন্ত হ'লাম।

মানবেন্দ্র হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। মিস্ বসু বলিবার কিছু না পাইয়া চুপ করিয়াই রহিলেন—এই লোকটার হাসি এমনি যে তাহা যেন সকলকে নির্বাক করিয়া দেয়।

অনেকক্ষণ পরে মিস্ বসু কহিলেন – তা হ'লে শীঘ্রই আমি একটা নরাধমের স্ত্রীরূপে দেখা দেব এই আশা করেন ?

—না। নরাধমের খোঁজ ক'রবেন কিন্তু পাবেন না। ডাঃ সেনের মত আরও অনেকের প্রশংসাবাদ শুনতে শুনতে হঠাৎ একদিন দেখবেন যে বিবাহের বয়স পার হ'য়ে গেছে এবং তখন বিয়ে করাটা হাস্যকর হবে, এই ভয়েই বিয়ে করা হবে না এবং পুরুষ জাতির চির শত্রু হ'য়ে বসবাস ক'রবেন।

একটু ব্যঙ্গের সহিত মিস্ বসু কহিলেন—তবে এখন উপায় ?

—একদিন ফস্ করে বিয়ে ক'রে ফেলা।

—ক'রবো ত কিন্তু কাকে ?

—চেষ্টা করুন লোকের অভাব হবে না। আপনাকে বিয়ে না ক'রলেও আপনার অর্থ ও চাকুরিকে অনেকেই বিয়ে ক'রতে রাজি হবে।

—সেও ভাল, আমি ত হতাশই হ'য়েছিলাম প্রায়।

—না না, হতাশ হবেন না। রবার্ট ব্রুসের মত চেষ্টা করুন।

একখানা মোটর সবেগে আসিয়া গাড়ি-বারান্দার নীচে থামিল এবং চন্দনা প্রায় ছুটিয়া মানবেন্দ্রের ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল—বাঁচলাম, বাবা !

মিস্ বসুকে হঠাৎ দেখিয়া ফেলিয়া একটু বিচলিত ভাবে কহিল—কি

সাংঘাতিক, চাপা দিতে দিতে বেঁচে গেছে, এখনও বুকের ভিতর কাঁপছে।

মানবেন্দ্র হাসিয়া কহিল—কিন্তু এখানেও যে আর একটা অ্যাকসিডেণ্ট।

—কি রকম?

—আপনারা যত দুর্লভ প্রাণী সব একে একে আমার পরশ্মৈপদী কুটীরে এসে সমবেত হ'চ্ছেন?

চন্দনা সহাস্যে কহিল—নমস্কার মিস্ বসু, আপনার কোন অসুবিধে হ'বে না ত? সত্যিই খুব হঠাৎ এসে পড়েছি।

মিস্ বসু কহিলেন—আমিও আপনারই মত হঠাৎ এসে পড়েছি। প্রসঙ্গ ক্রমে মানবেন্দ্রবাবুর অনুমানটা শুনে যাচ্ছি।

—অনুমান? সকলের সম্বন্ধেই অনুমান করেন নাকি? আমার সম্বন্ধে অনুমান করেন নি?

মানবেন্দ্র কহিল—বসুন, একে একে বলি। হ্যাঁ, চাপা দেওয়ার কথা কি ব'লছিলেন?

—পথে একটা লোক প্রায় চাপা পড়েছিল আর কি, তাই ব'লছিলাম।

—পথে যে অ্যাকসিডেণ্টটা ক'রতে পারেননি সেইটে ক'রলেন আমার ঘরের মধ্যে। সকলে হাসিয়া উঠিল। মানবেন্দ্রের রসিকতাটা যেন ভয়ানক রকমের উপভোগ্য হইয়াছে এমনিভাবে খানিক হাসিয়া কহিল—যাক্ এখন অনুমানটা কি তাই বলুন।

—অনুমান নয় একেবারে সত্য কাহিনী। অর্থাৎ আপনি একটি মোটর, দ্রুতবেগে চ'ল্‌ছেন, বেচারী হালদার প্রভৃতির গায়ে কাদা জল ছিটিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন অত্যন্ত উদ্ধত নির্মমতার সঙ্গে, লাহিড়ীকে ও মলয়কে চাপা দিতে দিতে বেঁচে শেষে আমার ঘরের মাঝে এসে আমাকেই চাপা দিলেন।

—আপনাকে চাপা দিলাম!

—হ্যাঁ, চাপা আপনি ঠিক দেন নি, তবে আমি পড়ে গেলাম। আর মিস্ বসু দ্রুতগামী না হ'লেও গরুর গাড়ির মত নিশ্চিত গতি—সরু গলির মাঝে ঢুকে পড়েছেন, গাড়ি সদর রাস্তায় না পড়লে মোটর আর বেরুতে পারবে না—ফিরে যেতে হবে, না হয় পিছু পিছু আস্‌তে হবে।

—অর্থাৎ আমার আসাটা ভাল হয় নি—এই ত?

—আমার উপমার অর্থ যদি তাই হয় তবে আর পুনরায় কেন বলি, কিন্তু পূর্বেই বলা হ'য়েছে ওটা অনুমান।

—কাল ত অনুমান ক'রেছিলেন আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়, এটা কি আপনি বিশ্বাস করেন?

মিস্ বসু জবাব দিলেন—বিশ্বাস না ক'রলে বলবেন কেন?

—তাই নাকি?

—কেন? মিস্ বসুর জবাবটা পছন্দ হ'চ্ছে না?

—মিস বসুর জবাব ত চাই নি। আপনার কাছেই জান্‌তে চেয়েছি আপনার মতটা। মানবেন্দ্র একটু চিন্তা করিয়া কহিল—বিয়ে একেবারে না ক'রতে পারেন এমন নয়, তবে সেটা একটা অভিযানের আনন্দ পাওয়ার মত হবে। রোজ পিকনিক করা যেমন ভাল লাগে না, তেমনি নিত্যই একটা লোকের সঙ্গে সংসার করা ভাল লাগবে না, তাই বিচ্ছেদ হবে। বার বার বিয়ে ক'রতে পাবেন কিন্তু একবার বিয়ে ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন না।

মিস্ বসু প্রতিবাদ করিলেন—কেন? আপনারাই ত বলেন, মাতৃত্বই নারীর চরম বিকাশ, সেই তার জীবনের একমাত্র কাম্য।

—হ্যাঁ, ওটা সাধারণ আইন; কিন্তু perversion ত আছে এবং চিরদিনই থাক্‌বে। বস্তুতান্ত্রিক জগৎ যেখানে হৃদয়কে অস্বীকার ক'রতে শুরু করে, সেখানে হৃদয়ের আইন টেঁকে না, যেমন হলিউডের তারকাকুল আজ বিচ্ছেদ-টাকে আভিজাত্য মনে ক'রতে চলেছে। সেখানে ধন-সম্পদ মনকে perverted ক'রে দিয়েছে, যৌন প্রবৃত্তি মাতৃত্বের দাবীকে অস্বীকার ক'রে চলেছে—কারণ মাতৃত্ব সেখানে ধন-সম্পদ উপায়ের বিরোধী।

চন্দনা কহিল—তা হ'লে আমার সম্বন্ধে অনুমানটা কি হ'ল একটু সংক্ষেপে বলুন ত?

—সব কি সংক্ষেপে বলা যায়? ডিফারেনসিয়াল ক্যালকুলাস কি সংক্ষেপে পড়ান যায়?

—হা অদৃষ্ট! আমার কথাটা সংক্ষেপেও বলা যায় না!

—না, যেহেতু মানুষটি আপনি অত্যন্ত বিস্তীর্ণভাবে বিকৃত। বিকৃতিটা জন্মে কাউকে মোটিভ দিয়ে নয় আপনা হ'তে।

চন্দনা একটু হাসিয়া সুগন্ধি রুমালটাকে মুখের উপর দিয়া বুলাইয়া লইয়া

কহিল—আপনাদের কারও বিকৃতি ঘটে না, যত অঘটন ঘটল আমার বেলায়।

—ওটা অ্যাকসিডেণ্ট, যেমন রাস্তায় বহু লোকই চলে কিন্তু চাপা পড়ে কদাচিৎ দু' একজন। তবে বিকৃতি ঘটেছে মিস্ বসুর মধ্যে, আমার মাঝে, আদিত্যবাবুর মাঝে, সকলের মাঝেই কিছু, তবে তারা একেবারে চাপা পড়ে নি।

—আমি চাপা পড়েছি?

—হ্যাঁ। সভ্যতার রথচক্রতলে চাপা পড়ে মরে গিয়ে ভূত হ'য়ে বসে আছেন, আর মিস্ বসু আহত হ'য়ে খুঁড়িয়ে চ'লছেন।

চন্দনা ব্রীড়া ভাঙ্গ করিয়া কহিল—মরেই গেছি?

—আর আমি খুঁড়িয়ে চল্‌ছি?

—হ্যাঁ, চন্দনা মরে গেছে বলেই সে বিয়ে ক'রতে চায় ভূতকে; কিন্তু ভূশণ্ডীর মাঠে যৌন অরাজকতা চলেছে অকৃত্রিমভাবে। সেখানে তাই বিবাহটা চলবে একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষারূপে, বিবাহরূপে নয়। আর মিস বসু, আপনার বিবাহের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, আপনার দরকার একটা নির্ভর যার উপর ভর দিয়ে খুঁড়িয়েও চলা যেতে পারে।

মিস্ বসু ক্ষুণ্নস্বরে বলিলেন—সোজা হয়ে কি কেউ চ'লছে না জগতে?

—হ্যাঁ, দেখুন গিয়ে গ্রামে। কলসী কাঁখে হাসতে হাসতে এরা যায় দীঘিতে জল আনতে, সন্ধ্যার পূর্বে চুল বেঁধে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে লাল কাপড়খানা পরে স্বামীর জন্যে প্রতীক্ষা করে। তারা স্টিমারের সঙ্গে জালিবোটের মত নাচতে নাচতে ঢেউ পার হ'য়ে চলেছে। জানে, ডুবে গেলেও সে স্টিমারের পিছু পিছুই যাবে। আর আপনারা চান চ'ল্‌তে, তাই ঢেউ দেখলে ভয় হয়, চলা আর হয় না। পদে পদে গতি খণ্ডিত হয়—রাগ হয় অন্যের উপর আপনার অক্ষমতাকে ঢেকে রাখবার জন্যে।

চন্দনা বলিল—কথাটা ক্রমেই দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে। আগে যদিও বুঝেছিলাম কিন্তু এখন সব গোলমাল হ'য়ে গেল। তা হ'লে মোট কথা আমি বিয়ে ক'রতে পারি নে এই আপনার মত।

—মত নয়, অনুমান। বিয়ে ক'রতে পারেন বার বার, একবার নয়।

মিস্ বসু প্রশ্ন করিলেন—আর আমার ত গতিই নেই।

মানবেন্দ্র হাসিয়া কহিল—গতি নেই এমন নয়, তবে গতি দেবার সৎসাহস নেই। নির্ভর খুঁজেই পাবেন না জীবন ভ'রে।

চন্দনা হাসিয়া কহিল—যাকগে অত ভাবনার দরকার নেই। চলুন আমার ওখানে, কয়েকখানা বই কিনবো আপনি ফর্দ ক'রে দেবেন।

—বই কিনবার কোনো দরকার নেই। কতকগুলো পুরানো পাঁজি কিনে মোরাক্কো চামড়ায় বাঁধান, আর তার উপরে যে সমস্ত ব'লবো সেই নামগুলো সোনার জলে লেখান। তারপরে ভাল মেহগনীর আলমারিতে রেখে তালা বন্ধ করে দিন—চাকরকে সপ্তাহে দু'দিন ঝেড়ে রাখতে ব'লবেন।

—তার মানে আমরা বইও পড়তে পারবো না।

—দরকার কি? যার জন্যে বই পড়া তা ত সবই আজ সাধ্যায়ত্ত। মানবেন্দ্র হঠাৎ টেবিলের উপর হইতে কিছু ন্যাকড়া সুদ্ধ হাঁটুটায় জড়াইতে আরম্ভ করিল।

মিস্ বসু বলিলেন—ও কি? কি হ'য়েছে?

—বাতের বেদনা, বয়স ত হ'ল।

—বয়স কত হ'ল?

—তা বিশ পঞ্চাশ হ'ল বই কি? মানবেন্দ্র এমনভাবে হাসিল যেন সে ঠিকই বলিয়াছে এবং বিশ ও পঞ্চাশের মধ্যে কোন ব্যবধানই নাই।

হঠাৎ দেখা গেল তপতী চাকরের হাতে চা'র ট্রে দিয়া কয়েক কাপ চা ও কিছু খাবার লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। মানবেন্দ্র হাঁটুটাকে হাত দিয়া উঠাইয়া একটু সরাইয়া রাখিয়া প্রশ্ন করিল—এখানে যে এঁরা আছেন, তা জানলেন কি ক'রে?

তপতী কহিল—ভগবান চোখ দিয়েছেন দেখবার জন্যে। এত বড় একটা মোটর যে এসেছে, এটাও কি দেখা যায় না? সূক্ষ্ম দৃষ্টি আপনার মত না হয় নাই আছে।

—আদিত্যবাবু?

—খবরের কাগজ পড়ছেন।

মানবেন্দ্র কহিল—আসুন চা পান করা যাক্। এটা অবশ্য তপতী খাওয়াচ্ছে—তবে "মোর নামে মোর হয়ে—"

তপতী কুশল প্রশ্ন করিল—আপনার ব্যথাটা ক'মেছে?

—একটু কম, তবে বিকেল না গেলে বিশ্বাস নেই।

—কি আলোচনা হচ্ছিল ?

মানবেন্দ্র কহিল—বিবাহ সম্পর্কে। অর্থাৎ, চন্দনা বা মিস্ বসুর হওয়া বা করা বা ঘটা উচিত কিনা ?

—কি ঠিক হ'ল ?

—ঠিক হয় নি।

চা'র বাটিতে চুমুক দিয়া মানবেন্দ্র কহিল—যা বলছিলুম। মানুষ মোটর গাড়ির মত, চলতে যদি হয় তবে জলকাদা ছিটবেই এবং তা অন্যের গায়ে লাগবেই। আমি চলেছি আমার ব্যক্তিত্বের এঞ্জিন চালিয়ে, তার ফলে যদি অন্যের আঘাত লাগেই তবে আমি নিরুপায়। আবার যদি পাথরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয় তবে আমিই হবো চুরমার। কাজেই জীবনটা হ'চ্ছে একটা মস্ত বড় প্রতিযোগিতা। জিত থাক্ না থাক্ পরাজয় আছেই, কারণ প্রতিযোগিতায় প্রথম হয় একজনই। তপতী চ'লছে—আশে পাশের লোক যদি তার পদোত্থিত ধুলায় মলিনপ্রভ হয়ই তবে এ বেচারী নিরুপায়—যেমন হরিচরণ বেচারী চাপা পড়েছে কিন্তু মোটরের গতি ক্ষণিকের জন্যে একটু প্রতিহত হ'লেও পুরা বিক্রমে চলছে।

তপতী কহিল—বেশ। আবার আমি কেন ? নিজের কথা বলুন, কোন্ ছবিতে কিসের ভূমিকায় অভিনয় ক'রছেন তাই গল্প করুন শুনি—কবে সুটিং আরম্ভ ?

—সুটিং ত আরম্ভ হয়ে গেছে। চন্দনা নায়িকা, আমি নায়ক। কেন আপনারও অভিনয় ক'রতে ইচ্ছে হয় নাকি ?

—ছিঃ, সকলেই ত আপনার মত principle হীন হ'য়ে জন্মায় নি। পর্দায় যাই হোক্ অন্তত অভিনয় বা সুটিংটা একেবারেই আর্ট বর্জিত।

চন্দনাকে লক্ষ্য করিয়া মানবেন্দ্র কহিল—দেখেছেন ? আপনি মনে করেন দর্শকগণের করতালিই জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। তপতী ব'লছে, ছিঃ, মিস্ বসু হয়ত বলবেন, অধ্যাপনাই চরম আর্ট চর্চা। এখন এই মতভেদের রাজ্যে আমি সামঞ্জস্য আনি কেমন ক'রে ? আমার মনে হয় আদিত্যবাবুর আতিথ্য জীবনে আর্ট-চর্চার একমাত্র উপায়। অতএব দেখা যাচ্ছে—জগৎটি পাগলের রাজ্য। একে অন্যকে পাগল ব'লছে কিন্তু নিরপেক্ষ দ্রষ্টা কি ব'লবে সেইটেই প্রশ্ন।

মিস্ বসু বলিলেন—নিরপেক্ষ দ্রষ্টার বক্তব্যটা আপনিই বলুন না ?

—যদি নিরপেক্ষ হ'তেই হয় তবে ব'লতে হয়, ভালবাসা, প্রেম, বিবাহ, সমাজ, রাষ্ট্র, নীতি, এই সবই পাগলামি। যেহেতু এরা পাগলের সৃষ্ট। নিরপেক্ষ হ'লে তাই ভালবাসাও সম্ভব নয়, বিবাহ করাও সম্ভব নয়, দেশ সমাজ সেবাও সম্ভব নয়, নীতি মেনে চলাও সম্ভব নয়। ভলবাস্‌বো কাকে ? পাগলকে ? কোন্ দেশ সেবা ক'রবো ? গ্রীস ইংলণ্ড উরাগোয়ে না বলিভিয়ার ? নীতি মান্‌বো কার ? চীনের না হটেন্‌টটের না পপুয়ানদের ? কাজেই নিরপেক্ষ হ'তে হ'লে পাগলা গারদের বিরাট খাঁচার বাইরে দাঁড়াতে হবে, ভিতরে নয়। ভিতরে গেলেই দ্বন্দ্ব শুরু হ'বে, অথচ বাইরে থেকে বেশ দেখবার মজা।

তপতী কহিল—আপনি বুঝি খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছেন ?

—হ্যাঁ। যেমন তোমার বাবা খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর পোষা পাখি দেখেন। আমি দেখছি হরিচরণ গরাদে মাথা ঠুকে মরলে, হালদার সাহেব ঠুকরে আর একজনকে কাবু ক'রছেন, বিশ্বাস স্ত্রী কবুতরের মত গা খোঁচাচ্ছেন, তৃষ্ণার্ত চন্দনা পুচ্ছ নাচিয়ে জলের কিনারে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু জলপান ক'রছে না। মিস্ বসু শুষ্ক ডালে সন্ধ্যায় কাকের মত বসে আছেন। তপতী হাঁসের মত মাথা কাৎ ক'রে বেলা দেখছে। তপন সরীসৃপের মত বনজঙ্গল ভেঙে অকারণ চলেছে। ডাঃ দত্ত ঝড়ের পরে ভেজা কাকের মত আপনার দেহ লেহন ক'রছেন। আদিত্যবাবু দন্তহীন ব্যাঘ্রের মত জঙ্গলের কিনারে বসে হাঁপাচ্ছেন। অক্ষয়বাবু একপায়ে দাঁড়িয়ে আছেন বকের মত। মলয়, লাহিড়ী— এরা আত্মহারা হ'য়ে চন্দনা নটীর নৃত্য দেখছে, মিঃ ঘোষ বাজের মত দৃষ্টি নিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছেন আকাশে। খাঁচার ভিতর গেলে কি হ'ত জানেন ? সকলের ঠোকরে কাবু হ'য়ে যেখানে হয় আশ্রয় নিতে হ'ত।

মিস্ বসু ব্যঙ্গ করিলেন—নিজে যে বাইরেই আছেন এটা একেবারেই অনুমান নয়।

—অনুমান নয়। ভিতরের চেহারা দেখ্‌তে পারছি বলেই বুঝ্‌তে পারছি আমি বাইরে, ভিতরে থাক্‌লে ভিতরটাকে দেখতাম অন্য রকম।

চন্দনা হতাশভাবে কহিল—সব বুঝে ফেলেছি। এখন চলুন ত দেখি।

তপতী কহিল—কোথায় ?

মানবেন্দ্র হাসিয়া উঠিল। কহিল—দেখুন মিস্ বসু, আমি যে বাইরে তার প্রমাণই এই। নইলে চন্দনা যে করতালিকে পরমার্থ মনে করেছে তাকে আমি মাতালের বাহবা বলে উপেক্ষা ক'রতে পারতুম কি? আর তপতীর মত কোথায় যাবো ভেবে অস্থির হ'তাম কি? আমি জানি, আমি বাইরে, তাই কোথাও যেতে আমার ভয় নেই।

তপতী কহিল—বেশ, কোথায় যাবেন তাই জিজ্ঞেস করেছি, তাতে ভয়ের কি হল?

মানবেন্দ্র হাসিয়া কহিল—ভেবে দেখুন গিয়ে।

মিস্ বসু কহিলেন—তবে এখন মিস্ চন্দনার ওখানে যাবেন বুঝি?

মানবেন্দ্র আর একটু হাসিয়া কহিল—ছবি দেখলে মনে হয় এটা উঁচু এটা নীচু কিন্তু হাত দিলে দেখা যায় সেটা একেবারেই সমতল। কেবল চোখ দিয়ে দেখাটাই দেখা নয়—স্পর্শ ক'রেও দেখ্তে হয়। নইলে কি ঠিক বোঝা যায়?

মিস্ বসু কি বুঝিলেন বলা যায় না, তবে চুপ করিয়া গেলেন। তপতী কহিল—যাক্ হেঁটে যেতে ত পারবেন গাড়ি পর্যন্ত।

*

তপন গাড়িখানাকে কলেজ ফটকের অনতিদূরে রাখিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। উদ্দেশ্য অবশ্যই একটা ছিল কিন্তু মনটা যেন নানা সম্ভাবনায় বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাই সে মোটর ছাড়িয়া পেভমেণ্টে পায়চারি করিতেছিল।

রেণুকা ও মণিকা বাহির হইয়া আসিল—তাহারাও জানিত তপন কোথায় আছে, তথাপি তাহাকে না দেখিয়াই যেন চলিয়া যাইতেছিল। তপন তাহাদের সাম্নে উপস্থিত হইয়া নাটকীয় ভঙ্গিতে হাতজোড় করিয়া কহিল—আপনাদের নিকট আমার একটা নিবেদন আছে।

রেণুকা হাসিয়া কহিল—এত বিনয় ত চোরের লক্ষণ।

—চোর হ'লে খুশি হতাম কিন্তু পারলাম না, তাই ডাকাতি ক'রতে ইচ্ছে হয়।

মণিকা প্রশ্ন করিল—নিবেদনটা সংক্ষেপে জানাবেন কি?

—নিবেদনটা হ'চ্ছে আজ আমার মা আদেশ ক'রেছেন আপনাদের নিয়ে যেতে। আপনাদের সময় ও সুযোগ হ'লে আমি নিয়ে যেতে পারি।

রেণুকা কহিল—আচ্ছা চলুন, সময় যদি না থাকে ত নাই আছে। আপনাকে উপেক্ষা ক'রলেও আপনার মা'র আদেশ উপেক্ষা করা যায় না।

—প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে উপেক্ষা করাটাও খুব ভাল হবে কি ?

মণিকা ও রেণুকা মোটরে গিয়া উঠিল। তপন মোটর দ্রুত চালাইয়া আসিয়া বাড়ির সদর দরজায় ইচ্ছা করিয়াই বার বার হর্ন বাজাইল। দারোয়ান সেলাম জানাইয়া ফটক খুলিয়া দিল। বিরাট গাড়িবারান্দার নীচে আসিয়া গাড়ি থামিল।

মণিকা ও রেণুকা চাহিয়া দেখিল - বিরাট বাড়ি। তাহার গায়ে ঐশ্বর্যের প্রভা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। তপনের পিছু পিছু মন্ত্রচালিতের মত উঠিয়া কার্পেট-মোড়া তপনের পড়িবার ঘরে গিয়া বসিল।

তপন কহিল—একটু ছুটি চাই, মা'কে খবর দিয়ে আসি।

তপন অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে মায়ের কক্ষের দিকে যাইতেছিল—হঠাৎ মোক্ষদার সঙ্গে দেখা। আগ্রহে ও উৎসাহে তপন তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া কহিল—মা কোথায় ?

—তাঁর ঘরে।

—শীগ্‌গির চা-জলখাবারের জোগাড় ক'র। ছাখো গিয়ে কাদের সব এনেছি, তোমার ভাবী বৌদিদের—

—ও মা, কজন ?

—দু'জন। তপন স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়া মোক্ষদার গালে একটা টিপ দিয়া কহিল—যাও শীগ্‌গির, নইলে রেগে গেলে উপায় নেই।

মোক্ষদা হাসিল কেন, তাহা বলা কঠিন।

তপন মায়ের কক্ষে ঢুকিয়া কহিল—মা, শীগ্‌গির এসো। তুমি যে বলেছিলে সব ধরে নিয়ে এসেছি। এখন ছাখো, কুলশীল বিচার কর, যা হয় একটি পছন্দ ক'রে ফেলো। দেরী ক'রলে ফস্‌কে যাবে।

মা ত্রস্ত ভাবে কহিলেন—কিরে! কি এনেছিস্?

তপন হতাশার সুরে কহিল—ব্যস্। তুমি ব'ললে তোমার ভাবী বৌমাদের আনতে তাই নিয়ে এলাম, তার মধ্যে যাকে হয় পছন্দ কর।

—ও কপাল! সত্যিই এনেছিস্?

—হ্যাঁ, আমার পড়বার ঘরে। শীগ্‌গির এসো।

—যাচ্ছি, তুই যা। তারা একা বসে আছে। চা'য়ের বন্দোবস্ত কর একটু।

—আমি ক'রবো কেন?

—আচ্ছা, আমিই করছি। যা তুই ওখানে তারা নতুন জায়গায় একা একা থাকতে লজ্জা পাচ্ছে।

তপন যেমন দ্রুত আসিয়াছিল তেমনি দ্রুত চলিয়া গেল। নিজের ঘরে ঢুকিয়া দেখে মণিকা ও রেণুকা অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে এদিক ওদিক চাহিতেছে। তাহারা জানিত তপন বড়লোক কিন্তু এত বড়লোক তাহা হয়ত অনুমান করে নাই।

তপন পাখাটা খুলিয়া দিয়া কহিল—দেখছেন এটা খুলে দিতেও ভুলে গেছি। যাক্, এতক্ষণ কষ্ট হয় নি ত?

রেণুকা কহিল—হয়েছে। কারণ হঠাৎ ফেলে এমনি চলে গেলে কষ্ট না হলেও রাগ হয়।

তপন কহিল—মাকে নিয়ে না বলে খবর দিতে পারতুম কিন্তু সেটা ভাল হ'ত কি?

মা আসিবার পূর্বে মোক্ষদা চা ও খাবার লইয়া আসিল। রুপার ডিস, রুপার গ্লাস। অত্যন্ত মূল্যবান কাপ, পট প্রভৃতির অন্তরালে মোক্ষদার কৌতুকোজ্জ্বল মুখখানি বেশ মানাইয়াছে!

তপন কহিল—লজ্জা ক'রলে আমি চলে যেতে পারি।

তপনের মা অত্যন্ত নম্র ও ধীর পদক্ষেপে ঘরে ঢুকিলেন। তপন কহিল—এই আমার মা। আর এঁরা আমার সঙ্গে পড়েন, ইনি রেণুকা রায়, আর ইনি মণিকা মজুমদার। ওঁদের বাড়ি অনেক চা খেয়েছি তাই আজ নিয়ে এলাম একটু চা খাওয়াতে।

মা মোক্ষদার দিকে চাহিয়া কহিলেন—খাবার এনেছিস্?

—হ্যাঁ, মা।

—কই দেখি?

মা কহিলেন—তোর আর কবে বুদ্ধি হবে বল ত? কোন ন'টায় সব খেয়েছে এখন অতটুকু খাবারে কি হয়।

রেণুকা বড় রুপার প্লেটের বহুবিধ মিষ্টান্নের দিকে চাহিয়া কহিল—এই এতটুকু?

মণিকা ও রেণুকা প্রণাম করিল। মা মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—এসো মা। তোমাদের কথা অনেক শুনেছি তপনের মুখে; কিন্তু দুষ্টু ছেলে কিছুতেই কি তোমাদের আন্‌বে! তপতী কোথা, মোক্ষদা তাকে ডাক্।

মোক্ষদা চলিয়া গেল। মা হাসিয়া কহিলেন—তোমরা ত ছেলেটিকে দেখছো, ওর কোন বুদ্ধি-শুদ্ধি ত হ'ল না।

রেণুকা প্রতিবাদ করিল—ওঁর বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই, বলেন কি?

তপন কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সহিত কহিল—দেখ্‌লে মা আমার বুদ্ধি আছে।

মা শান্তভাবে একটু হাসিয়া বলিলেন—তোর ছেলেমানুষী আর গেল না। মা রেণুকার পরিচয় লইতে লইতে বাহির করিলেন—রেণুকা বাপের বাড়ির সম্পর্কে তাঁহাদের একটু আত্মীয় হয়। অর্থাৎ তাঁহার এক খুড়তুতো বোনের ননদের জায়ের মেয়ে রেণুকা। মা বলিলেন—এই ছাখ, এরা যে পরমাত্মীয় তাও এতদিনে তুই জানিস্ নি। মণিকার সহিত আলাপ হইল কিন্তু বহুদূর বিচার করিয়াও কোন আত্মীয়তা ধরা পড়িল না। মা বলিলেন—সম্পর্কে ত আর আত্মীয়তা হয় না, তোমরা যদি আসা-যাওয়া কর তবেই আত্মীয়তা গড়ে উঠবে। কেমন?

মা আদর করিয়া মণিকার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন। রেণুকাকে কহিলেন—কেমন? এখন তোমাদের আস্‌তে ত আর লজ্জা ক'রবে না?

তপতী আসিল। একেবারেই পারিপাট্যহীন বেশ—তবুও তাহার মুখশ্রী জানাইয়া দিতেছিল যে সে অভিজাত বংশেরই কন্যা। পরিচয়ের পরে তপতী কহিল—বেশ, চা খাবার ঠাণ্ডা ক'রে কি লাভ? কলেজের পরে ক্ষিদে নিশ্চয়ই লেগেছে।

মা কহিলেন—হ্যাঁ মা, তোমরা খেয়ে নাও। তোরাও তোদের চা খেয়ে নে নইলে ওদের ত লজ্জা ক'রবেই।

আহারান্তে আদিত্যবাবু ঘরে প্রবেশ করিলেন। সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল, পরিচয়ান্তে সকলে বসিলে, প্রণামরত রেণুকার মাথায় হাত রাখিয়া আদিত্যবাবু হাসিয়া কহিলেন—চমৎকার মেয়ে। এমনি মেয়ে পেলে বৌমা ক'রে ঘরে আনতুম।

মা পরিচয় জানাইয়া দিয়া কহিলেন—আমাদের হেনার ননদের ভাসুরঝি, চিনলে ত?

—হাঁ। এ আর চিন্‌বো না কেন? পরিচয় নেই বলেই!

অকারণ ও অবান্তর অনেক আলাপ-আলোচনা হইল। আদিত্যবাবু উঠিবার পূর্বে বলিলেন—তপন, ওদের বাসায় পৌঁছে দিয়ে এসো। আমার গাড়িটা নিয়ে আর তোমাকে চালাতে হবে না। ড্রাইভার নিয়ে যাবে।

মণিকা বাহিরে চিড়িয়াখানা ও বাগান দেখিতেছিল, হঠাৎ কি ভাবিতে ভাবিতে বলিল—পেছনে এমনি বাগান নেই?

তপতী কহিল—দেখবেন? চলুন, আপনাদের দেখিয়ে আনি। দাদা তুমি যেতে পারবে না। আমি সব দেখিয়ে আন্‌বো।

তপতী সমস্ত বাড়িটা দেখাইয়া বেড়াইতেছিল, রেণুকা ও মণিকা এই ঐশ্বর্য ও তাহার অপচয়কে মনে মনে তারিফ করিয়া বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তপতীও জানে না কখন্ তাহারা মানবেন্দ্রের ঘরের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। রেণুকা কহিল—এ ঘরে কে থাকেন?

—মানবেন্দ্রবাবু, চমৎকার লোক। আসুন, আলাপ ক'রবেন।

ঘরে ঢুকিয়া তপতী কহিল—এঁরা দাদার বন্ধু, বেড়াতে এসেছেন, রেণুকা ও মণিকা, আর ইনি—

মানবেন্দ্র কহিল—আমি বলছি। আমার পরিচয় আপনার চেয়ে আমিই ভাল জানি। বসুন আপনারা। আমি আদিত্যবাবুর আশ্রিত একটি জীব বিশেষ। হ্যাঁ, আপনাদের কলেজের সাহিত্য সভার মহিলা-সম্পাদিকা বোধ হয় আপনি?

রেণুকা কহিল—হ্যাঁ, আপনি জানলেন কি করে?

—আমি জানি। তপনবাবুর মুখে আপনাদের কথা শুনেছি অনেক। তপনবাবুকে জানেন ত?

রেণুকা হাসিয়া কহিল—কিছু কিছু জানি বৈকি?

—যেটুকু জানেন না, সেটুকু হ'চ্ছে এই যে তপনবাবু এই বিরাট বাড়ি ও লাখো লাখো টাকার সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। কাজেই জগতে যত কিছু আশীর্বাদ তা নিয়েই তিনি জন্মেছেন। আর মানুষ হিসাবে যে তিনি কি এবং কতখানি তা বোধহয় আমার চেয়ে আপনারা ভাল জানেন।

তপতী কহিল—জানেন বৈ কি? এতাদিন মিশ্‌ছেন।

—অবশ্যই জানা উচিত। এখন আপনারা বোধহয় মনস্থির ক'রতে পারবেন।

রেণুকা প্রশ্ন করিল—কিসের ?

মানবেন্দ্র হাসিয়া কহিল—সাহিত্য-সভা কেমন ভাবে চল্‌বে। অর্থাৎ কত ভালভাবে চ'ল্‌তে পারে।

রেণুকা কহিল—সে ত তপনবাবুর জন্মেই চল্‌ছে—চল্‌বে। তাতে আর আমাদের মনস্থির করা কি লাগবে ?

—তা লাগে। কর্মী না হ'লে এসব অনুষ্ঠান সুন্দর হয় না।

মানবেন্দ্র থামিয়া কহিল—আপনারা, আমি অপরিচিত মনে করে বোধহয় সঙ্কোচ ক'রছেন, তা করাও স্বাভাবিক, কিন্তু আপনারা অমার কাছে বহু-দিনের পরিচিত। পরিচয় চাক্ষুষ নয়, কিন্তু মনের দিক দিয়ে। তাই কিছু বল্‌লে বোধ হয় অন্যায় মনে ক'রবেন না।

—না না, বলুন।

—পড়্‌ছেন ত ? তার পরে কি ক'রবেন ? ধরুন এম, এ, পাশ করার পরে।

রেণুকা কহিল—সে ত ভাবি নি। পড়ছি, পাশ ক'রতে হবে এইটুকু জানি।

—বিয়ে করবেন না ?

কেহ জবাব দিল না। মানবেন্দ্র হাসিয়া কহিল—প্রশ্নটা বড় অকস্মাৎ হ'য়ে গেছে তাই জবাব দেওয়া সম্ভব হ'ল না ; কিন্তু আপনারা যদি বিয়ে না করেন তবে সেটা অন্যায় হবে না কি ?

মণিকা কহিল—কেন ?

—জগতে সকলেই যদি বিয়ে না করে তবে ১৫০ বছর পরে পৃথিবী জনশূন্য হ'য়ে যাবে। সেটা বোধ হয় ভাল নয়। সকলের পক্ষে সমবেত ভাবে যা পাপ একার পক্ষেও সেটা পাপ। তা ছাড়াও যারা ভাল মেয়ে বা ছেলে তাদের বিবাহের দ্বারাই ভবিষ্যতে ভাল ছেলে আশা করা যায়, যারা দেশের মুখোজ্জ্বল করবে। আপনারা কলেজের পড়ুয়া তাই কথা কয়েকটি ব'ললাম। উত্তর না হয় নাই দিলেন কিন্তু ভেবে দেখ্‌তে দোষ কি ?

তপতী কহিল—বেশ! প্রথম আলাপেই যে একেবারে উপদেশ দিতে শুরু ক'রলেন ?

মানবেন্দ্র হাসিয়া কহিল—ছেলেমানুষ আপনি বুঝবেন না। এখন ঠিক এমনি একটা "বাণী" যাকে আপনারা বলেন, তাই শুনবার অপেক্ষায় ওঁরা

ছিলেন। যা শুনতে চাচ্ছিলেন তাই বলেছি। এতে কি অপরাধ হতে পারে? কি বলেন আপনারা—অপরাধ হ'য়েছে?

—না না, অপরাধ কি, ছিঃ! আপনি ত ভালর জন্যেই বলেছেন। আপনাদের উপদেশেই ত শিক্ষা। রেণুকা কথা কয়েকটি বলিয়া হঠাৎ থামিল। মণিকা মানবেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া সপ্রতিভভাবে প্রশ্ন করিল—এমনি কথা শুনতে চাইছিলাম একথা আপনি কেমন করে বুঝলেন?

—কেমন করে বুঝলাম বলা শক্ত। তবে সত্যি কিনা বলুন ত?

মণিকা সবিস্ময়ে কহিল—হ্যাঁ।

মানবেন্দ্র একদৃষ্টিতে মণিকার দিকে ক্ষণিক চাহিয়া থাকিয়া কহিল—আশ্চর্য!

—কি আশ্চর্য! মণিকা প্রশ্ন করিল।

মানবেন্দ্রের চোখ দুইটি সহসা যেন জ্বলিয়া উঠিল। সে একটু ইতস্তত করিয়া কহিল—আপনার মত মেয়ে আমি এই প্রথম দেখলাম।

মণিকা হাসিয়া কহিল—কেন?

- হ্যাঁ, সত্যিই শক্তি আছে আপনার মনে। এ শক্তির অপচয় করবেন না। অপচয় অভিপ্রেত নয়। শক্তির অপচয়ও আনন্দ নয়।

তপন আসিয়া জানাইল—গাড়ি প্রস্তুত। রেণুকা ও মণিকা নমস্কার জানাইয়া কহিল—আসি।

—আসুন। ভবিষ্যতে দেখা হবে আশা করা যায় কি তপনবাবু?

—যায় বৈকি!

মণিকা বাহির হইতে হইতে কহিল—আসবো বৈকি?

*

শূন্য গৃহের মাঝে হালদার হাঁপাইয়া উঠিতেছিলেন। বাড়িটার সর্বাঙ্গে যাহারা চলিয়া গিয়াছে তাহাদের স্মৃতি মনটাকে, সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া ব্যথিত করিয়া তুলে। হালদার চিন্তা করিতেছিলেন—তিনি যাহা ভাবেন তাহা এমনি ভাবে প্রকাশ করিয়া কি লাভ। যদি তাহাই হয় তবে তাহার প্রতিষেধক ইহা নহে। নিজের কথা কয়েকটির জন্য প্রথম যেন আজ তিনি অপরাধী বলিয়া মনে হইল। যদি তাহাই হয় তবে অনুশোচনা করিয়া বা বাধা দিয়াই বা লাভ কি?

মনটা ভারি হইয়া উঠিতেছিল—তিনি ছড়িখানা লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন এবং অনির্দিষ্ট পদক্ষেপে সন্ধ্যার প্রারম্ভে চন্দনার দরজায় আসিয়া আঘাত করিলেন। চাকর দরজা খুলিয়া দিল। হালদার বসিলেন।

কতক্ষণ পরে চন্দনা আসিয়া কহিল—ডাঃ হালদার? নমস্কার!

—নমস্কার।

—আপনাকে যেন বড্ড কেমন দেখাচ্ছে।

ডাঃ হালদার হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন—বইটা প্রেসে গেছে তাই একটু বেশি পরিশ্রম হ'চ্ছে! সে এমন কিছু নয়।

—হঠাৎ, এতদিন পরে?

হালদার কিছু সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিলেন—ইচ্ছে হ'ল তাই এলাম। জানি, আপনি খুশি হবেন না, কিন্তু আমি খুশি হবো তাই এসেছি! মোহই বলুন, স্বপ্নই বলুন, লালসাই বলুন, যে কারণেই হোক আপনার এখানে এসে আমি আনন্দ পাই তাই আসি। আর আজ আনন্দ পাওয়ার যেন একটু প্রয়োজন হ'য়েছে বিশেষ ক'রে।

চন্দনা হাসিয়া কহিল—কেন? মনটা ভাল নেই?

—হ্যাঁ। সহধর্মিণী একটু রাগারাগি করেই পিত্রালয়ে গেছেন। ঘরে যেন কেমন একটা অস্বস্তি বোধ ক'রলাম তাই ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লাম।

চন্দনা সমবেদনা বোধ করিতেছিল। এই লোকটি কি যেন বলিতে চায় অথচ কিছুতেই বলিতে পারে না। কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই বার বার ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া যায়। চন্দনা কহিল—একটু চা'র কথা বলে আসি, কেমন?

চন্দনা অবিলম্বেই ফিরিয়া হালদারের নিকটবর্তী চেয়ারটায় বসিল। হালদারের শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া চন্দনার যেন দয়া হইল। সে কহিল—এখানে এসে যদি আপনি আনন্দ পান তবে সে আমার গৌরবের কথা। আসবেন কিন্তু আমার কি সাধ্য আছে আপনার মত পণ্ডিত মানুষকে কথা দিয়ে আনন্দ দিতে পারি!

হালদার কি যেন ভাবিতেছিলেন। চা আসিলে নিঃশব্দে চা পান করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। চন্দনা চাহিয়া চাহিয়া বুঝিয়াছিল, যে কারণেই হোক এই লোকটির অন্তরে কোথায় যেন একটা পরিবর্তন আসিয়াছে। হালদার স্বীকা-

রোক্তি করিলেন—কথায় আনন্দ পাই ব'ল্‌লেও ভুল বলা হয়, আপনার সান্নিধ্যই যেন মনে মনে চাই।

চন্দনা কহিল—স্ত্রী পুত্র কন্যাকে পাঠিয়ে দিয়ে শূন্য গৃহের মাঝে বাস ক'রতে ক'রতে আমার এখানে এসে আমার সান্নিধ্যে আনন্দ পাওয়াটা কি আপনাদের মত মানুষের উপযুক্ত ?

—না। সমাজের চোখে নয়, কিন্তু আমার মন ত সমাজের এ বিধি মান্‌তে চায় না। জগতে একটা কিছু খুঁজে বেড়াই, তার কিছুটা যেন আপনার এখানে এসে পাই। মনে হয় আপনাকে ঘিরেই যেন আমার সুন্দরের কল্পনা মূর্ত হ'য়ে ওঠে—এ আমি কেমন করে অস্বীকার করি!

চন্দনা কথা কহিল না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—একথার উত্তর দিলে এই প্রৌঢ় লোকটি নিশ্চিতই আহত হইবে। হালদার কিছুক্ষণ কি যেন ভাবিলেন—তারপর অত্যন্ত সন্তর্পণে অত্যন্ত ধীরে চন্দনার হাতখানি আপনার হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া ক্ষণিক বসিয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে কহিলেন—জগতে যা খুঁজি তা যেন আপনার মাঝেই কেবল আছে। আকণ্ঠ তৃষ্ণা যেন কেবল এই ঝর্ণার জলেই তৃপ্ত হতে পারে। জীবনের যা কিছু আকাঙ্ক্ষা লালসা কল্পনা সব যেন একীভূত হ'য়ে আপনাকে সৃষ্টি ক'রেছে তাই সমস্ত মান-অপমান প্রত্যাখ্যানকে বিস্মৃত হ'য়ে বার বার আসি, বার বার আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে ফিরে যাই, কিন্তু কি চাই, কেন চাই, তা জানি না, অদৃশ্য একটা আকর্ষণ আমাকে বন্যার জলের শ্বাপদের মত ঠেলে নিয়ে আসে।

চন্দনা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল—হালদার দূরে কি একটার দিকে চাহিয়া আছেন আর তাঁহার কোটরগত চক্ষু হইতে জল গড়াইয়া চিবুকে আসিয়া থামিয়াছে। চন্দনার চোখ দুইটিও সমবেদনায় সজল হইয়া উঠিল। সে আপনার হাতখানিকে হালদারের হাতের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া কহিল—কিন্তু আপনিই ত বলেছেন মানুষ ভাবে তার আকাঙ্ক্ষিতাকে, মানসী কিন্তু যখন পায় তখন তাকে ধূলায় ফেলে দিয়ে যায়—কারণ সে দেখে এ কেবল মাত্র বাস্তব নারী, তার মানসী নয়।

—হ্যাঁ তাই। তাই যা পাওয়ার অতীত তাই কেবল সুন্দর, তাই আপনি মোহময়, তাই আপনি এত আনন্দদায়ক।

—যদি পাওয়ার অতীত না হতুম তবে ?

—তবে, এত আনন্দ পেতাম না, এত মোহময় আপনি থাকতেন না। হয়ত দেখতেন তার পরদিন এদিকে আসতে আমার মন চায় না। তাই আপনাকে পাওয়ার অতীত রেখেই আপনাকে পেতে চাই, কল্পনায় রেখে আপনাকে আমার মাঝে পেতে চাই। দেহের অতীত তীরে আপনাকে ভালবাসতে চাই।

চন্দনা ক্ষণিক চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে আপনার হাতখানিকে মুক্ত করিয়া লইল। হালদার দূরের পানে চাহিয়া কহিলেন—সেই পূর্ণ আনন্দ—সেইখানে মানুষের প্রেম সুন্দর হ'য়ে ওঠে, সেইখানেই সে নিজেকে পায়, মানসীকে পায় আপনার মাঝে।

চন্দনা কহিল—কিন্তু এই মানসীকে পাওয়া ত সকলের জীবনে সত্য নয়।

—না, তা নয়, সেখানে মানুষের মন আপনার গণ্ডীকে অতিক্রম করে যায় নি। দেহ মনের উপরে আধিপত্য বিস্তার ক'রে তাকে পঙ্গু ক'রে রাখে—মানসীকে মানুষ পৃথিবীর ধুলায় পায় না, তাকে সে পায় আপনার মাঝে, আপনার স্বপ্নরাজ্যে, আপনার—

চন্দনা নির্বাক বিস্ময়ে হালদারের কম্পিত কণ্ঠস্বর শুনিতেছিল—কথা বলিতে তাহা বার বার যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। অদূর আকাশের পানে চাহিয়া যেন তিনি বলিয়া যাইতেছেন। তাঁহার অন্তর যেন চন্দনার অনেক ঊর্ধ্বে আপনার খেয়ালে ঘুরিয়া মরিতেছে।

হালদার বলিলেন—তাই মানুষের মন চিরবেদনাময়—চিরবিরহকাতর। 'দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।' আপনার এত সন্নিকটে বসেও আপনাকে পেতে চাই আমি স্বপ্নে, আপনার মাঝে একান্ত আপনার ক'রে।

হালদার চুপ করিলেন কিন্তু তাঁহার ওষ্ঠ তখনও ভাবাবেগে কাঁপিতেছে, তাঁহার চোখ দুইটি হইতে জল গড়াইয়া পড়িতেছে। হালদার কোন কথা না বলিয়া অকস্মাৎ লাঠিখানা লইয়া ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেলেন।

চন্দনা স্তূপাকার জড়পদার্থের মত হালদারের প্রস্থান দেখিল। লোকটি কি কহিতে আসিয়াছিল, কি চাহিয়াছিল কিছু সে বুঝে নাই। তাই সে নির্বাকভাবে ক্ষণিক বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে কহিল—যাক্ গে।

হালদার অত্যন্ত বিমর্ষভাবে বাড়িতে প্রবেশ করিলেন। চাকর ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—মা এসেছেন।

হালদার সংক্ষেপে 'হুঁ' বলিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন এবং কোনও কথা না বলিয়াই পড়িবার ঘরের ইজিচেয়ারটায় আপনাকে এলাইয়া দিলেন—যেন বহু পরিশ্রমান্তে তিনি একটি আশ্রয় পাইয়াছেন। কোটরগত চক্ষু দুইটি তখনও শ্বাপদ চক্ষুর মত জ্বলিতেছে—আপন মনে কি যেন ভাবিতেছিলেন।

পত্নী আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন—এতদিন একটা খোঁজও নিলে না? আমি না হয় তোমার কেউ নই, তোমার ছেলেমেয়েকেও কি একবার দেখতে ইচ্ছে হয় না—তারা তাদের বাবার কাছে আসবে বলে পাগল।

হালদার কহিলেন—তা আবার এলে কেন? মুক্তজীবন ভাল লাগলো না বুঝি?

—তুমি ত মুক্তজীবনটা বেশ উপভোগ ক'রেছ, না?

—সেখানে ত কোনও অভাবই তোমার ছিল না।

—তোমার জন্তেই ত আসতে হ'ল। তোমার ত কিছুই ঠিক থাকে না—আর ওরা কি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারে? বাপের বাড়ি আমারও ত একটা সম্মান আছে!

—অবশ্যই আছে; কিন্তু ওরা ব'লতে তোমার ছেলেমেয়ে ত? তারা তাদের বাপকে কি চেনে?

—ছিঃ আবার সেই সব কথা তুলছ! তোমার পায়ে পড়ি, ওসব ব'লো না, অন্তত এতদিন পরে কয়েকটা দিন না হয় ভুলে যাও।

হালদার শুষ্ক হাসিয়া বলিলেন—আমার জন্তে যদি এতই ভয় তবে গেলে কেন? তোমার মনের মানুষ ছেড়ে এলেই বা কেন?

হালদারপত্নী রুদ্ধনিশ্বাসে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। এতদিন পরে এই সম্ভাষণে তাঁহার মনের পুঞ্জীভূত বেদনা সহসা রূপান্তরিত হইয়া উঠিল—সমস্ত শরীরে ক্রোধ যেন বিদ্যুৎবহ্নির মত পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। তিনি কঠোর কণ্ঠে কহিলেন—তুমি কি বিশ্বাস করো আমি সত্যই ব্যভিচারিণী, না কেবল আমাকে জ্বালা দিতেই তুমি এমনি ক'রে কথার আগুনে পোড়াও?

—বিশ্বাস করি, শুধু তাই নয়। তার সুযোগ খুঁজবার জন্তেই ঝগড়ার ছল করে তুমি এতদিন কাটিয়ে এলে। এতদিন পরে হয়ত মনে হ'য়েছে সমাজগত একটা বন্ধন ত আছে, তা ত অস্বীকার করা যায় না, অথবা আজ আমার কাছে

আসা কোন কারণে প্রয়োজন হ'য়েছে, হয়ত লোকলজ্জার খাতিরে।

হালদারপত্নী কোন কথা না বলিয়া নীচে রান্নাঘরের দিকে নামিয়া গেলেন। হালদার একটা নিশ্বাস ফেলিয়া যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। বুকের মাঝে গুরুভার যে বেদনা এতক্ষণ চাপিয়া বসিয়াছিল সব যেন নিঃশেষে উড়িয়া গিয়াছে। হালদার নিশ্চিন্ততার সঙ্গে চেয়ারে হেলান দিলেন। মনে মনে ভাবিলেন— অভিমান ক্রোধ দ্বন্দ্ব থাক, কিন্তু এতদিন অন্যত্র থাকার মূলে যে কোনও নির্দিষ্ট কারণ আছে একথা অনুমান করা যায়।

অন্তত পত্নী যে গুরুতর আঘাত পাইয়াই অমন করিয়া চলিয়া গেলেন, এই দৃশ্যটাই যেন তাঁহার মনে পরম পরিতৃপ্তি দিতেছিল। তিনি উঠিয়া ছেলেমেয়ে দু'টির দিকে চাহিলেন, তাহারা কি যেন একটা খাদ্য লইয়া ব্যস্ত।

অকস্মাৎ নীচে একটা চীৎকার শোনা গেল—চাকর চীৎকার করিতেছে, আগুন বাবু, আগুন।

হালদার বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখিলেন রান্নাঘরের মধ্যে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে। দ্রুত নীচে নামিয়া আসিয়া দেখেন রান্নাঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। লাথি দিয়া সেটাকে ভাঙ্গিয়া ঢুকিতে ঢুকিতে আগুনটা কমিয়া আসিল, আর ভিতরে 'বাবা গো' বলিয়া কে যেন দুম্ করিয়া পড়িয়া গেল। হালদার ঢুকিয়া দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী অর্ধমূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন, সমস্ত শরীরের উপর দিয়া তখনও নির্বাপিতপ্রায় অগ্নিশিখা খেলিয়া বেড়াইতেছে। হাত দিয়া শেষ শিখাটাকে নিভাইয়া দিয়া তিনি স্ত্রীর হাত ধরিলেন, খানিকটা দগ্ধ চামড়া নিজের হাতে লাগিয়া গেল। হালদার কহিলেন—কেমন করে আগুন লাগলো!

তখনও সংজ্ঞা হয়ত ছিল, তিনি জবাব দিলেন—যেমন ক'রে তুমি লাগালে।

হালদার কাঁদিয়া উঠিলেন—কেন এমন ক'রলে? ওদের নিয়ে আমি কেমন ক'রে থাকবো?

—সারাজীবন পুড়ে মরার চেয়ে একদিনের পোড়াই ত ভাল।

হালদার কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—তাই বলে এমন ক'রে!

হালদারপত্নী কি যেন বলিতে চাহিলেন কিন্তু পারিলেন না,—অস্ফুট শব্দ বাহির হইল—উঃ।

*

দুইদিন পরে সংবাদপত্রে হালদারের 'প্রেম ও বিবাহ' পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হইল। সমালোচক লিখিয়াছেন—

বর্তমান নীতি ও সংস্কারের মূলে প্রবল আঘাত হানিয়া ডাঃ হালদার তাঁহার এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। সত্য হোক মিথ্যা হোক তাঁহার এই পুস্তক যুগান্তর আনিবে তাহাতে সন্দেহ নাই—প্রচলিত সমস্ত কল্পনা ও রোমাণ্টিক আইডিয়াকে ধূলিসাৎ করিয়া তাঁহার আদর্শবাদ হিমালয়ের মত অভ্রভেদী শির উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়াছে! এই যুগান্তকারী পুস্তক একমাত্র ডাঃ হালদারের মত পণ্ডিতের নিকটেই আশা করা যায়।

আরও অনেকে লিখিয়াছেন—হালদারের এই নূতন আদর্শবাদ সভ্যতাকে জয়যাত্রার পথে চালিত করিবে। কালের কোলে এ পুস্তক প্লেটোর রিপাব্লি-কের মত অক্ষয় অমর হইয়া রহিবে...ইত্যাদি।

সেই সংবাদপত্রেরই অন্যপ্রান্তে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল—বিখ্যাত দার্শনিক ডাঃ হালদারের পত্নীর বস্ত্রাঞ্চলে অকস্মাৎ রান্নার চুল্লি হইতে আগুন লাগিয়া যায় এবং তাঁহার শরীরের বহু স্থান দগ্ধ হইয়া যায়। তাঁহাকে... হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় কিন্তু কল্য সকাল সাতটায় তিনি ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন।

সম্পাদকীয় স্তম্ভে ডাঃ হালদারের এই শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করা হইয়াছে।

*

চন্দনা স্টুডিও হইতে নিজেই মোটর চালাইয়া বাড়ি ফিরিতেছিল। মাঠের ধারে একটা ট্রামস্ট্যাণ্ডের নিকটে মানবেন্দ্রের মত একটি লোক যেন একখানা বই হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নিকটবর্তী হইয়া চন্দনা দেখিল, সে ভুল করে নাই, মোটর থামাইয়া সহাস্যে কহিল—আপনাকে বাসায় পৌঁছে দিতে পারি কি?

—পারেন, ট্রাম লাইনে কি যেন দুর্ঘটনা হ'য়েছে। ট্রাম ত আসে না।

চন্দনার পিছনের সিটে ড্রাইভার বসিয়াছিল, চন্দনা দরজা খুলিয়া মান-

বেন্দ্রকে পাশে বসিতে ইঙ্গিত করিল। মানবেন্দ্র কোন কথা না বলিয়াই বসিয়া পড়িল।

চন্দনা কহিল—কেমন যেন একটু বিমর্ষ মনে হচ্ছে?

—হ্যাঁ, মনটা সত্যিই ভাল নয়। একটি অপরিচিতা এবং মৃত মহিলার জন্যেই মনটা এমনি হ'য়ে উঠেছে, কিছুতেই রোধ ক'রতে পারছি নে।

—বইটা কি?

মানবেন্দ্র বইখানা আপত্তি না করিয়াই দিয়া দিল। ডাঃ হালদারের লেখা 'প্রেম ও বিবাহ'।

চন্দনা কহিল—বই বেরুতে না বেরুতেই পড়া হ'য়ে গেছে!

—হ্যাঁ।

—ডাঃ হালদারের স্ত্রী আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন বোধহয় পড়েছেন?

—পড়েছি।

—তাঁকে একটু সহানুভূতি জানিয়ে আসাটা কি উচিত নয়?

—ভদ্রতা বটে, কিন্তু তাতে লাভ নেই। আপনারা সকলে মিলে সেই ভদ্রমহিলাকে পুড়িয়ে মারলেন। আপনি জানেন না, আপনার মোটরের কাদাজল কতদূর পর্যন্ত ছিটে যায়—আর তা কতদূর অনিষ্টকর।

মানবেন্দ্র ব্যথিতভাবে চুপ করিল।

—আমিও?

—হ্যাঁ। আপনি জানেন না।

মোটর আসিয়া ডাঃ হালদারের বাড়ির দরজায় থামিল। চাকর চন্দনাকে চিনিত, সে কোনরূপ প্রশ্ন না করিয়াই তাঁহাদিগকে উপরে লইয়া গেল। আজ এ বাড়িতে পর্দার কোন প্রয়োজনই নাই। সন্ধ্যা হইতে এখনও অনেক বাকি আছে, তবুও গৃহের মাঝে অন্ধকার যেন পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। দোতলার বারান্দায় সদ্যমাতৃহারা শিশু দুইটি কি লইয়া যেন খেলা করিতেছে—কি সম্পদ হারাইয়াছে, কেন হারাইয়াছে তাহা তাহারা জানে না।

একখানা ইজিচেয়ারে বসিয়া ডাঃ হালদার কি যেন পড়িতেছিলেন। চন্দনাকে দেখিয়াও কোনরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিলেন না। সংক্ষেপে উভয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন—বসুন।

চন্দনা কি বলিবে বুঝিয়া পাইল না। অত্যন্ত সন্তর্পণে প্রশ্ন করিল—কেমন ক'রে আগুন লাগলো ?

হালদার বলিলেন—জানি না। হঠাৎ শুনলাম চাকরটা চেঁচাচ্ছে, তারপর যখন গেলাম তখন তাঁর কথা বলবার মত অবস্থা নয়, তারপর—

হালদারের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল, তিনি চুপ করিলেন। চন্দনা সহানুভূতি জানাইতে কহিল—ভগবানের উপরে মানুষের হাত নেই। যে শাস্তি, যে দুঃখ দেবেন তা সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করতেই হবে। জগতে এমন কে আছে যে শোক পায় নি ?

মানবেন্দ্রের উদ্ধত রক্তাক্ত দুইটি চক্ষুর দিকে চাহিয়া চন্দনা যেন ভয়েই থামিয়া গেল। মানবেন্দ্র কহিল—জীবনে যাকে স্বীকার করেন নি, আজ দুঃসময়ে সমস্ত দোষ তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে অবিচার করবেন না। আগুনটা হঠাৎ লাগে নি, তিনি নিজের গায়ে নিজে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

হালদার বলিলেন—তার মানে ?

—মানে নেই। সেইটে সত্য ঘটনা।

হালদার কহিলেন—মানবেন্দ্রবাবু, অপনার বহু কথা শুনেছি, আজ দুঃসময়ে না হয় আপনার নিষ্ঠুরতার পরিচয় আর নাই দিলেন ?

—আমি নিষ্ঠুর, আর আপনি আপনার মহত্বের প্রচণ্ড আঘাতে এই ভদ্র-মহিলাকে হত্যা করেছেন। অরাজক রাজ্যে বিচার থাকলে আপনার ফাঁসি হওয়া উচিত।

—আমি হত্যা করেছি ?

মানবেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল, অনুত্তেজিত কণ্ঠে কহিল—হ্যাঁ, আপনি হত্যা করেছেন। নিজে আগুন দিয়ে নয়, আগুন দিতে প্ররোচিত করে। আপনার ফিলজফির দোহাই দিয়ে তিলে তিলে আপনি তাঁকে হত্যা করেছেন। আমি বলেছিলাম—আপনি যখন আপনার ফিলজফিতে বিশ্বাস করেন তখন আপনি মানুষ খুন করতে পারেন। পারেন নয়—আপনি আজ হত্যা করেছেন। আপনার পাণ্ডিত্য আর ফিলজফি এতদিনে জয়যুক্ত হয়েছে।

হালদার অসহায়ভাবে বলিলেন—আজকার দিনে এ কথাগুলো না বললেই কি নয় ?

—না, এর সময় আর নেই। হাতের বইখানা দেখাইয়া মানবেন্দ্র কহিল—এই ছাইভস্ম লিখে আপনি আজ যে খ্যাতি অর্জন করেছেন তা ঐ জীবন-মূল্যে, তা আপনি জানেন। এর প্রতি অক্ষর সেই ভদ্রমহিলার জীবনরক্তে লাল হয়ে জ্বলছে। আর চন্দনা নিঃশব্দে বসে সেই অনুলেপন দেখেছে—ছিঃ ছিঃ! আপনার স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ ক'রে ক'রে আপনি তাঁকে পাগল করে দিয়েছিলেন, সেকথা স্বীকার করবার সৎসাহস আপনার নেই। আপনার নিজের ভীরু ব্যভিচারী মন নিয়ে অন্যের অন্তর আপনি বিচার করতে চেয়েছেন এতবড় আপনার ধৃষ্টতা। আর সেই ব্যভিচারী মনের দুঃস্বপ্নেও বোঝা চাপিয়ে আপনি সভ্যতার জয়যাত্রা করতে চেয়েছেন। আপনি জানেন, মানুষ যদি মানুষ হ'ত, তবে এই বই আর আপনার এই পাণ্ডিত্যের দুঃসহ প্রকাশকে টুঁটি চেপে বন্ধ করত।

মানবেন্দ্র ডাঃ হালদারের বইখানা টেবিলের উপরে ফেলিয়া দিয়া দ্রুত-পদক্ষেপে যেন অশ্রু গোপন করিতেই চলিয়া গেল। চন্দনা অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল—এই সদাপ্রশান্ত লোকটির এমনি ব্যবহার সে ইতিপূর্বে দেখে নাই। মানবেন্দ্র এমন অবস্থায় এমনি কথাগু'লি প্রশান্তচিত্তে বলিতে পারে—এ যেন স্বপ্নাতীত।

হালদার মাথা নত করিয়া কি যেন ভাবিতেছিলেন। ঘরের মাঝে একটা বেদনার্ত শুব্ধতা অন্ধকারের মত বাসা বাঁধিয়াছে। হালদারের চোখ দুইটি জলে ভরিয়া গিয়াছে। চন্দনা ধীরে ধীরে কহিল—ডাঃ হালদার, এ দুঃখে কেমন করে সান্ত্বনা দিতে হয় জানি না। তবে আপনি বলেছেন আমার ওখানে গিয়ে আপনি আনন্দ পান, চলুন আমার ওখানে যাই। যদি এ দুঃখে বিন্দুমাত্র সান্ত্বনা দিতে পারি নিজেকে ধন্য মনে করবো।

হালদার কোন জবাব দিলেন না। কিছুক্ষণ অনির্দিষ্টভাবে এদিক ওদিক চাহিয়া তারপরে কহিলেন—একদা আপনার আকর্ষণ সত্যই এত প্রবল ছিল, আপনার সান্নিধ্যে এত আনন্দ পেয়েছি কিন্তু আজ যেন সবই ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। আজ মনে হয় সবই ব্যর্থ। আপনার প্রয়োজন যেন জগতে আজ ফুরিয়ে গেছে—আমার স্বপ্ন মুহূর্তে তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়েছে। বড় প্রয়োজন হয়েছে আজ ওদের—যারা আজ বারান্দায় বসে পুতুল খেলছে, মা-হারা হ'য়েও ওরা বোঝে নি কি হারিয়েছে।

হালদারের কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া উৎসারিত অশ্রু গণ্ড বাহিয়া পড়িতে লাগিল। চন্দনা বেদনায় অভিমানে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল—তাহার রূপ যৌবনের প্রয়োজন, যা কালও এত মোহময় ছিল তার আজ কোন প্রয়োজন নাই, ওই ক্রন্দনরত লোকটির জীবনে।

*

মিস্ বসু সেদিন সন্ধ্যার পূর্বে ডাঃ সেনের নিমন্ত্রণে তাঁহার বাড়িতে গিয়াছিলেন। চা'পানান্তে আদিত্যবাবুর বাড়িতে আসিবার কথা ছিল। ভিতরে ডাঃ সেনের পড়িবার কক্ষে উভয়ে বসিয়া কথা হইতেছিল। ডাক্তারের কনিষ্ঠ পুত্র সবেমাত্র একটু একটু হাঁটিতে শিখিয়াছে। দিগম্বর ক্ষুদ্র মানবকটি সেনের একটা জুতার ফিতা ধরিয়া টানিতে টানিতে আসিতেছিল এবং আপন মনে- বা-বা, মা-মা কহিতেছিল। টাল সামলাইতে না পারিয়া অকস্মাৎ পড়িয়া গেল কিন্তু কাঁদিল না, দুইটিমাত্র শুভ্র দাঁত বাহির করিয়া মিস্ বসুর দিকে চাহিয়া হাসিল। তাহার পর নানারূপ অঙ্গভঙ্গি করিয়া দুরারোহ চৌকাঠ পার হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। মিস্ বসু উঠিয়া যাইয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন—এসো।

সে 'উ' করিয়া জুতাটাকে দেখাইয়া দিল, অর্থাৎ তাহার আসিতে আপত্তি নাই কিন্তু জুতাটাকে আনিতে হইবে। মিস্ বসু জুতাটকেও আনিয়া দিলেন, সে পরমঃ জুতাটাকে টানিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং নিজের অভিনব কলা-কৌশল প্রদর্শন করাইয়া অতিথিজনকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল। মিস্ বসু সবিস্ময়ে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলেন—বহুবার আছাড় খাইয়াও এই পুরুষ-পুঙ্গব কোনরূপেই নিরুৎসাহ হয় নাই।

সেনপত্নী চা ও কিছু খাবার লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন কিন্তু দুই এক পা আসিতেই পুত্র সজুতা তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—মাম্মা—হিঁ হিঁ।

তিনি হাসিয়া কহিলেন—ছাড়্ ছাড়্—কিন্তু পুত্রের ছাড়িবার কোনরূপ ইচ্ছা দেখা গেল না। সেনপত্নী কহিলেন—ধর ত গো, সব পড়ে যাবে। কি দুষ্টু ছেলে!

ডাঃ সেন হাত হইতে চা প্রভৃতি লইয়া টেবিলে রাখিলেন। মা নিরুপায় হইয়া চাবির গোছাটিকে পুত্রের হাতে দিলেন, সে পরমানন্দে তাহা বাজাইয়া

ফিরিতে লাগিল, নূতন খেলায় মায়ের কাছে কি চাহিয়াছিল তাহা ভুলিয়া গেল। তিনি মিস্ বসুর নিকটে আসিয়া বলিলেন—চা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।

—তাই ব'লে এত?

—এত আর কি? সামান্যই ত।

—আপনার।

—ও বাবা, রাবণের গুষ্টির জন্যে, আমার কি একবিন্দু দাঁড়াবার উপায় আছে? এক্ষুনি তিননম্বর ফৌজদারী হবে—দেখলেন ত সামনে ই।

ডাঃ সেন পরিহাস করিলেন—তা হ'লে রক্ষশ্রেষ্ঠ রাবণটা আমি? আমি রাক্ষস!

—সে কথা মিথ্যে নয়, চা'টুকু পর্যন্ত তৈরি করবার যো নেই, সকলেই কাপ পেতে দুর্ভিক্ষপীড়িতের মত এসে বসে।

ডাঃ সেন পুনরায় কহিলেন—মাতৃগুণের অধিকারী কি এরা একেবারেই হয় নি?

স্ত্রী চট্ করিয়া জবাব দিলেন—হ'য়েছে, ছাখো না খোকন কেমন খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে।

চা পান চলিতেছিল, সেনপত্নী চিনি প্রভৃতি দিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন, অকস্মাৎ দেখা গেল ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়াছে, চা'র টেবিলটা সবেগে নড়িতেছে এবং সরিয়া যাইতে চাহিতেছে। অনুসন্ধানে জানা গেল খোকা টেবিলের পায়ার সঙ্গে জুতা বাধাইয়া দিয়া প্রবলবেগে টানিতেছে কিন্তু জুতা তবুও যায় না।

মিস্ বসু খোকনের প্রাণান্ত শ্রম দেখিয়া হাসিলেন এবং জুতাটাকে ছাড়াইয়া দিলেন। জুতা নৌকার মত গুণে চলিল, এবং তাহার মধ্যে চাবির গুচ্ছ বাজিতে লাগিল। খোকন পুলকিত হইয়া মাকে তাহার অভিনব কৌশল দেখাইতে ডাকিল—হা ম্মা—মা।

চা-পানান্তে উভয়ে বাহির হইতেছিলেন। সেনপত্নী কহিলেন—তোমার ফিরতে রাত্তির হবে?

—কেন?

—বলো না!

—না রাত্তির আর হবে-কেন।

—তবে কিছু টাকা নিয়ে যাও, কিছু শার্টের ছিট এনো, ওদের জামা তৈরী ক'রতে হবে।

—ও সব আমি পারি নে।

সেনপত্নী হাসিয়া কহিলেন—বেশ, তবে আমি বাজারে যাবো নাকি? ডাঃ সেনের মতামত উপেক্ষা করিয়া একখানা দশ টাকার নোট তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন—দশ গজ, একটু পছন্দ ক'রে এনো।

ডাঃ সেন নোট লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। মিস্ বসু চলিতে চলিতে ভাবিতেছিলেন—খোকনের অর্থহীন কলাকৌশল ও বচনের কথা। মনটাকে যেন সহসা ভারী করিয়া দিল। আর এই রক্ষোরাজ সদৃশ ডাঃ সেন, যাঁহার প্রতাপে ছাত্রকুল আতঙ্কিত, তাঁহার সমস্ত প্রতিবাদ মতামত উপেক্ষা করিয়া আদেশ আসিল ছিট কিনিতে হইবে এবং তাহা অচিরেই, এবং আজ রাত্রি-যোগেহ করিতে হইবে। মিস্ বসু মনে মনে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিলেন—এমনি কেহ তাঁহার নাই যাহাকে আদেশ, অনুরোধ করা যায়, যে নিরাপত্তিতে তাহা করিবে।

মিস্ বসু কহিলেন—আপনার সনাতনপন্থী গৃহ দেখলাম, বাবাঃ এই চিরন্তন ভূমিকম্পের মাঝে বাস করেন কি ক'রে? ও রকম দু'টি খোকন থাকলে ত তিনজন লোক চাই তার পিছু।

—আজ্ঞে, ও রকম এবং এর চেয়ে বড় মোট ' টি এবং তা গৃহিণী দশভুজার মত একাই রক্ষা ক'রছেন।

মিস্ বসু হাসিয়া কহিলেন—আর একটা জিনিস দেখে সত্যই হাসি পায়, প্রবলপ্রতাপ ডাঃ সেন একেবারে বিনয়ী বাহনের মত ছিট কিনতে রাজি হ'লেন—কোন প্রতিবাদ ক'রবার সাহসই হ'ল না!

—আমি কেন? গভর্নমেন্টও গৃহবিপ্লবকে ভয় করে। আপনারা স্বাধীনতা চান—কিন্তু আপনারাই ত সত্যিকার স্বাধীন। দেখুন আজ রাত্রিতে ছিট আমাকে কিনতেই হবে, ব্যতিক্রম নেই; তাই নয় তাঁর আদেশ, টাকা ও পছন্দ মত। পরাধীন ত আমরাই।

মিস্ বসু ভাবিলেন—যদি স্বাধীনতা কিছু থাকিয়াই থাকে তবে সেনপত্নীর, তাঁহার নয়। এমন করিয়া আদেশ দিবার অধিকার তাঁহার নাই, যাহা করিতে

হইবে তাহা নিজেকেই। এই সর্বময়ী কর্ত্রীর আসন তাঁহার নয়। তিনি তাই বলিলেন—তাঁরা স্বাধীন হ'লে ছিট ত নিজেই দোকানে গিয়ে পছন্দ মাফিক কিনতে পারতেন!

ডাঃ সেন হাসিয়া কহিলেন—পারতেন, কিন্তু দাসীত্বটাও থাকতো সঙ্গে সঙ্গে। মাসের শেষে ত ব'লতে পারতেন না যে তুমি কতকগুলো জামাকাপড় কিনে টাকা ফুরিয়ে ফেল্লে এখন আমি সংসার চালাব কি ক'রে?

উভয়েই হাসিয়া উঠিলেন, কিন্তু মিস্ বসুর অন্তর ব্যথিত হইয়াই রহিল। তিনি প্রতিবাদ করিলেন—কিন্তু ঐ বদ্ধঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে সারাজীবন কাটিয়ে দেওয়া—উঃ কি একঘেয়ে!

—একঘেয়ে! ঐরকম দু'গণ্ডা খোকা থাকতে একঘেয়ে! নিত্য নূতন রকমের মারামারি, নালিশ, ফৌজদারী, জখম—

মিস্ বসু কথা কহিলেন না—আনমনেই পথ চলিতে লাগিলেন।

*

তখন বেলা দ্বিপ্রহরে কলেজে যাইতেছিল। পিতার কক্ষের সম্মুখের বারান্দা দিয়াই সিঁড়িতে যাইতে হয়। কলেজে যাইবে না স্থির করিয়াছিল কিন্তু হঠাৎ মতের পরিবর্তন হইয়াছে, তাই চলিয়াছে।

পিতার ঘরের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় যেন একটা অস্পষ্ট কাতরোক্তি ও একটা ধস্তাধস্তির শব্দ তাহার কানে গেল। কৌতূহলী হইয়া সে কোনও একটা ছিদ্র খুঁজিতে লাগিল—একখানা দরজার পাখির এককোণ ভাঙ্গা ছিল, সেই ছিদ্রপথে বহু কষ্টে ঘরের এক অংশ দেখা যায়! কিছুই দেখা যায় না, তবুও কাতরোক্তির শব্দটা আসিতেছে। তাহার মাতার শরীরের কিয়দংশ দেখা যায়। তাহার সঞ্চালন দেখিয়া মনে হয় তিনি যেন যাতনা ভোগ করিতেছেন—পিতাকে একবার দেখা গেল তিনি যেন হাসিয়া হাসিয়া কি দেখিতেছেন। অথচ কাতরোক্তিটা স্পষ্টতর হইয়াছে—এবং এ কণ্ঠ তাহার মাতারই। এখন স্পষ্ট দেখা গেল, তাহার পিতা ধাক্কা দিয়া মাতাকে শয্যার উপরে ফেলিয়া দিলেন; মাতা কহিলেন—উঃ, কিন্তু আদিত্যবাবু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যেন পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে হাসিতেছেন। ব্যঙ্গ করিতেছেন—লিলিপুট—লিলিপুট—ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাও।

তপন সিঁড়ির অদূরে দাঁড়াইয়া রহিল। অব্যক্ত একটা বেদনায় তাহার হৃদয় নিষ্পিষ্ট হইতেছিল—এই নিষ্ঠুর পৈশাচিক আমোদপ্রিয়তার কর্তা তাহারই পিতা। মাতার ক্ষীণদেহ ক্রমশঃই যেন দুর্বল হইয়া যাইতেছিল—এত প্রাচুর্যের মধ্যেও একদিন কেহ তাঁহাকে সুখী দেখে নাই।

মাতা বাহির হইয়া দ্রুতপায়ে চলিয়া গেলেন—তাঁহার চোখে মুখে তেমান একটা বেদনার আভাস—যেন সবেমাত্র চোখ মুছিয়া তিনি বাহির হইয়াছেন। তপন ধীরে নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

কলেজে বসিয়া সে বার বার ঐ কথাটাই ভাবিতেছিল, আর তাহার অন্তর বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া যাইতেছিল। তাহার মাতা ত কোনদিন কোন অভিযোগ করেন নাই। বরং পিতার বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ করিলে তিনি বলিয়াছেন—ছিঃ গুরুজনের কাজের সমালোচনা ক'রতে নেই। নিন্দে ক'রবার মত মানুষ ত তোর বাবা নয়। তপন এই রহস্যকে বুঝিতে পারে না। রহস্যের অন্তরালে একটা অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া তাহার মন অশান্ত হইয়া উঠিল।

কলেজ অন্তে তপন মৃদু ও অনৈচ্ছিক পদক্ষেপে সিঁড়ি অতিক্রম করিতেছিল। রেণুকা কহিল—কি তপনবাবু! আপনাকে যেন খুব মন-মরা দেখাচ্ছে?

তপন সংক্ষেপে কহিল——হুঁ।

—আমাদের ওখানে যেতে হবে আজ, মা বলে দিয়েছেন নিয়ে যেতে।

তপন হাতজোড় করিয়া কহিল—আজ মাপ করুন, মনটা সত্যিই ভাল নেই।

—একা থাকলে মন আরও খারাপ হবে, তার বদলে চলুন আমাদের ওখানে।

—না। তপন কিছুক্ষণ ভাবিয়া কহিল—চলুন তার বদলে বেড়িয়ে আসি।

রেণুকা কহিল—বেশ চলুন।

তপন বহু পথ মোটরে অতিক্রম করিয়া আসিয়া মাঠের মাঝে একটা স্থানে থামিল। কহিল—বসুন এখানে, গল্প করা যাক।

রেণুকা কহিল—আপনার সঙ্গে কথা ব'লতে ভয় হয়। সেদিন আপনার

মা'র সাম্‌নে যেন দম ছুটে মরি। কি ব'লতে কি বলব, তাই চুপ করেই ছিলাম। তাঁরা কি বলেছেন আমার কথা?

তপন হাসিয়া কহিল—সে অনেক।

—কি কি? তবুও বলুন দেখি। নিন্দে করেছেন ত?

—একেবারে নির্জলা প্রশংসা করিনি, সে কথা সত্যি। যেমন ধরুন আপনি আমাকে মাঝে মাঝে বড় কষ্ট দেন।

—যথা?

—যেদিন মনে করি আপনি আস্‌বেন, আলাপ ক'রবেন, সেদিন আসেন না।

—আজও কি ঐ রকম কারণেই মন খারাপ?

—না। তপন কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া থাকিয়া কহিল—না সেজন্যে নয়।

—তবে?

তপন কিছুক্ষণ ভাবিয়া কহিল—আমার মায়ের জন্য বড় কষ্ট হয়! সংসারে কিছুরই অভাব নেই, তবুও মা যেন কেন অসুখী। কিছুই বুঝ্‌তে পারি না—সেই মায়ের কোন ইচ্ছাকে বাধা দিতে পারিনে—তাঁকে ক্ষুণ্ণ ক'রতে পারি নে।

—সেইদিন সেই জন্যেই বুঝি অমন নিবেদন জানিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ, সত্যিই তাই। মা আমার বিয়ে দেওয়ার জন্যে জিদ ধ'রেছেন।

—সে ত ভালই। সে শুভদিনের বিলম্ব ক'রে কি লাভ। একটা বড় রকমের ভোজ হবেই নিশ্চয়।

— কিন্তু, আজ আমার মন নিয়ে ত যাকে তাকে বিয়ে করা যায় না।

—কেন? মনে আবার পোকা ধ'রেছে নাকি?

তপন হাসিয়া কহিল—সত্যিই তাই। মা যখন ব'ল্‌লেন মেয়ে দেখবেন, আমি বললুম অত কষ্ট ক'রে কাজ নেই, আমিই বরং দু'চার জনকে আনি, তার মধ্যে যাকে হয় পছন্দ ক'রে ফেল। তাই আপনাদের ধ'রে নিয়ে গিয়েছিলাম।

রেণুকার উজ্জ্বল মুখখানা সহসা আরক্তিম হইয়া উঠিল—শরীরের সমস্ত রক্ত যেন সহসা মুখে আসিয়া পুঞ্জীভূত হইয়াছে। সে বহু চেষ্টায় কহিল—ফাঁকি দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, তা হ'লে?

—না, মা'র অনুরূপ আদেশ সত্যই ছিল।

—তিনি কি ব'ললেন ?

তপন কহিল—বাবা যা বলেছেন তা স্বকর্ণেই শুনেছেন, মা'র মত বাবারও মতের অনুগামী। আমার মত অবান্তর তবে এইটুকু বলতে পারি—

তপন সহসা থামিয়া গেল। রেণুকা মাটির দিকে আনত চোখে চাহিয়াছিল কিন্তু তাহার দ্রুত শ্বাস পতনের শব্দে স্পষ্ট বোঝা যায় তাহার মধ্যে একটা ঝড় চলিয়াছে। অনেকক্ষণ পরে রেণুকা কহিল—থামলেন যে!

—নির্ভয়েই বলি, আমার পক্ষে একমাত্র আপনি ছাড়া দ্বিতীয় কোন মেয়েকে বিবাহ করা সম্ভব নয়। যে দিন আপনার সঙ্গে পরিচয় হয় নি সেদিনও কোন্ অদৃশ্য আকর্ষণ যেন আমাকে আপনার দিকে টানছিল, এ কথা হয়ত বিশ্বাস করা কঠিন কিন্তু সব সত্যি ঘটনাই ত সাধারণ নয়।

রেণুকা কথা কহিল না, আনত দৃষ্টি তপনের মুখের উপরে ক্ষণিকের জন্য তুলিয়া আবার নতমুখী হইল। একটা ঝড় যেন বহিয়া গিয়াছে, তাহার পর শান্ত প্রকৃতি সন্ধ্যার রক্তিম আলোয় স্বর্ণময় হইয়া উঠিয়াছে। তপন কহিল—সম্ভবত আমাদের অগোচরে বাবা ও আপনার বাবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও চ'লছে।

রেণুকা কহিল—জানি।

—সেই জন্যেই বুঝি আজ বাড়ি নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল ?

রেণুকা কহিল—হ্যা। এবং অকারণেই হাসিতে লাগিল।

তপন তাহার হাতখানি তুলিয়া লইয়া কহিল—বেশ, কেমন আমিই জানি না কি হ'য়েছে! আপনি তখনই—আপনাদের বাড়িতে গিয়ে হয়ত কি কাণ্ডটাই হ'তে হ'ত।

রেণুকা প্রশান্ত চোখে চাহিয়া কহিল—আমরা বুঝি কেবল মানুষ জব্দ করি!

—ইতি শ্রুয়তে। দ্বিপ্রহরের সমস্ত বেদনা যেন সহসা ডাবিয়া গিয়া অন্তরাকাশ প্রভাতের আলোয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

কয়েকদিন পরে ভগবতী মানবেন্দ্রের ঘরে আসিয়া কহিল—শুনেছেন বোধ হয় ?

—কি ?

—দাদার বিয়ে ঠিক হয়েছে। ঐ সেদিন যে দু'টি মেয়ে এসেছিল তার একটি—রেণুকা।

—কোন্‌টি ?

—ঐ বেশ স্বাস্থ্যবতী, লম্বা চেহারা, মুখখানা একটু ভারী। কেমন ? তাঁকে পছন্দ হয় ? সেই ভাল না মণিকাই ভাল ?

—দুইই ভাল।

—কিন্তু দু'জনকে ত আর বিয়ে করা যায় না।

—যায়, এবং তাই করাই উচিত, নইলে নিস্তার নেই।

—বেশ। নিস্তার নেই মানে ? দু'জনকে বিয়ে ক'রলেই বা তারা রাজি হ'বে কেন ?

—রাজি তারা হবে না, অথচ দু'জনকেই বিয়ে করা দরকার। এই ত জগতের সমস্যা, তাই ত তপনবাবুর নিস্তার নেই।

—সে কি !

মানবেন্দ্র হাসিয়া কহিল—সত্যিই তাই।

খবরের কাগজটা তুলিয়া ধরিয়া কহিল—এই খবরটা পড়েছেন ? ডাঃ দত্ত দেশের কাজে নেমেছেন। মেদিনীপুর বন্যাপীড়িত অঞ্চলে চিকিৎসার্থ শিষ্য-সেবক ঔষধপত্র নিয়ে গেছেন।

—ভালই ত।

—হ্যাঁ ভাল; কিন্তু তিনি গেছেন নিজের গরজে কারণ তাঁর না গিয়ে উপায়ান্তর নেই। এই ধর যেমন হরিচরণের আত্মহত্যা না ক'রে উপায় ছিল না, হালদারপত্নীর পুড়ে মরা ছাড়া গতি ছিল না, লাহিড়ীর বিয়ে না ক'রলে নিস্তার ছিল না, হালদারের বই না লিখে উপায় ছিল না, সেই রকম তপনকুমারেরও দুইজনকে বিবাহ করা ছাড়া উপায় নেই।

—কেন ?

—সে অনেক কথা। বুঝতে চেষ্টা করাও বৃথা, তবে তার জন্যে তপনবাবুকেও দোষ দেওয়া যায় না, রেণুকা মণিকাকেও দোষ দেওয়া যায় না—সংঘাত অনিবার্য তাই পরিত্রাণ নেই আমাদের কারও। যেমন হরিচরণের হাতে তোমার নিস্তার ছিল না, কিন্তু হরিচরণ ভেঙেছে তাই তুমি আজও আছো,

হরিচরণ যদি থাকতো হরিচরণের অবস্থা হ'তো তোমারই। জগতে এইটেই সবচেয়ে বড় বিপদ যে, মানুষ অন্য জীবকে না মেরে পথ চলতে পারে না। তাই তোমার বাবার চিড়িয়াখানায় মারামারি, উপরের আড়ড়য়ও বচসা, কটু কটাক্ষ। এর প্রতিকার কে করবে?

তপতী কহিল—মণিকাকে সেদিন ও কথা ব'ললেন কেন? তার মত মেয়ে আর হয় না।

—হয়, কদাচিৎ, কারণ তার মধ্যে ডুববার এবং ডুবাবার ক্ষমতা আছে। তাই সে ভয়ানক। ইচ্ছে ক'রলে সাপের মত নিজেকে দংশন ক'রে মারতে পারে, প্রয়োজন হ'লে অন্যকেও পারে। বিষধর সাপ দেখলে তাকে ভয়ানক ব'লবো না—মানবেন্দ্র হাসিয়া উঠিল।

তপতী বহিল—কি যে হাসেন আপনি কিছুই বুঝি না।

মানবেন্দ্র কটাক্ষ করিয়া কহিল—যা বুঝি নে সেই খারাপ, না? দু'পৃষ্ঠা পড়াশুনো ক'রে ওই রকম ধারণাই হয় বটে কিন্তু বেশি জানলে নিজের অজ্ঞতা যেন বেশি ক'রে ধরা পড়ে। তার পর মেয়েমানুষ—বুঝবার প্রণালীটাও একটু স্বতন্ত্র—যতই দেখছেন ততই আমার হাসিটা যেন বেশি দুর্বোধ্য মনে হয় না?

তপতী সহাস্যে কহিল—কেবল আমার কাছেই বুঝি, সকলেই ত বলে!

—সকলেই যখন এ বিষয়ে একমত তখন আমার অমতটা গ্রাহ্য হবে কেন? ডিমোক্রেসির যুগ।

তপতী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—আপনি কি নাকি চন্দনার সঙ্গে অভিনয় ক'রবেন ঠিক করেছেন?

—ক'রবেন কেন ক'রছেন।

—আপনি ত বেরোন না, তবে আবার স্টুডিওতে যান কখন্?

মানবেন্দ্র হাসিয়া কহিল—হাঁ, ঘেরাটোপবন্ধ হলাম বটে; কিন্তু আমি যদি অভিনয় করিই তবে তোমার আপত্তির কি কারণ আছে! ব্যাপারটা তোমার কাছে এত পীড়াদায়ক মনে হয় কেন?

—সত্যি কথা ব'লতে কি, আপনি সিনেমায় অভিনয় করেন এটা আমার পছন্দ নয়। তাতে যেন আপনার মত মানুষের অপমান হয়।

মানবেন্দ্র হো হো করিয়া খানিক হাসিয়া কহিল—এই আপো মানুষের দোষ। তোমার পছন্দ মত কাজ ক'রবে আর একজন আর তাতে সুখী হবে

তুমি, নইলে দুঃখ পাবে ; কিন্তু জগতে সকলেই ত অমনি নিজের ইচ্ছামত আর একজনকে বা বহুজনকে চালাতে চাচ্ছে—তাই চলে না বলে দুঃখ। এই মানুষের মন কখনও সুখী হ'তে পারে—আমার অপমানটা আমার চেয়ে যেন তোমারই বেশি পীড়াদায়ক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

—যদি হয়ই তবে নিরুপায়, দুঃখই পেতে হবে।

—সকলেই অমনি নিরুপায়, তপনবাবুও দু'টি বিয়ে না করলে নিরুপায়, আমি সিনেমায় অভিনয় না ক'রলে নিরুপায়, অভিনয় ক'রলে তুমি নিরুপায়। মানুষের মনগুলো যেন এজগতে কেবল ঘুসোঘুসিই ক'রতে এসেছে। জগৎটা আমার যুক্তিমত, ইচ্ছামত চলে না বলে অভিমান করাটা তাই সবচেয়ে বড় বোকামী।

তপতী কহিল—তবুও এই ইচ্ছা যে হয়ই এটা ত সত্য। তা নিরোধ করবার কোন উপায় যখন নেই তখন ঘুসোঘুসি একটু ত হবেই—দুঃখও হবেই।

—হবেই সেকথা খুবই সত্যি, কিছু হ'ত না যদি মানুষ তার নিজের মনটাকে স্বচ্ছজলের নীচে বালুকাময় তলদেশের মত স্পষ্ট দেখতে পারতো।

—তা ত আর দেখা সম্ভব নয়।

—সম্ভব। তবে সাধনা চাই—সে সাধনা জন্মজন্মান্তর বসে করতে হয়।

—জন্মজন্মান্তর যদি লাগেই তবে কয়েকটা জন্ম ত এমনিভাবে যাবেই।

—হ্যাঁ যাবেই, কাজেই হাসি পায়। ছেলেপুলের পুতুলখেলা দেখ্‌লে যেমন বড় মানুষে হাসে, তেমনি অন্যের মনকে যে দেখ্‌তে পায় সে হাসে, সে জানে ভালবাসা প্রেম, ইচ্ছা অনিচ্ছা এসবই মানুষের একান্তই অবস্থাগত এবং অর্থহীন।

তপতী প্রশ্ন করিল—আপনি সিনেমায় অভিনয় ক'রবেন, এটা আমার অপছন্দ কেন ব'লতে পারেন ?

—অবস্থাগত। হরিচরণ বেঁচে থাক্‌লে হয়ত এমন অপছন্দটা হ'ত না এইটুকু ব'লতে পারি।

—আপনি কি মনে করেন, হরিচরণকে আমি ভালবাসতাম ?

মানবেন্দ্র হাসিয়া কহিল—আবার হাসালে, মানুষ কি কখনও নিজে ইচ্ছে করে বিচার করে ভালবাসে ? কতকগুলো ক্ষেত্র এবং লোক আছে যাদের ভালবাসতেই হবে। যেমন ধর, বাজারে হরেক রকম শাড়ি আছে, তুমি যাকে কদর্য বলে পছন্দ করলে না সেটা আর একজন অত্যন্ত পছন্দসই বলে কিনে

ফেললে। এখানে তোমার মন এবং শাড়িখানার অবস্থাভেদে বিরোধ হ'য়েছে কিন্তু আর একজনের হয় নি। মানুষও তেমনি, ঠিক অবস্থা যখন আসে তখন সে ভালবাসতে বাধ্য হয়—ঠিক লোকটি অক্টোপাশের মত তাকে টেনে অতলে তলে নিমজ্জিত ক'রে দেয় এবং সে নিরুপায় হ'য়ে ডুবে যায়—কাজেই আমি তুমি অবান্তর, ঐ অবস্থাটাই আসল, আমরা নিমিত্তমাত্র। যেমন ধর, রেণুকা ও মণিকা অক্টোপাশের কাজ ক'রছে তপনবাবুর উপর!

—এ অবস্থাটা কি তা কি বোঝা যায় না?

—না। প্রত্যেকের চেহারা যেমন আলাদা, অবস্থাটাও তেমনি আলাদা। দত্ত দেশসেবা ক'ছেন, অনুরূপ অবস্থায় একজন হয়ত মাতাল হ'তে পারতো, বদমাইস্ হ'তে পারতো, চোর হ'তে পারতো—সম্ভাবনা অনেক কিছুই ছিল এবং দত্ত বলেই সেটা দেশসেবায় পরিণত হল, হালদার হ'লে হয়ত ফিলজফির বই হ'ত, অল বাবু হ'লে হয়ত কাব্য হ'ত—এমনি। যেমন তোমার অপছন্দ আমি অভিনয় করি, চন্দনার ইচ্ছা আমি অভিনয় করি। একই ব্যক্তি আমি, আমার স্বাধীন সত্তা সেই ধ'রে নিলেও দেখা যাচ্ছে বিরোধ হচ্ছে। আমি অভিনয় করলে যেমন তুমি অনেক কিছু করতে পার, না করলে তেমনি চন্দনা অনেক কিছু করতে পারে। তা কাব্য, সাহিত্য, শিল্প দেশসেবা সবই হ'তে পারে।

তপতী হাসিয়া কহিল—সবই বুঝেছি এখন থামুন। আর চা চাই?

—হুঁ, চাই বই কি? মিস্ বসু আসবেন অনুমান করি, একসঙ্গে চা খাওয়া যাবে।

—এত অনুমান করেন কি করে?

—কয়েক দিন আসেন নাই, হয়ত আজ রবিবার আসতে পারেন সকালের দিকে, এই—বিশেষতঃ ডাঃ সেনের বাসায় এখন মাঝে মাঝে যান।

—তা হ'লে ত এখানে আসবেনই না।

—তা হ'লেই আসবেন। সেনের গৃহ—গৃহবিপ্লব তাঁকে এখানে আসতে বাধ্য করবে।

তপতী কহিল—আচ্ছা, দেখি, কেমন আসেন।

—জ্যোতিষের কি সবই ফলে! তবে দেখতে হবে বই কি? মানবেন্দ্র হাসিয়া চুপ করিল।

*

একটু বেলা হইতেই মিস্ বসু আসিয়া কুশল প্রশ্ন করিলেন—আপনার বাতের ব্যথাটা কেমন মানবেন্দ্রবাবু ?

মানবেন্দ্র কহিল—আসুন, বেদানাটা সকালে একরকম নেই বল্‌লেই চলে, বিকালের দিকে ওটা সাধারণত বাড়ে—এবং কি রকম শুনবেন, যেন হঠাৎ আসে, হঠাৎ যায়—কখন্ আস্‌বে তার স্থিরতা নেই—মানবেন্দ্র আপন মনেই হাসিতে লাগিল। কতকগুলি মিথ্যা কথা বলিয়া সে যেন বেশ পরিতৃপ্তি পাইয়াছে।

—আপনি হাস্‌ছেন যে !

—এমনি। বাতের ব্যথাটা আমার জীবনে সত্যই হাস্যকর।

—আপনাকে মানায় না, তা সত্যি।

মানবেন্দ্র কহিল—তার পর, মিসেস্ সেনকে কেমন দেখ্‌লেন ?

—দেখ্‌লাম তাঁর সহনশীলতা প্রশংসনীয় এবং প্রতাপ অখণ্ডনীয়। ডাঃ সেন সেখানে পুতুল মাত্র—তাঁর কোন মতামতই গ্রাহ্য নয়। মিস্ বসু হাসিয়া উঠিলেন—সম্ভবত ব্যঙ্গ করিয়া।

—এক্ষেত্রে সনাতন হিন্দুপরিবারকে সাধুবাদ না দিয়ে উপায় কি ? কারণ, এই পরাধীনতার তথা নিশ্চিন্ততার উপরে নির্ভর করাটার মধ্যেও একটা আনন্দ আছে। তা হ'লে স্বাধীনতাটা ভোগ ক'রছেন মিসেস্ সেন, আর পরাধীন হচ্ছেন ডাঃ সেন ?

—অনেকটা।

—আবার দেখুন আপনি স্বাধীন। স্বাধীনতা কথাটার তা হ'লে কোন সংজ্ঞা ঠিক নেই।

মিস্ বসু একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন—আছে বই কি, কিন্তু সেটা যেন সর্বথা প্রযোজ্য নয়।

—নিজেকে কি আজ স্বাধীন মনে হ'চ্ছে ? মানুষে না করুক, সংসার শিক্ষা রুচি সব মিলে আপনাকে খানিকটা পরাধীন করে ফেলেছে।

চা আসিল কিন্তু তপতী আসিল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া নিঃশব্দেই চা পান হইয়া গেল।

মিস্ বসু অনেকখানি সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিলেন—আপনার কাছে

একটা কথা বল্‌তে এসেছি। কথাটি বলা কতদূর ঠিক হবে জানি না, তবুও বলতে ইচ্ছে করে।

—আজ সকাল থেকে বার বার আপনি আসবেন মনে হচ্ছিল, শুধু তাই নয়, বলবার মত কিছু একটা নিয়ে আসবেন মনে হচ্ছিল।

অপ্রাসঙ্গিক ভাবে মিস্ বসু কহিলেন—ডাঃ সেনের ছোট ছেলেটা কি দুষ্টু বাবা! আমরা চা খাচ্ছি হঠাৎ দেখি টেবিলে ভূমিকম্প হচ্ছে। তাকিয়ে দেখি খোকন তার পায়ে জুতো বেঁধে দিয়ে টান্‌ছে! মিস্ বসু অকারণেই ক্ষণিক হাসিয়া চুপ করিলেন।

—অমনি শিশুই ত ডাঃ সেনকে পরাধীন ক'রে মিসেস্ সেনকে স্বাধীনতা দিয়েছে।

—সত্যিই তাই: আমরা আপাত দৃষ্টিতে যা দেখি তা অনেক সময়ই ভুল—মিসেস্ সেনের প্রতাপ ও সংনশীলতা দেখে মনে হয় আমরাই পরাধীন। কলেজে পরাধীন, অর্থে পরাধীন, সমাজে কর্মের বিধানে পরাধীন।

—হ্যাঁ। এই চোখে পৃথিবীকে দেখ্‌লে লোকে মনে করে লোকটা পাগল।

মিস্ বসু আবার চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—সেদিন আপনার সঙ্গে কথা ব'লে গিয়ে চিন্তা করলুম, নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করবার ত চেষ্টা ক'রলুম। স্বীকার করলে একটু অপমানিত বোধ ক'রতে হয়, তবুও স্বীকার করছি আপনি যা বলেছেন তা সত্যিই।

—কি সত্যিই! বিবাহ করা এখন প্রয়োজন এ কথাটা বুঝ্‌তে পেরেছেন?

—না সেটার সম্বন্ধে চিন্তা করি নি, তবে সেদিন আপনাকে বলেছিলাম, নিজের সম্বন্ধে বড় বেশি বলা হ'ল নাকি? শেষে দেখলাম আপনার পক্ষে সত্যিই বেশি বলা হয় নি। আমি সত্যিই যেন অমনি একটা মানুষ আপনার মাঝে খুঁজেছিলাম।

—অমনি মানুষ অর্থে, যার উপর নির্ভর ক'রে আপনি মিসেস্ সেনের স্বাধীনতাটাকে ভোগ ক'রতে পারবেন এবং আহত জীবনে খুঁড়িয়ে চলতেও আর কষ্ট হবে না।

—প্রায়। আপনার এখানে আসবার জন্যে একটা আকর্ষণ বোধ করি, কেন ঠিক জানি না।

—কেন, তাও জানেন তবে আপনার রুচিজ্ঞান তা প্রকাশ ক'রতে বাধা দেয়।

—অসম্ভব এমন নয়, আপনার মত সকলেই ত আর সব কিছু প্রকাশ ক'রতে পারে না।

—প্রকাশ ক'রতে পারেন না বলেই জীবনটাকে দুর্বহ ক'রেছেন, নইলে সেটা অন্য রকম হ'ত।

মিস্ বসু কহিলেন—দুর্বহ যদি হ'য়েই থাকে তবে নিরুপায়, আপনারা তাকে বহনীয় ক'রতে দিলেন না এটাও সত্যি।

—আমরা অর্থে পুরুষ জাতটা; কিন্তু সে দোষটা তাদের চেয়ে আপনারই বেশি। দেখুন না, আজ যা ব'লতে এসেছেন তা কিছুতেই ব'লতে পারছেন না। কণ্ঠ পর্যন্ত এসে তারা আবার বিলীন হ'য়ে যাচ্ছে। সন্দেহ, সংশয়, সম্মান আপনাকে বিমূঢ় ক'রে দিয়েছে। পরাজিত হওয়ার মধ্যে লজ্জা নেই, চেষ্টা না ক'রে বসে থাকাটাই লজ্জাকর। পরাজিত জীবনে সকলেই একাধিক বার হ'য়ে থাকে।

—আমি কি ব'লতে এসেছি অনুমান করেন?

—আমার মুখ দিয়ে সেটা না শুনে নিজে ব'ল্লেই ভাল হ'ত না কি? তাতে আপনার দিক থেকে অন্তত চেষ্টা করার একটু অজুহাত রয়ে যেত।

—আপনার মুখ দিয়েই শুনি—আমার ত কণ্ঠ রুদ্ধ তা ত আপনিই ব'ল্লেন।

মানবেন্দ্র হাসিয়া কহিল—শুন্বেন? শুনুন, জীবনের যে নির্ভর আপনার প্রয়োজন, আপনি ভেবেছেন আমি সেই নির্ভরতা আপনাকে দিতে পারি। কেমন তাই নয়?

মিস্ বসু একটু হাসিয়া বলিলেন—বোধহয়।

—বোধহয় নয়, আপনি তাই বলতেই এসেছেন কি না স্পষ্ট করে বলুন।

লজ্জিত ভাবে মিস্ বসু কহিলেন—হ্যাঁ। আপনার মাঝেই যেন ঠিক তেমনি বস্তু আছে যা নিশ্চিন্ততা দিতে পারে। অথবা ডাঃ হালদারের মতে মনের মাঝের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু যেন আপনার মাঝেই আছে।

—কিন্তু আর একটা কথা আছে। সংসার জীবনে আমি অক্ষম, পরাশ্রিত স্বাধীন সত্তাহীন, উপার্জনহীন। হয়ত মনে ক'রে থাক্‌বেন, এমনি আশ্রয় না হয় আপনার গৃহেই নিলাম, আপনার উপার্জন মন্দ নয় কিন্তু সেখানে মস্তবড় প্রশ্ন হবে এই যে, মিসেস্ সেনের মত ঐ নিশ্চিন্ততা তথা স্বাধীনতা আপনি

পাবেন না কারণ টাকাটা পরের হ'লে যে রকম স্বাধীনতা ভোগ করা যায়, নিজের হ'লে তেমনি থাকে না। যেমন এখানে আমি যে স্বাধীনতা ভোগ ক'রছি, উপার্জন করলে সে স্বাধীনতাটা থাকৃতো না।

মানবেন্দ্র হাসিয়া উঠিল। মিস্ বসু কহিলেন—আপনার হাসি দেখে সন্দেহ হয় আপনি কথাগুলো যেন ব্যঙ্গ ক'রতেই বলেছেন।

—না, মোটেই ব্যঙ্গ নয়। অত্যন্ত সত্য, সেদিন যেমন মনে করেছিলেন আমি আপনাকে ব্যঙ্গ ক'রতেই কথাগুলো বলেছি, আজও সে রকম মনে ক'রতে পারেন; কিন্তু পরে বুঝবেন এর মধ্যে ব্যঙ্গ নেই।

—সব আমার কথাই ব'ললেন, নিজের কথা ত কিছুই ব'ললেন না। আপনার মতামতটাকে একেবারেই অপ্রকাশ্য রেখে আমাকে ব্যক্ত করাটার মাঝে পৌরুষ হয়ত আছে কিন্তু মহানুভবতা নেই।

—মহানুভবতা সকলের কাছেই আশা করা যায় না। আর আমার মতামতটা এখনও প্রয়োজন হয় নি। কারণ, যে দিন প্রয়োজন হবে সেদিন আপনার কথা আমাকে বলতে হবে না, তা নিজে বুঝবেন এবং আমাকে বলবার জন্য নিঃস্পৃষ্ট করবেন।

—এমন লোকও ত আছে যারা নিজের কথা কোন সময়েই বলতে পারে না।

—আছে কিন্তু বিবাহের পরে কে করতে পারে না, মানুষ না হলে। মানুষ ভাবটা যখন আসে তখন প্রকাশ করতে আর কুণ্ঠাবোধ করে না। সেই অকুণ্ঠতার মাঝে সে অন্যকেও ব্যক্ত করে ছাড়ে। আপনি আজও মন স্থির হয় নি, সন্দেহে দুল্‌ছেন। যে দিন মন স্থির করবেন, সে দিন আপনার আদেশ আমার পক্ষে অমোঘ হয়ে উঠবে। কাজেই অত্যন্ত নিরুপায়ভাবে আমাকে আমার কথা বল্‌তে হবে।

মিস্ বসু চিন্তা করিয়া কহিলেন—আপনার সামনে চুপ না করে উপায় নেই, তাই আজকার মত চুপ করেই রইলাম।

*

প্রচুর আড়ম্বর ও অপচয়ের মধ্যে তপনকুমারের শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত সমারোহে তাহার গোপনীয় দাম্পত্য জীবনের বর্ণনা না করিলেও তাহা কল্পনা করিয়া লওয়া কষ্টসাধ্য নহে। মদির দিনগুলি স্বপ্ন

মত দ্রুত চলিয়া যাইতেছিল—বিলাস ঐশ্বর্য ও অপচয়ের ইন্ধনে তাহা লেলিহান বহ্নিশিখার মত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

তপন পূর্বে করিত না এমনি একটা কাজ আজকাল তাহার অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। পূর্বে পিতার ঘরের পাশ দিয়া সে যথাসম্ভব সন্তর্পণে ও আত্মগোপন করিয়াই যাইত। তাহার পিতা পাছে দেখিয়া ফেলেন এবং ডাকেন এই ভয়েই সে যেন তাঁহাকে এড়াইয়া চলিত, কিন্তু আজকাল সে যাইবার সময় ঘরের ভিতরটা লক্ষ্য করিতে করিতেই যায়।

তাহার মাতার জীবন তেমনিভাবে চলিতেছে, নববধূকে সর্বরকমে সুখী করিতে তাঁহার প্রয়াস, তাঁহার আগমনে যাহাতে তাহারা অস্বস্তি বোধ না করে, এইজন্য নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত আসেন না। আদিত্যবাবু প্রায়ই সকালে ও সন্ধ্যায় আসিয়া বৌমাকে দেখিয়া যান এবং সৌৎসুক নেত্রে খানিক তাকাইয়া থাকিয়া খেদ প্রকাশ করেন—বৌমার শরীরটা যেন কাবুই হ'য়ে যাচ্ছে। লজ্জা করেই বোধ হয় খাওয়া ছেড়ে দেছেন। সারদা, মোক্ষদা ও তপনের মাতাকে দোষারোপ করেন। মাঝে মাঝে বলেন—তপন না হয় বৌমাকে নিয়ে গিয়ে কিছুকাল দার্জিলিং কি শিলংএ থেকে আসুক।

মোক্ষদা মাঝে মাঝে দাদাবাবুর সঙ্গে রসিকতা করে—চা কি ঠিক হয়েছে? চিনি আর একটু?

তপন হাসিয়া পরিহাস করে—তোমার বৌদিদির হাতে চামচেটা দাও, একটু নেড়ে দিলেই চা সুস্বাদ হ'য়ে যাবে।

—তাই ত বলি, এখন কি আমাদের তৈরি চা ভাল লাগে?

তপন বলে—লাগ্‌লে ত সেইটাই অনৈসর্গিক কিছু হবে।

মোক্ষদা অত কিছু বোঝে না, হি হি করিয়া হাসিয়া তাহার ক্ষুদ্র সুঠাম দেহখানিকে খঞ্জনার মত নাচাইয়া চলিয়া যায়। তপন প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে দেখে।

রেণুকা বলে—মোক্ষদা তোমার সঙ্গে অত রসিকতা করে কেন?

—চিরদিনই করে, আর তোমার আগমনে ওর যেন সব বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। বিয়ের আগেও বৌদি বৌদি করে ওর প্রাণ যেতো। কবে আর বিয়ে হবে, আমরা কি আর দেখতে পাবো! বিয়ের বয়স কি আছে! বিয়ের গরজটা যেন সম্পূর্ণ ওরই।

তপতী আসে, আলাপ করে। কলেজে যায় কিন্তু তাহার একটি চোখ

থাকে মানবেন্দ্রের দিকে, উৎসবের অবিবেচনার মধ্যে সে যাহাতে কোনও রূপ ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে তাহার প্রখর দৃষ্টি। মানবেন্দ্র তাহার নির্দিষ্ট ঘরে বসিয়া থাকে, কখনও খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া পায়চারি করে। তপনের প্রয়োজন হয় না, তবুও মাঝে মাঝে কুশল প্রশ্ন করে। মানবেন্দ্র হাসিয়া জবাব দেয়—ভালই, তবে আপনার কুশল ত?

—হ্যাঁ।

—অকুশলের কোন সঙ্গত হেতু নেই। জ্যোতিষের বই-টই কিছু দরকার আছে কি?

তপন বলে—না, ওসব প'ড়বার সময় কই এখন। প'ড়ব পরে।

—যখন দরকার হয় বলবেন। ভাল বই আছে আমার কাছে। ভাল উপন্যাসও আছে।

—তা হলে উপন্যাস দু'চারখানা দেবেন—ও যদি পড়ে। আমার সময় নেই।

মানবেন্দ্র হাসে, বলে—এখন নিজেই ত উপন্যাস, কি বলেন?

*

তপতী বারান্দায় দাঁড়াইয়া সেদিন দেখিল—চন্দনা মোটর লইয়া আসিয়াছে এবং মানবেন্দ্রের ঘরে যাইয়া কিছুক্ষণ বিলম্ব করিবার পর মানবেন্দ্রও বাহির হইয়া আসিল। চন্দনার কাঁধে হাত রাখিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গিয়া সে মোটরে উঠিল। বিনা আড়ম্বরে মোটরখানা একটা সরীসৃপের মত কলিকাতার বিরাট শকটারণ্যে মিলিয়া গেল। তপতী মনে মনে বিষণ্ণ হইয়া উঠিল—কাঁধে হাত দিয়া চলিবার এই নৈকট্যটা তাহার ভাল লাগে নাই, খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া পরের মোটরে উঠিবার কি প্রয়োজন ছিল? চন্দনাই বা এইরূপে তাহাকে লইয়া যাইবার স্পর্ধা অর্জন করিল কি করিয়া?

মোটরখানা বহু পথ অতিক্রম করিবার পরে চন্দনা কহিল—কোথায় যাবো?

—মাঠে। মাঠের মাঝে বসে বসে গল্প করবো।

মাঠের মাঝে একটা রাস্তায় গাড়ি রাখিয়া দুইজনে নামিয়া আসিল। মানবেন্দ্র সোজা ও দীর্ঘপদক্ষেপে কিছুক্ষণ চলিয়া কহিল—বসুন এখানে, ঘাসের উপর।

চন্দনা বসিয়া কহিল—খামকা, মাঝে মাঝে অমন খোঁড়া হন কেন ?

—কেন ? ওটা কৃতজ্ঞতা। আদিত্যবাবুর কিছু নুন খাই অতএব তাঁর কিছু উপকার করা আমার উচিত, তাই মাঝে মাঝে খোঁড়া হ'তে হয়।

চন্দনা হাসিয়া কহিল—বেশ, খোঁড়া হলেই বুঝি কৃতজ্ঞতা দেখান হয় ?

—বুঝবার প্রয়োজন নেই, তবে এইটুকু জেনো আদিত্যবাবুর তথা তপতীর এতে উপকার হবে।

—এটাও নতুন একটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপায় !

—হ্যাঁ। সে কথা আজ না বুঝলেও পরে সকলেই বুঝবে।

অবান্তর অনেকখানি আলোচনার পরে চন্দনা কহিল—ডাঃ হালদার সেদিন কি ব'ললেন জানেন ? ব'ললেন—তাঁর জীবনে আমার আর প্রযোজন নেই। অথচ তার দু'দিন আগে আমার হাত ধ'রে চোখের জল ফেলে কত কি ব'লেছেন।

—সত্যিই তাই। যতদিন ঐ মহিলাটি বেঁচে ছিলেন ততদিন তোমার প্রয়োজন ছিল, আজ তোমার প্রযোজন তাই নেই। ভবিষ্যতে হয় ত আবার হ'তে পারে একদিন, তবে তার দেরি আছে।

—তাঁর স্ত্রীর জন্যেই আমার প্রয়োজন ছিল ?

—হ্যাঁ, যত লোক বেশ্যাপল্লীতে যাতায়াত করে তার মধ্যে শতকরা পঁচানব্বই-জন লোকই বিবাহিত, তা জানো ? তার যে কারণ আছে একথা অস্বীকার করা যায় না হালদার সাহেবের প্রয়োজনটা ঠিক তেমনি না হ'লেও প্রায় তদ্রূপ।

চন্দনা একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—আপনার কথা বোঝা আমার সাধ্যাতীত, তবুও কেন যে বার বার আপনার কথা শুনবার জন্যেই ছুটে যাই তা বুঝি না।

—তুমি কেন, জগতে সকলেই তাই, যা বুঝি না তাই বুঝতে চাই, যা দুর্লভ তাই পেতে চাই, যা পেয়েছি তা ছুড়ে ফেলে দি।

চন্দনা প্রশ্ন করিল—মিস্ বসু সেদিন কি ব'ললেন ?

—বললেন, আমি যা তাঁকে বলেছিলাম তা যে সত্যি তা তিনি পরে বুঝতে পেরেছেন এবং বিবাহ যে তাঁর করা উচিত এ কথাটাও সম্ভবত প্রণিধান ক'রেছেন।

—আপনি তা হ'লে একজন পাণিপ্রার্থী হ'তে পারেন।

—পারি বই কি ?

—না, তিনিই আপনার পাণিপ্রার্থনা করেছেন।

—একই কথা। প্রার্থনা করা, গ্রহণ করার মাঝে তফাৎ অনেক। তুমিও ত পাণিপ্রার্থনা ক'রেছিলে কিন্তু হ'ল কই ? তোমার পক্ষে সিনেমা ত্যাগ করা সম্ভব নয়, তাঁর পক্ষে হয়ত চাকুরি ছাড়া সম্ভব নয়। ফলে আমার সেই ফার্মের বাড়িতে তোমাদের কারও যাওয়া সম্ভব হ'ল না। আমাকে একাই ফিরে যেতে হবে।

মানবেন্দ্র হাসিয়া উঠিল।

—সেই বাড়িখানা আপনার না হ'লেই কি নয় ?

—না। সেই বাড়িখানির মধ্যে তোমাকে হোক্, মিস্ বসুকে হোক্ একজনকে পেলেই হয়। এই হ'চ্ছে আমার ইচ্ছা। তোমার ইচ্ছা, আমাকে পেতে চাও তোমার সিনেমা রাজ্যে ও ক'লকাতায় এই বাড়ির মাঝে বিজলী পাখার নীচে। কাজেই দেখ্‌ছো মানুষ শুধু মানুষকেই চায় তাই নয়, তার একটা নির্দিষ্ট পারিপার্শ্বিকতাও চায়। ঠিক জায়গায় ঠিক লোকটিকে আমরা চাই—এত আধার যখন আমাদের মনের—তখন দুঃখ, ঘাতপ্রতিঘাত হবেই। তুমি রাগ ক'রবে, অভিমান ক'রবে আমার উপর, আমি সিনেমায় অভিনয় ক'রলাম না ব'লে, আর আমি রাগ ক'রবো তুমি আমার গ্রামের বাড়িতে গেলে না ব'লে। অথচ আমরা দু'জনকে দু'জন কিন্তু সত্যিই চেয়েছি।

চন্দনা স্মিতহাস্যে কহিল—একথা কি সত্যি ?

—কোন্‌টা ? চাওয়াটা ? ওটা উদাহরণ, ওর কোন মানে নেই।

—অর্থাৎ আপনি চান না।

—এমন কথা ত বলি নি। আমার চাওয়াটা বড় হ'ল জগতে, আর মলয়বাবু, হালদার, লাহিড়ী, বিশ্বাস এঁরা যে চেয়েছেন এর সব মিথ্যা হ'য়ে গেল ? অমন স্বার্থপরের মত ভাবলে চল্‌বে কেন ? তাদের বাদ দিয়ে আমার চাওয়ার মূল্য দেওয়া অর্থে তাদের চাওয়াকে অপমান করা ! আমার পাওয়া অর্থে তাদের না পাওয়া—এই ত ?

মানবেন্দ্র আবার হাঁসিয়া উঠিল। কহিল—চল ওঠা যাক, বড্ড চা'র তেষ্টা পেয়েছে।

উভয়ে মোটরে ফিরিতেছিল। ফিরিবার পথে চন্দনাই মোটর চালাইতেছিল, একটা বস্তির কাছাকাছি আসিয়া মানবেন্দ্র কহিল—মোটরটা থামাও ত।

চন্দনা মোটর থামাইয়া প্রশ্ন করিল—কি ?

—দাঁড়াও।

মানবেন্দ্র কি যেন পর্যবেক্ষণ করিয়া কহিল—চল, হ্যাঁ, যাওয়া যাক্।

—কি দেখ্‌লেন ?

—কিছু না। একটা লোক দেখলাম—কে তাই।

—কে ?

—ডাঃ বিশ্বাস।

—কোথায় ?

—এই বস্তির একটা ঘরে প্রবেশ ক'রলেন। প্রবেশ করে কিনা তাই দেখবার জন্য দেরি ক'রলাম। এখন চল।

—ডাঃ বিশ্বাস! না আপনি ভুল দেখেছেন! এও কি সম্ভব ?

—সম্ভাবনা ছিল, আজ সেটা সত্য প্রমাণ হ'ল। ডাঃ বিশ্বাস বাড়িতে নিগৃহীত কাজেই তাঁর পৌরুষ দেখাবার একটা স্থান থাকা প্রয়োজন অনুমান ক'রেছিলাম। এখন দেখলাম, আমার অনুমান মিথ্যা হয় নি।

—ডাঃ বিশ্বাসের মত পণ্ডিত লোক, তাকে এমনি সন্দেহ করা!

—পণ্ডিত না হ'লে বা ভদ্রলোক না হলে, সন্দেহের কারণ থাক্‌তো না। তা হলে বাড়িতে ঝগড়া মারামারি ক'রেও কলিয়ারির কুলিদের মত বেশ পরম নিশ্চিন্তে বাস ক'রতে পারতেন। আমরা যত ভদ্রলোক হ'চ্ছি, ততই জীবনের বৈচিত্র্য বেড়ে যাচ্ছে। ভদ্রতার আবরণে কণ্ঠ যতই রুদ্ধ হ'চ্ছে, কার্য ততই বেগবান হ'য়ে আত্মপ্রকাশ ক'রছে এবং বিচিত্র তার ক্ষেত্র, বিচিত্র তার সমাবেশ!

—তার মানে ?

—তোমার জীবনে যেমন বিয়ে করা সম্ভব নয়, অথচ আমাকে আশ্রয় দিতে তোমার আপত্তি নেই, যেমন করে লাহিড়ীকে একদিন দিয়েছিলে। মনে ভেবে দেখ, আমরা যদি আদিম প্রান্তের মানুষ হ'তাম, অথবা পাখি হ'তাম তবে নীড় রচনায় তোমার প্রয়োজন হ'ত এবং আমি খড়কুটো তোমাকে এনে দিতাম। যেমন গাছের মাথায় বসে স্ত্রী-চিল বাসা নির্মাণ করে, পুরুষটি খড়কুটো জোগায়,

তেমনি ক'রে আমি ছুটতাম তোমার সাহায্যে, তুমি ছুটতে তোমার সন্তানের খাবার আন্‌তে। কষ্টের মাঝে ফড়িং ধ'রে জমা ক'রে শিশুকে খাওয়াতে; কিন্তু আজ তুমি প্রসিদ্ধ তারকা চন্দনা, তাই নীড় রচনায় তোমার প্রয়োজন নেই, তোমার আমার প্রয়োজন খড়কুটো সংগ্রহ ক'রবার জন্যে নয়, দূর দিগন্তে উড়ে উড়ে বেড়াবার জন্যে, বায়ুর স্রোতে গা ছেড়ে দিয়ে ব্যসনবৃত্তি চরিতার্থ ক'রবার জন্যে। তোমার জীবনের প্রকাশ এই—কারণ তুমি গাছের ডগা, মাটির পৃথিবী ছেড়ে আরও উপরে গেছ। আমার মনটা পৃথিবীর মায়া কাটাতে পারে নি, তাই গাছের ডগা ছেড়ে আমি উড়ি নি।

চন্দনা মোটর চালাইয়া দিল; মনে মনে কহিল—দুর্বোধ্য এই মানুষটি।

মানবেন্দ্র ক'হল—গাছের ডগায় এসে যদি মিস্ বসু ব'সতে চান তবে তিনি অবশ্যই ব'সতে পাবেন। আমি খড়কুটো এনে দেব তাঁর নীড় রচনার জন্যে।

মিঃ সেন মিস্ বসুর বাসায় বসিয়া চা পান করিতে করিতে প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন—মানবেন্দ্রবাবুর একটি শক্তি কিন্তু অলৌকিক, মানুষের মনের অন্ধকার প্রদেশ যেন তিনি টর্চের আলোয় দেখ্‌তে পারেন। এটা বোধ হয় আপনি লক্ষ্য ক'রেছেন?

মিস বসু বলিলেন—কেন? একথা আজ হঠাৎ ব'ল্‌লেন কেন?

—হঠাৎ অবশ্য মনে হ'তে পারে, কিন্তু মনে অনেক দিনই ব্যাপারটা বুঝেছি, অন্ততঃ নিজের অন্তরকে বিশ্লেষণ করে।

—কি বুঝলেন?

—বুঝলাম কি? আমি যে সনাতন হিন্দুগৃহের পূজারী তার মূলে সত্যই আমার যেন একটা দুর্বলতা রয়ে গেছে—হয়ত তার মধ্যে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি পাই না, নইলে আপনার এখানে আসা, আপনার সাহচর্য লাভ ক'রবার এমন অদম্য প্রলোভন কেন হয়? আপনি ত আজকাল তাঁর সঙ্গে প্রায়ই আলাপ করেন, এটা কি লক্ষ্য করেন নি?

মিস্ বসু কহিলেন—প্রায়ই আলাপ করি ব'ল্‌লে ভুল হবে, তবে মাঝে মাঝে আলাপ হয় কিন্তু তার মধ্যে তাঁর কোন অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাই নি। অত্যন্ত সাধারণ ব্যক্তি আমার আপনার মতই। তাঁর কথাগুলো পুরাতনই, তবে

বলবার ভঙ্গিটা নতুন, তাই মন্দ শোনায় না। আর আমি যাই তাঁর কাছে কেন জানেন? তাঁকে জানতে, আপনারা বলেন অপূর্ব অদ্ভুত আমি তাই পরীক্ষা ক'রে দেখি—কিন্তু দেখি সাধারণই।

—সাধারণ! না, তাঁর মন একটু যেন—

—ওই একই, আমার কাছে আপনি এসে যেমন পরিতৃপ্তি পান বলেন, তিনিও তেমনি পান। সেখানে তাঁর দুর্বলতা সমানই রয়েছে। আদিত্যবাবুর আশ্রয় ছেড়ে তিনি আমার আশ্রয় গ্রহণ যে ক'রবেন না এমন কথা বলা যায় না। হয়ত দেখা যাবে—সেখানে সাধারণের মতই তিনি সুবিধাবাদী।

—এমন কোন কথা বা ইঙ্গিত তিনি প্রকাশ ক'রেছেন কি?

—এখনও সুযোগ পান নি, তবে অনতিকাল মধ্যেই তিনি পাবেন, কারণ আমি তাঁকে সে সুবিধা দেব পরীক্ষা ক'রতে। আমি জানি সে পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হবেন না—অন্য দশজনের মতই আত্মসমর্পণ ক'রবেন।

ডাঃ সেন একটু ব্যাকুলভাবেই কহিলেন—তখন আপনি কি ফিরে আসতে পারবেন?

মিস্ বসু একটু হাসিয়া বলিলেন—আপনার কি মনে হয়?

—মনে হয় আপনি সেইটাই আকাঙ্ক্ষা ক'রছেন।

মিস্ বসু আর একটু হাসিয়া বলিলেন—আমার বয়স ও বুদ্ধিশক্তি যা আছে তাতে আর যে ভুলই করি অন্তত ও ভুলটি ক'রবো না একথা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস ক'রতে পারেন।

—কিন্তু মানুষ কি তার মন সম্বন্ধে এতখানি বিশ্বাস ক'রতে পারে?

—যে বয়সে পারে না, সে বয়স চ'লে গেছে। আজ পুরুষের প্রয়োজন জীবনে নেই, আর একথা জানি পুরুষ জীবনে অপ্রয়োজনীয় হ'য়েই রইবে।

মিঃ সেন কহিলেন—কিন্তু—

—কিন্তু নয়, ভাববিলাসের অবসর নেই, তাই মানবেন্দ্রবাবু মানবেন্দ্রবাবুই, অলৌকিক কিছু নয়। কাজেই তাঁর মোহও কিছু নেই।

ডাঃ সেন কথাটা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি প্রশ্ন করিলেন—তবে সেখানে মাঝে মাঝে যান কেন? একেবারে বিনা আকর্ষণেই?

—না, আকর্ষণ আছে বই কি। যে আকর্ষণের জন্যে আমরা লাইব্রেরিতে যাই, যে আকর্ষণ নিয়ে আমরা ফুটবল খেলা দেখতে যাই।

—এটা কেবল খেলা আপনার কাছে ?

—খেলাই, তবে তার প্রণালীটা বৈজ্ঞানিক।

ডাঃ সেন কথাটা বিশ্বাস না করিয়াই চুপ করিয়া গেলেন।

*

তপন সেদিন কোথা হইতে ফিরিবার সময় পিতার ঘরের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল—হঠাৎ কেমন একটু অস্বাভাবিক শব্দ কানে যাইতেই ফিরিয়া আসিয়া দরজার পাখির ফাঁকে চোখ রাখিয়া দাঁড়াইল। তাহার পিতার অতি সন্নিকটে অত্যন্ত নৈকট্য প্রকাশ করিয়া সারদা দাঁড়াইয়া আছে এবং কি যেন একটা কথা কহিতেছে যাহা প্রভু-দাসীর উপযুক্ত নয় বলিয়াই মনে হয়।

তপনের সমস্ত শরীর ও মনের মধ্যে কি যেন একটা বিস্ফোরণ হইয়াছে এমনিভাবে সে সহসা ছুটিয়া পলাইয়া গেল—ইহার চেয়ে বেশি কিছু দেখিবার সাহস আর তাহার ছিল না। তাহার মনে পড়ে সারদা চা না দিলে তাহার পিতার পছন্দ হয় না ইত্যাদি।

তপন দ্রুত ঘরে আসিতেছিল, মোক্ষদা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু বিলোল কটাক্ষ হানিয়া কহিল—চা দেব দাদাবাবু!

তপন আনমনেই কহিল—দাও!

রেণুকা ঘরেই ছিল, তপন যাইতেই কহিল—কি হ'য়েছে তোমার? অমন ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে ফিরলে যে?

—কই, কিছু ত হয় নি!

—কোথায় গিয়েছিলে?

—তার কি একটা ফর্দ এখন দিতে হবে নাকি? অনির্দিষ্টভাবে চিরদিনই ঘুরি, কিন্তু কখনও কারও কাছে সেজন্য জবাবদিহি করি নি।

রেণুকা মৃদু হাসিয়া কহিল—আজ না হয় একটু ক'রলেই। মল্লিকার ওখানে গিয়েছিলে?

—না।

—সেখানে যাও না?

—না।

—সে যে ব'ললে প্রায়ই সেখানে যাও।

—তবে যাই। একটু থাম্‌তে পারো, কৈফিয়ৎ দেওয়ার অভ্যাসটা আমার একটু কম।

রেণুকা আজ অকস্মাৎ এই ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া চুপ করিয়া গেল। তপনের মনের কোথায় যেন একটা ফাঁক রহিয়া গিয়াছে, রেণুকার প্রতি সেই দুর্দমনীয় আকর্ষণ আজ আর যেন নাই।

মোক্ষদা চা লইয়া আসিয়া স্মিত হাস্যে কহিল—দেখুন দাদাবাবু চা'য় মিষ্টি হ'য়েছে কিনা? আর ওমলেটটি ঠিক হ'ল কিনা?

তপন অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করিল মোক্ষদার ক্ষুদ্র দেহখানি আজ যেন সহসা মরসুমী ফুলের গাছের মত সাজিয়াছে। কপালে টিপ, পরনে নতুন রঙীন শাড়ি, চুলগুলি অবিন্যস্তভাবে আঁচড়ান! তপন তাহার দিকে চাহিয়া বেশ খুশি হইয়া গেল। সে পরিহাস করিল—হঠাৎ এত সেজেগুজে যাবে কোথায়?

—কোথায় আবার যাবো, যাবার কি স্থান আছে?

—কেন? স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সর্বত্রই ত যাওয়া চলে।

—চা'য় কি মিষ্টি হ'ল?

তপন পুনরায় পরিহাস করিল—তুমি যখন ক'রেছ তখন মিষ্টি অবশ্যই হ'য়েছে।

মোক্ষদা তাহার লঘু দেহখানিকে আন্দোলিত করিয়া কহিল—ও বাবা, সে আবার কি?

তপনের ইচ্ছা করিতেছিল ঐ লঘুপক্ষ পতঙ্গের মত দেহখানিকে সে হাতের মুঠায় করিয়া নিষ্পিষ্ট করে কিন্তু সংস্কার ও রুচি তাহাতে বাধা দিল। সে কহিল—তোমায় কাপড় দিলে কে?

—মা দিলেন, আপনার মত কেউ ত নয়।

মোক্ষদা চলিয়া গেল। রেণুকা সব কিছুই লক্ষ্য করিয়াছিল তাই রুদ্ধ অভিমানে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। তাহার সহিত সে এমন করিয়া ত কথা বলে নাই, দাসী মোক্ষদার কাছে তাহার হৃদয় যেন অধিকতর উন্মুক্ত হইয়াছে। তপন কহিল—চা খাবে না, ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে।

রেণুকা সংক্ষেপে কহিল—খাবো'খন। তুমি খেয়ে নাও।

—তোমার আবার কি হ'ল?

—কিছু না, তোমাকেই দেখ্‌ছি!

—কি দেখ্‌লে?

—দেখ্‌লাম? রেণুকা দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া কহিল—বলতে আপত্তি নেই, আমার সঙ্গে যে ব্যবহারটা ক'রলে তা বোধ হয় মনে আছে, আর ঠিক সেইক্ষণেই কেমন ক'রে মোক্ষদার সঙ্গে অমন পরিহাস ক'রলে? মন ত তোমার সত্যিই খারাপ ছিল না আর থাকলেও তার কারণ জানবার সবচেয়ে বেশি অধিকার বোধ হয় ধর্মত আমারই—রেণুকা আর কহিতে পারিল না—যেন কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

তপন কহিল—এটা একটা কারণ বটে, তবে মোক্ষদা আমার স্ত্রী নয়, তা'হলে তার কাছেও অভিমান করা চ'লতো। যাক্‌, তোমার মন যে এতদূর নেমেছে তা জানতাম না, জানিয়ে খুশি ক'রলে।

রেণুকা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল—এই তপন বিবাহের পূর্বে কেমন ছিল! তপন রেণুকার দিকে না চাহিয়াই আবার বাহির হইয়া গেল। নীচে মোটরের শব্দ অনতিবিলম্বেই জানাইয়া দিল যে তপন চলিয়া গিয়াছে।

*

মোটর চালাইতে চালাইতে তপনের মনে হইল—আজ অতি অকস্মাৎ তাহার যেন এই চিন্তাটা সর্বপ্রথম উপস্থিত হইল—সারদার দেহের মত একটা বেমানান বিপুলতা ও স্ত্রীলোক-দুর্লভ-দৈর্ঘ্য যেন রেণুকাকে অত্যন্ত শ্রীহীন করিয়া ফেলিয়াছে। বেমানান শরীরটার মধ্যে যেন নারীসুলভ কমনীয়তা, নম্রতা নাই—তাহা সুন্দর হইলেও যেন বহ্নিশিখার মত গ্রাস করিতে আসে, মোক্ষদার মত চঞ্চলা খঞ্জনা সুলভ চলন নাই, অথবা মণিকার প্রজাপতির মত ক্ষুদ্র সুঠাম দেহের মাদকতা নাই। রেণুকার কথা মনে করিয়া তপন যেন ভীত হইয়া উঠিল—তাহার দেহটা যেন অকস্মাৎ ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে।

তপন অনির্দিষ্টভাবে মোটর চালাইতে চালাইতে মণিকার বাড়ির সম্মুখে আসিয়া মোটর বাঁধিল। মণিকা বাড়িতেই ছিল—ক্ষুদ্র একটু নমস্কার করিয়া, একটু হাসিয়া কহিল—তপনবাবু! আমাদের মত ক্ষুদ্র প্রাণীর খোঁজ নেওয়ার সময় এখনও আছে—দেখেও আনন্দ।

—ক্ষুদ্র ব'লেই খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন হ'য়েছে। বৃহৎ দেখ্‌তে দেখ্‌তে

মানুষ যখন ক্লান্ত হ'য়ে ওঠে তখন ক্ষুদ্রের প্রতিই আকর্ষণ হয়। চলুন, ব'সতে ব'ললেন না ত ? একটু চা'ও খাওয়াতে হবে।

তপন নিজেই সজ্জিত ড্রইং রুমের মধ্যে একটা শোফায় বসিয়া পড়িয়া কহিল—একটু চা'র কথা বলে আসুন।

মণিকা হাসিয়া কহিল—এমনভাবে কথা ব'লছেন যেন এ বাড়িঘরদোর সব আপনার, আমি নিমিত্ত মাত্র।

—হ'লে সুখী হতাম, যান দেরি ক'রবেন না। আমার অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে। বিলম্বে হতাশ হ'তে হবে।

মণিকা একটু হাসিয়া চলিয়া গেল—সাধারণ সামান্য একখানা বস্ত্রে বেষ্টিত এই দেহখানি কেমন মানাইয়াছে—যেন বেতস লতার মত কম্পমান। তপন বিশেষ প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। মণিকা সত্যই সুন্দর।

মণিকা ফিরিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল—কি কথা ? রেণু ভাল আছে ত ?

—হ্যাঁ, ভাল।

—বাড়ির সব ভাল ?

— হ্যাঁ, ভালই।

—যাক্, রেণুকে পেয়েও আমাদের কথা একেবারে ভুলে যান নি তাহলে ?

—রেণুকে পেয়েছি বলেই যেন আপনাকে ভুলতে পারি নে, মনে হয় রেণুর চেয়েও দুর্লভ কিছু হারিয়েছি তাই আজ আপনাকে আর কিছুতেই ভুলতে পারি নে।

মণিকা ব্যঙ্গ করিল—সে দুর্লভ রত্নটা কি আমি ?

—স্বীকার করলে ক্ষতি নেই।

—এমন সময়েই স্বীকার করলেন যখন স্বীকার করা, না করার মধ্যে তফাৎ নেই বললেই হয়।

—মূল্য আছে বৈ কি ? আজ আমার মনে হয় রেণুর চেয়েও আপনার প্রয়োজন আমার জীবনে বড় হয়ে উঠেছে। আপনাকে না হলে আমার আর চলে না।

মণিকা ক্ষণিক হাসিয়া লইয়া কহিল—বিবাহিত লোকেদের মুখে এই সমস্ত কথা শুনলে আমার সত্যিই হাসি পায়। বিয়ের আগে তারা যেন উন্মাদ হয়ে উঠে এবং তার পরেই বলতে শুরু করে ভুল করেছি। এটা যেন আপনাদের—মানে পুরুষ জাতের ধর্ম।

—ধর্ম যদি তাই হয় তাকে অস্বীকার করা যায় না। পুরুষ পুরুষই, তাই পুরুষসুলভ ভুল-ভ্রান্তি থাকবেই। বিয়ের আগে তারা জ্বলন্ত শিখার দিকে ছোটে, কিন্তু শিখার মাঝে ঢুকে আর্তনাদ করবেই—আজ যেমন আমি ক'রছি। আজ দগ্ধ অন্তরের জ্বালা দূর করবার জন্য তাই প্রজাপতির পাখার বাতাস চাই।

—একবার বিয়ে করে ফেললে সে বাতাস যে আর মেলে না। মেয়েরা যত বোকাই হোক, ওই একটি জায়গায় ভগবানদত্ত বলে তারা বলীয়ান, সেখানে তাদের ঠকানো যায় না।

—অন্যকে সুখী ক'রতে হ'লে মানুষকে ঠকতেই হয়। নিজের দিকে তাকালে অন্যকে সুখী করা যায় না। নিজেকে সুখী ক'রতে গিয়েই আপনাকে ঠকিয়েছি, তারপরেই বুঝেছি যে নিজেও সুখী হই নি।

মণিকা একটু বক্রদৃষ্টিতে ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া কহিল—আপনি কি ব'লতে চান আমাকে বিয়ে না ক'রে আমাকে ঠকিয়েছেন তথা আপনাকে বিয়ে না ক'রে আমি ঠকেছি!

—সেটা আপনিই ভাল ক'রে জানেন। আমি জানি আমি ঠকেছি, কিন্তু চিরকাল ঠকতে চাই না। যারা ভুল ক'রে অনুতাপ করে আমি তাদের দলে নেই, ভুল ক'রেছি আমি তার সংশোধন ক'রতে চাই, সুখী হ'তে চাই।

—অর্থাৎ?

— আপনাকে আমার প্রয়োজন, তা যে ভাবেই হোক্।

—কোন্ ভাবে আপনি চান্?

—যে কোন রকমে সম্ভব, তা অর্থ দিয়ে ক্রয় ক'রেই হোক্, প্রেম দিয়ে জয় ক'রেই হোক্, ভিক্ষা ক'রেই হোক্, বা কেঁদেই হোক্।

মণিকা হঠাৎ প্রগল্‌ভতার সহিত বলিয়া উঠিল—বাড়ি যান, একটু সাধ্য-সাধনা ক'রলেই মান অভিমানের ব্যাপার কেটে যাবে। তখন দেখবেন—তার বহুদূরেও আমি নেই। হঠাৎ মেজাজটা এমন বিগড়ে গেল কেন?

এই সমস্ত কথার পরেও কেহ এমনি হাল্কা কথা বলিতে পারে তাহা যেন তপনের বিশ্বাস হইতেছিল না, তাই সে সবিস্ময়ে মণিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মণিকা পুনরায় কহিল—আমার কথা বুঝ্‌তে পারলেন না?

—না, সত্যিই আপনি কি ব'লতে চান?

—ব'লতে চাই, আমাকে ফাঁকি দিতে আপনি পারবেন না।

—ফাঁকি?

—এর থেকে সত্য কথা মানুষ কখনও বলে নি কোনদিন।

চা আসিল। চা পান করিতে করিতে মণিকা ভাবিতেছিল—তপনকে পাইবার জন্য রেণুকা ও তাহার মধ্যে একটু প্রতিযোগিতা না চলিয়াছিল এমন নয়। রেণুকা যেদিন সগর্বে নিজের জয়ের কথাটা তথা তাহার পরাজয়ের কথাটা প্রকাশ করিল, সেদিনের কথা তাহার আজও মনে পড়ে, আর আজ সেই তপন তাহার কাছে আত্মনিবেদন করিতে আসিয়াছে, ইহা সত্যই হাস্যকর, তবুও সেই পরাজয়কে স্বীকার করিয়া লওয়া যেন অত্যন্ত আত্মপ্রবঞ্চনা, অত্যন্ত আত্মমর্যাদা হানিকর।

নিঃশব্দে চা পান করিয়া তপন প্রশ্ন করিল—আপনি কিছু ব'লছেন না যে?

—কি ব'লবো, অত্যন্ত পুরাতন কাহিনী। যা ভাবপ্রবণতা সৃষ্ট অত্যুক্তি তার কি জবাব দেব?

—তার মানে?

—মানে এই যে, আপনার এসব কথার বিশেষ মূল্য নেই, এ সাময়িক খেয়াল মাত্র।

—খেয়াল!

—আচ্ছা আপনি কি ক'রতে পারেন আমার জন্যে, যে আমার কাছে এসব ব'লছেন?

—কি না ক'রতে পারি?

—রেণুকে ছেড়ে, বাপ-মা জমিদারী ছেড়ে আমার সঙ্গে যেতে পারেন?

—হ্যাঁ, যেখানে হয়, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে।

—সব ছেড়ে?

—হ্যাঁ, কেবলমাত্র চেক বইখানা নিয়ে।

—সে চেক বই ক'দিন থাকবে?

—যথেষ্ট অপব্যয় ক'রলেও সারাজীবন থাকবে আশা করা যায়। যদি না জীবনটা অনাবশ্যকরূপে দীর্ঘ হয়।

মণিকা একটু হাসিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিল—কাল সকাল পর্যন্তও কি এই মত থাকবে?

তপন বিস্মিত ভাবে চাহিয়া থাকিয়া কহিল—আপনি কি কিছুই পারেন না?

—পারি। পৃথিবীর কোন সুদূর প্রান্তে যেতে—

—তবে তাই চলুন। আমি দার্জিলিং যাবো স্থির ক'রেছি, যাবেন?

—আপনার সঙ্গে?

—ক্ষতি কি?

—যাবো, সেখানে গিয়ে দেখা হবে। আপনার সঙ্গে যাবো না।

—আপনার সাহচর্য পেলে সুখী হবো।

তপন চলিয়া আসিল—দার্জিলিং এ মণিকাকে পাওয়া যাইবে এই সম্ভাবনায় সে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। বাড়ি ফিরিবার পথে মনে হইল, ওই পুরাতন গৃহ, ওই সারদা, রেণুকা আর তাহার পিতার সান্নিধ্য হইতে দূরে কিছুকাল নির্বিরোধ জীবন যাপন মন্দ কি?

*

তপন যখন বাড়ি ফিরিল তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে কিন্তু তাহার রক্তাভ রশ্মি দ্বিতলের ঝুলবারান্দার শুভ্র দেয়ালগুলিকে রক্তাভ করিয়া তুলিয়াছে। রেলিং ধরিয়া তাহার মাতা দাঁড়াইয়া আছেন—দূর দিগন্তে প্রসারিত তাঁহার দৃষ্টি, চোখ দুইটি জলে ভরিয়া আছে। তপন এইটুকু দেখিয়াই সমস্ত অনুমান করিয়া লইল। এই অকারণ অশ্রুসম্পাত আগে একটা দুর্বোধ্য রহস্য হইয়াছিল, কিন্তু আজ তপনের নিকটে সবই অত্যন্ত পরিষ্কার। এই বাড়িখানা আজ তাহার কাছে সত্যই অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।

সে কি যেন ভাবিয়া আদিত্যবাবুর নিকটে আসিল, কিন্তু তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যাহা বলিবে ভাবিয়া আসিয়াছিল তাহার সবই যেন ঘোলাইয়া গেল। আদিত্যবাবু প্রশ্ন করিলেন—কি তপন?

—আমি দার্জিলিং যাবো।

—বেশ, গুছিয়ে জিনিসপত্র সব ঠিক ক'রে নিয়ে যেও, আর সে বাড়ির মালিকে একটা পত্র দিও, স্টেশন থেকে সে . . তোমাদের নিয়ে যাবে।

—মা'কে নিয়ে যাবো।

—কেন? বৌমাকে নিয়ে যাও, তোমার মা যাবে কেন? শীতের মাঝে—

—না, মাকে নিয়েই যাবো।

—বৌমা এখানে থাক্‌বে?

—হ্যাঁ।

—কেন?

তপন কোন কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া কহিল—আমার ইচ্ছা।

—তোমার মা যাবেন, শুনেছ?

—যাবেন বইকি। শুনি নি, তবে শুন্‌বো।

—যান ভাল—নিয়ে যেও, কিন্তু বৌমা? তা দুদিন বাপের কাছে থেকে আসুন।

তপন ফিরিয়া আসিল—বুকের ভিতরটা যেন অনেকটা হাল্কা হইয়া গেল। এই গৃহের প্রাচীরের বাহিরে যেন মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া স্বাধীনতা লাভ করা যাইবে। তপন সাগ্রহে মায়েব নিকট উপস্থিত হইল—মা তাঁহার কক্ষে বসিয়া কি যেন একটা পড়িতেছিলেন—অদূরে বেতারে চাঁপাকণ্ঠে একটা কীর্তন শোনা যাইতেছে।

তপন্‌ কহিল—চল, তোমাকে কিছুদিন দার্জিলিং নিয়ে যাই।

—দার্জিলিং? কেন?

—তোমার শরীর খারাপ হ'য়ে গেছে; চল।

—বরং বৌমাকে নিয়ে যা, তার শরীরটা খারাপ হ'য়েছে, রংটাও যেন একটু ময়লা হ'য়ে গেছে, ঠিক সে রকমটি আর নেই।

—তার কথা ত হচ্ছে না, তোমার কথা হ'চ্ছে।

মা একটু হাসিয়া কহিলেন—আমার কি যাওয়া হয়! এই সংসার কে দেখ্‌বে, একদিন না দেখ্‌লে যে সব গোলমাল হ'য়ে যায়।

—তুমি মারা গেলে কি সংসার তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে?

—তা কারও যায় না বাবা, কিন্তু যতদিন আছি।

—কিন্তু দার্জিলিং গেলে হয়ত সংসারের বোঝা আরও কিছুদিন বইতে পারবে।

মা পুনরায় হাসিয়া কহিলেন—উনি না গেলে কেমন ক'রে যাই বাবা।

ওঁর যে বড় কষ্ট হবে। বয়স ত হ'য়েছে এখন আর সে রকম পরিশ্রম ক'রতে পারেন না।

তপনের মুখে হঠাৎ একটা কথা আসিয়া পড়িয়াছিল কিন্তু মনে মনে সে ভগবানকে ধন্যবাদ দিল যে সে কথাটা সে বলিয়া ফেলে নাই। তাহার ত জানিতে বাকি নাই মায়ের সাশ্রুনেত্রে এমনভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবার অর্থ কি, তবুও তিনি যদি তাহা গোপনই রাখিতে চান তবে রাখুন; কিন্তু যাঁহার অত্যাচারের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য সে চেষ্টা করিতেছে, তাঁহারই কষ্টের জন্যে মা যাইতে চাহিতেছিলেন না এটা যেন তাহার কাছে একটা দুর্বোধ্য রহস্য বলিয়া মনে হইল—এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধও হইল।

তপন কহিল—তবে একাই যবো।

—কেন? বৌমাকে নিয়ে যাবি নে?

—না, আমি একাই যাবো।

তপন কোন উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল। তাহার মনটা অনির্দ্দিষ্ট রকমের তিক্ততায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। কি করিবে তাহাহ সে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, তাই পরদিন বিনাড়ম্বরে কেবলমাত্র চেক বহি সম্বল করিয়া সে দার্জিলিংএ চলিয়া গেল।

কিছুদিন পরের কথা—অনাবশ্যক অনেক ঘটনা পৃথিবীর উপরে ঘটিয়া গিয়াছে। তাদের যেমন কোন তালিকা থাকে না—আমাদের আখ্যায়িকারও তেমনি ঘটনার তালিকায় শূন্যস্থান রহিয়া গিয়াছে।

মানবেন্দ্র সেদিন সকালে বসিয়া ছিল, তপতী একটু বিমর্ষ মুখে ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রশ্ন করিল—সকালে চা দিয়ে গেছে ত?

—হ্যাঁ, দিয়ে গেছে। আপনাকে এত বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন? দোতলায় যেন সে রকমের প্রাণ নেই ব'লে বোধ হ'চ্ছে।

—হ্যাঁ, সত্যিই প্রাণ নেই, মা বাবা কাল রাত্রের গাড়িতে দার্জিলিং গেছেন, বৌদি ঘরে ব'সে কাঁদছে, আমি কি ক'রবো? আপনার কাছে পালিয়ে এলাম।

—বৌদি কাঁদছেন ? আপনি বিমর্ষ, এর ত কোন অর্থ নেই। আজ আপনারা বাড়ির মালিক—আমি হ'লে আজ বাড়িতে মহোৎসব লাগিয়ে দিতাম।

তপতী একটু দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া হাসিল। মানবেন্দ্র প্রশ্ন করিল—তা, আপনার বাবা মা, হঠাৎ দার্জিলিং গেলেন ?

—দাদা আসছে না, তাই। একটু থামিয়া কহিল—আপনার কাছে গোপন ক'রেই বা লাভ কি, দাদা ত একা দার্জিলিং যায় নি।

—মণিকা গেছে ত ? সে ত যা'বেই, তাতে তোমার ত কিছু হয় নি, আর এটা একটা অসম্ভাব্য দুর্ঘটনাও নয়।

—মণিকা গেছে আপনি জানলেন কেমন ক'রে ?

—জানি নয়, অনুমান ক'রেছি, বিবাহের পূর্বেই ত আমি বলেছিলাম যে দু'জনকে বিয়ে না ক'রলে উপায় নেই। তপনবাবু ঘড়ির হেয়ার স্প্রিংএর মত একবার এদিক একবার ওদিক ক'রবেনই, কাজেই আপনার বৌদির কান্নাকাটি নিরর্থক। ব্যাপারটাকে সোজাসুজি গ্রহণ ক'রলে লাভ আছে, মার্জনা ক'রে নিলে আনন্দ আছে। ভয় নেই। অনতিবিলম্বে তপনবাবু আবার ফিরে আসবেন।

—মেয়েরা কি এটা সোজাসুজি গ্রহণ ক'রতে পারে ? তা সম্ভব নয়।

—সম্ভব নয় বলেই ত যত বিড়ম্বনা ; কিন্তু তিনি ত জানেন না, তপনবাবু যত দিন তপনবাবু, আপনার ভাই এবং আপনার বাপ-মার ছেলে ততদিন তাকে ঘড়ির হেয়ার স্প্রিংএর মত এধার ওধার ক'রতেই হ'বে। আমাদের জানার অতীতে এমন একটা দুর্জ্ঞেয় শক্তি কাজ ক'রছে যা আমরা ধারণাই ক'রতে পারি নে—তপনবাবু একাগ্র চিন্তা ক'রে বা ভেবে করেন নি, করেছেন এমন একটা মানসিক অবস্থায় যখন এমনি কিছু একটা না ক'রে উপায় ছিল না।

—উপায় ছিল না ? বলেন কি ?

—হ্যাঁ সত্যিই তাই। যেমন হরিচরণের সঙ্গে আলাপ না ক'রে এবং তাকে আত্মহত্যা ক'রতে বাধ্য না ক'রে আপনার উপায় ছিল না।

তপতী একটু ভাবিয়া কহিল—সে কি আমি ক'রেছি ?

—আপনি ক'রেছেন ব'ললে একটু ভুল হবে, এমনি ভাবে কিছু ক'রেছেন যাতে হরিচরণ আত্মহত্যা না ক'রে পারে নি।

—আমরা কেন এমন করি?

মানবেন্দ্র তাহার স্বভাব সুলভ হাসিতে চমকাইয়া দিয়া কহিল—ডাঃ বিশ্বাস ব'লবেন নিঃজ্ঞান মনের ক্রিয়ায়, যার সম্বন্ধে চেতন মন একেবারেই অজ্ঞান। অক্ষয়বাবু হয়ত বলবেন, বিধি নিয়ন্ত্রণ—বা ভাগ্য। ডাঃ হালদার হয়ত বলবেন, মানুষের কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের সংঘাত, আমি হয়ত বলবো, মানুষের সঙ্গে মানুষের অনিবার্য সংঘাত এমনি! এর কোন সঠিক কারণ হয়ত নেই কিন্তু এটা স্বাভাবিক—আপনি আপনার পরিচিত সকলকেই ভালবাসতে পারেন না, দু'একজনকে পাবেন কিন্তু তাদের পেলে হয়ত আবার ভালবাসা অন্যতে চ'লে যাবে।

তপতী কহিল—শুধু তাইত নয়, বৌদি আরও বল্লে, মোক্ষদা নাকি দাদার সঙ্গে যা তা রসিকতা করে এবং দাদাও তাকে বেশ প্রশ্রয় দেয়। বৌদি কি এক্ষেত্রেও কাঁদবে না?

—না, কারণ, মোক্ষদা বা মণিকার মত ক্ষুদ্র শীর্ণকায়া মেয়েদের সাম্নে তপন চিরদিনই বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেল্‌বে, একে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করতে পারলে আপনার বৌদি সুখী হবেন নইলে কাঁদতে হবে, হয়ত সারাজীবন ভরেই—এবং জানবেন যে অমনি বিশেষ কোন রকমের ব্যক্তির সাম্নে আপনিও সম্পূর্ণ নিরুপায় হ'য়ে পড়েন।

—হরিচরণ কি সেই জাতীয় লোক! তপতী হরিচরণের অস্থিচর্মসার দেহকে মনে মনে ব্যঙ্গ করিয়া হাসিয়া উঠিল। মানবেন্দ্র কহিল—সম্ভবত থোড়া বলে।

তপতী প্রশ্ন করিল—আগে মাঝে মাঝে আপনি আমাকে তুমি ব'লতেন, আজকাল আপনি বল্‌ত ভুল হয় না, এটা লক্ষ্য করেছি।

—না করাই উচিত ছিল, 'তুমি'র নৈকট্য আপনার সঙ্গে না গড়ে ওঠাই মঙ্গলের। আর একটা খবর শুনলে হয়ত আশ্চর্য হবেন—ডাঃ দত্ত দেশসেবা ক'রতে ক'রতে হঠাৎ দমদমে এক বাগানবাড়ি করেছেন; তার তিন তলার ঘরখানি একেবারে উন্মুক্ত, কাঁচের দরজা জানলা এবং উঠবার সঙ্কীর্ণ একটি সিঁড়ি। এ খেয়ালটা কেন তা বুঝতে পারেন?

—না।

—আপনার বাবা এই সব জন্তু-জানোয়ার কেন পোষেন তা জানেন ?

—না।

—চন্দনা আমার কাছে আসে কেন জা নন ?

—না।

—ডাঃ সেন মিস্ বসুর বাড়িতে ঘন ঘন যান কেন জানেন ?

—না।

—ঐ রকম আমরা অনেক কিছুই জানি না, কিন্তু কারণ একটাই, কার্য তার ভিন্ন ভিন্ন পথ গ্রহণ করে। ডাঃ দত্তর পক্ষে দেশসেবা করা প্রয়োজন এবং বাগানবাড়িও প্রয়োজন—আর অক্ষয়বাবুরও বালিগঞ্জে বাড়ি করা প্রয়োজন, তাই দেশসেবাও প্রয়োজন।

—অক্ষয়বাবু ?

—হ্যাঁ অক্ষয়বাবু। চিত্তরঞ্জন দেশসেবা করেছিলেন তাঁর যথেষ্ট ছিল বলে, অক্ষয়বাবু দেশসেবা করেন তাঁর যথেষ্ট নেই বলে। চোরেরও চুরি ক'রবার একটা যুক্তি থাকে—যেমন জনৈক ভদ্রলোককে জানি যিনি দুর্ভিক্ষ পীড়িতের সেবাকার্য নিয়েছিলেন এবং তার থেকে অর্থ ও দ্রব্য বহুলপরিমাণে আত্মসাৎ ক'রেছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলে তিনি বলেছিলেন—আমি না ক'রলে এরা কিছুই ত পেত না, তার চেয়ে এটা ত ভাল হ'য়েছে ? আর আমার সংসারও ত চলা চাই—আমি না খেয়ে থাকলে সেবাকার্য চালাবে কে ? অক্ষয়বাবুর যদি বাড়িঘর না থাকে তবে বাংলায় সেবাকার্য কে ক'রবে ? সেবা শুশ্রূষা ব্যতিরেকে রুগ্ন বাংলা মরেই যাবে—কেমন ? মানবেন্দ্র আবার হাসিয়া উঠিল, তপতী তবুও কহিল—এসব কথা বিশ্বাস ক'রতে প্রবৃত্তি হয় না।

প্রবৃত্তি হয় না সেটা সত্যি ; কিন্তু তাই বলে এটা ত মিথ্যা নয়। যেমন তপন-মণিকা সংবাদ বিশ্বাস না ক'রতে চাইলেও সত্যি। তোমার বাবার সান্ধ্য আড্ডা ভেঙে গেছে কেন ? বুঝতে পারো ?

—না।

—সে শুনে তোমার প্রয়োজন নেই তবে এইটুকু জেনে রাখো যে ডাঃ দত্তর বাগানবাড়িটা তোমার বাবার অর্থে-ই তৈরি হয়েছে। বাড়িটাও তাঁর তবে দত্তর নামে চলছে।

—এই অনিবার্য ভবিষ্যতের হাত হ'তে কি মানুষ আত্মরক্ষা ক'র্‌তে পারে না?

—না, যখন পারে তখন সে হয় অতিমানব তথা পাগল।

—আপনিও কি আমাদের দলে?

—না। আমি পাগলের দলে, নইলে কি আপনাদের আশ্রিত হ'য়ে থাকতে পারি। চন্দনা যেমন বলে আপনার মত মানুষ আত্মমর্যদা ভুলে কেমন করে পরাশ্রিত হ'তে পারে; কিন্তু ভেবে দেখে না মেয়েরা বিবাহের পরেই তারা অন্যের আশ্রয়কে কেমন আপনার ক'রে নেয়, তার যেমন যুক্তি আছে, আমারও সম্ভবত তেমনি কোন যুক্তি আছে—

তপতী মনে মনে খুশি হইয়াছিল, তাই সে বলিল—আপনি কি তেমন আপনার ক'রে নিতে পেরেছেন? তা হ'লে আজও আমাকে আপনি বলেন কেন?

—এ 'কেন'র জবাব নেই—কিন্তু কারণ অবশ্যই আছে। আপনার বৌদির কাঁদবার যেমন একটা কারণ জুটেছে, এমনি হয়ত কোন কারণ আছে পিছনে যা আজ আমরা কেউই জানি না।

তপতী অভিযোগ করিল—আপনার সঙ্গে আলাপের ফল এই হয় যে যা জানি, বুঝি, তাও যেন ঘুলিয়ে যায়।

মানবেন্দ্র হো হো করিয়া হাসিয়া কহিল—তার মানে কিছুই বুঝি না। গরুর বাছুর যেমন হঠাৎ খানিক দৌড় দেয় অথচ কেন তা জানে না, আমরাও ঠিক তাই, হঠাৎ দৌড় দেই কেন তা জানি না।

তপতী চলিয়া যাইতেছিল, ফিরিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল—আপনার বেদনাটা ক'মেছে? বাতটার কি কোন চিকিৎসা নেই?

—বেদনা কমেছে, হয়ত পূর্ণিমায় আবার বাড়বে।

তপতী অকস্মাৎ পরিহাস করিল—খুঁড়িয়ে হাঁটলে আপনাকে কিন্তু বেশ দেখা যায়—না?

মানবেন্দ্র সংক্ষেপে জবাব দিল—তা জানি।

সেদিন চন্দনা একখানা ছবির ট্রেড শো দেখিতে গিয়াছিল—মিঃ লাহিড়ী

ও মলয়বাবু সস্ত্রীক সেই ছবি দেখিতে আসিয়াছিলেন। ছবির সংলাপ লেখা মলয়বাবুর, কাহিনীও তাঁহারই, জনৈক অভিনেত্রীর জীবনকথা ছবিতে রূপ ও বাণী লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অভিনেত্রীটি ছিলেন অত্যন্ত স্পর্ধিতা, অবশেষে জনৈক দরিদ্র সাহিত্যিককে বিবাহ করিয়া সংসার ধর্ম পালন করিতে আরম্ভ করেন। লাহিড়ী ছবিখানাকে পরিচালনা করিয়াছেন। বৈচিত্র্যহীনতা ও অসুষ্ঠু রসিকতায় ছবিখানা অন্যান্য বাংলা ছবির মতই বাঙালীর উপযুক্ত।

ঘটনা সামান্য কিন্তু তাহা দেখিয়া চন্দনা মনে মনে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছিল। ছবিখানার ভিতর দিয়া লাহিড়ী ও মলয় যেন তাহাকে তিরস্কার করিয়াছে এবং পরিহাসও করিয়াছে—মলয় ও লাহিড়ীকে না ভালবাসাটা যেন তাহার পক্ষে একটা প্রচণ্ড অপকার্য হইয়া গিয়াছে।

চন্দনা ফিরবার পথে মানবেন্দ্রের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হ'ল। তখন বেলা এগারোটা হইবে, মানবেন্দ্র তৃতীয় কাপ চা পান করিয়া স্নানের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। চন্দনা আসিয়া কহিল—চা আমাকেও একটু দিতে হবে, আমি বড় ক্লান্ত এবং মনটা উত্তেজিত।

মানবেন্দ্র পরিহাস করিল—উত্তেজিত অবস্থায় উত্তেজক পান না করাই ভাল, অধিকন্তু আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন এটা আমার বাড়ি নয়।

—না হোক, আদিত্যবাবুর বাড়িতে এক কাপ চা পাওয়ার অধিকার আমার আছে।

চন্দনা বাহির হইয়া একজন চাকরকে পাইল এবং হিন্দীতে আদেশ জানাইল—এক কাপ চা আউর জল্‌দি লে আও। চাকরটা ধমক খাইয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।

চন্দনা ফিরিয়া আসিতেই মানবেন্দ্র প্রশ্ন করিল—উত্তেজিত হওয়ার কারণটা কি? ছবি দেখে উত্তেজিত হওয়া তোমার উচিত হয় নি।

চন্দনা ছবির ঘটনা ও উত্তেজিত হইবার কারণ আনুপূর্বিক বর্ণনা করিয়া কহিল—এটা আমাকে পরিহাস করা হ'ল, না তিরস্কার করা হ'ল?

কোনটাই হ'ল না। গল্পটা মলয়বাবুর না লিখে উপায় ছিল না, যদি তুমি তাঁকে বিয়ে করতে তবে তাঁর গল্পটা হ'ত কেমন শুনবে? জনৈক বড়লোকের ছেলে কলকাতা এসে কোন অভিনেত্রীর পাল্লায় পড়ে ধর্মপত্নীকে ত্যাগ করে,

কিন্তু পরে আবার তার কাছেই ফিরে যেতে বাধ্য হয়। বেশ করুণ মিলনান্তক গল্পটি হ'ত না ?

—তা হোক, কিন্তু আমাকে ব্যঙ্গ ক'রে তাদের কি লাভ ? আমি ত তাদের কিছু করি নি—কোন ক্ষতি করি নি।

—যথেষ্ট করেছ। তাদের ভালবাসো নি, বিয়ে করো নি, আরো কত কি ? একটি গল্প শোনো।

প্যারিতে এক ভদ্রলোক জমিদার ছিলেন, তাঁর নাম Michael Sade, তিনি প্যারির যত সুন্দরী রমণীকে তাঁর বাগানবাড়িতে নিয়ে যেয়ে উলঙ্গ ক'রে বেত মারতেন এবং যথেষ্ট টাকাও দিতেন। এতে তাঁর কি লাভ হ'ত জানো ?

—চন্দনা হঠাৎ যেন আঘাত পাইয়াছে এমনিভাবে চমকাইয়া উঠিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল—না।

যথেষ্ট লাভ, তাঁর মনে বড় তৃপ্তি পেতেন যে ন তৃপ্তি তিনি বিবাহ ক'রলে পেতেন না বা কোনও উপায়ে পেতেন না। কাজেই মলয়বাবু লাহিড়ীর লাভ কি সে কথা তোমার বোঝা অসাধ্য—বাস্তবে তোমাকে না পেয়ে যদি কলমের মুখে পান তাতে তোমার আপত্তি কি ?…মানবেন্দ্র হাসিয়া উঠিল।

চন্দনা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল—আপনি ত সব তাতেই হাসেন।

—হাসি পেলে কি ক'রবো ? একবার স্টিমারে যাচ্ছিলাম, ঝড় বৃষ্টিতে স্টিমার ডুবুডুবু হয়, কয়েকজন যাত্রী বিরাট উল্লম্ফনের সঙ্গে বিকট চীৎকার ক'রে 'মা দুর্গা রক্ষা করো' প্রভৃতি বলছিলো, দৃশ্যটি দেখে আমার হাসি পেলো। তারা কিন্তু আমাকে মারতে এসেছিল। আমি নিরুপায় হ'য়ে পালিয়ে বহুকষ্টে আত্মরক্ষা করি—তবে তুমি মারবে না এই যা ভরসা…মানবেন্দ্র আবার হাসিয়া উঠিল।

চন্দনা কহিল—বেশ, আপনি একটুও মূল্য দিলেন না ঘটনাটার ?

—না। যেমন মিস্ বসু তাঁর ওখানে আশ্রয় নেওয়ার জন্য অনুরোধ ক'রছেন, তারও কোন মূল্য দি না—যেহেতু বিয়ে করা সম্ভব নয়।

—তা হ'লে আমার বাড়িতে দোষ হ'ল কি ?

—হ'ল বৈ কি ? আমি বলি গ্রামের বাড়িতে চল, তুমি তা যাবে না। তা হ'লে ত আপত্তি নেই—দু'জনে স্বামী-স্ত্রী হ'য়ে বেশ গৃহস্থালী করা যাবে।

—গ্রামে গেলে পেট চল্‌বে কি ক'রে? আপনি ইস্কুলে মাস্টারী ক'রবেন?

—প্রয়োজন হ'লে ক'রবো?

—তার চেয়ে আমার বাড়িতেই আশ্রয় নেওয়া সোজা বা সুবিধে নয়?

—ঐ জায়গাই ত গোলমাল। তোমার আর আমার সংঘাত—যা তোমার ও লাহিড়ী, মলয়বাবুর মধ্যে ঘটেছে। তোমাকেও কিছু ছাড়তে হয়, আমাকেও কিছু ছাড়তে হয়, তবে ত একটা মিল হয়, নইলে কি ক'রে হ'তে পারে?

তপতী চাকরের হাতে চা লইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল—নমস্কার, হঠাৎ অসময়ে?

চন্দনা স্মিতহাস্যে কহিল—নমস্কার, আমাদের আবার সময় অসময় কি?

—কি আলাপ হ'চ্ছে?

মানবেন্দ্র অত্যন্ত সহজকণ্ঠে কহিল—আমার আর চন্দনার বিবাহের কথাবার্তা হচ্ছে।

একটু হাসিয়া কহিল—[illegible] ইচ্ছা তার বাড়িতে আমি তার স্বামীরূপে থাকি।

তপতী একটু ম্লান হাসিয়া কহিল—ভালই ত—সুখবর।

—কিন্তু আমার ইচ্ছে, গ্রামের একটা ছোট্ট বাড়িতে ওকে বধূরূপে রাখি। তাই গোলমাল হ'চ্ছে।

তপতী কহিল—এটা আবার গোলমাল কি? ছ'মাস কলকাতা থাকবেন, বাকি ছ'মাস গ্রামে থাকবেন।

মানবেন্দ্র কহিল—অর্থাৎ জীবনের অর্ধেক আমি ত্যাগ ক'রবো ওর জন্যে এবং ও করবে আমার জন্যে, কিন্তু পুরোটা ওয়াশীল কোন রকমে হয় কিনা সেটা দেখ্‌বো না একবার চেষ্টা ক'রে?

তপতী কহিল—জগতে সবই কি পাওয়া যায়?

মানবেন্দ্র কহিল—এইটি খাঁটি কথা, সবই পাওয়া যায় না তাই মলয়বাবু গল্প লেখেন এবং লাহিড়ী তাই পরিচালনা করেন, ডাঃ হালদার তাই দর্শনশাস্ত্র চর্চা করেন, আমি তাই কিছুই করি না, আর চন্দনা তাই অভিনয় করে—এবং তপতী—তাই—

তপতী বাক্যপূরণ করিতে তাড়াতাড়ি কহিল—চা আনি।

—হ্যাঁ, অবিকল তাই।

তপতী কহিল—আবার চলেও যাই?

—হ্যাঁ যেতে পারেন, আমাদের আলোচনাটা চ'ল্‌তে থাক।

তপতী চলিয়া গেল। চন্দনা কহিল—এটাও কি পরিহাসের ব্যাপার?

—কোন্‌টা?

—যা এতক্ষণ ব'ল্‌লেন।

—অর্থাৎ—

—আমি যদি আপনাকে ভালই বেসে থাকি এবং বিবাহ ক'রতে ইচ্ছে করে থাকি, তবে সেটা কি পরিহাসের বস্তু হবে?

—মোটেই না, যেমন মলয়বাবুর ছবির কাহিনী মোটেই পরিহাস নয়।

—তবে পরিহাস ক'রলেন কেন?

—পরিহাস করি নি। কথাটা ভুল বুঝছ, দু'জনের ভালবাসার মধ্যে যেটা প্রাচীরের মত ব্যবধান সৃষ্টি ক'রেছে সেইটাকে পরিহাস ক'রেছি।

—বেশ তাই হোক—ছ'মাস গ্রামের বাড়িতেই থাকা যাবে, তা হ'লে?

—তার উত্তর ত দিয়েছি।

—না, একটা যা হয় উত্তর আপনাকে দিতে হবে।

মানবেন্দ্র মৃদু হাসিয়া কহিল—আজ তুমি উত্তেজিত, আজ থাক্‌, ভবিষ্যতে আর একদিন সুস্থ মস্তিষ্কে বিচার ক'রে দেখা যাবে।

—কেন আজ হ'লেই বা ক্ষতি কি? কবে একটা সঠিক উত্তর দেবেন?

মানবেন্দ্র কহিল—উত্তর সত্যিই চান?

—হ্যাঁ, চাই এবং অনতিবিলম্বে।

—তবে রবিবার সকাল সাড়ে আটটায় এখানে আস্‌বেন, উত্তর পাবেন। অবশ্য আমারই যেয়ে বলে আসা উচিত কারণ আমি পুরুষ মানুষ কিন্তু তোমার মোটর আছে। আর এতদিন পুরুষ মানুষই মেয়েদের পিছনে ঘুরেছে, আজ না হয় তুমিই নতুন কিছু ক'রলে—পুরুষ মানুষের পিছনে ঘুরে। এতে যেমন নতুনত্ব আছে তেমনি একটা জয় ক'রবার আনন্দ আছে।

—রবিবার আর শুক্রবার এক রকমই, দিনের সূর্য, কি আলো দেখে ত পৃথক করা যায় না, তবে ওটা শুক্রবার হ'ল না কেন?

—কারণ সেটা শুক্রবার বলেই, এবং রবিবারটার তারিখ অন্তত আলাদা বলে।

—তা হ'লে রবিবারে উত্তর দেবেন, কেমন ? হ্যাঁ, তাই দেখ্‌বো, আপনার মাঝেই কতখানি পীড়ন স্পৃহা আছে। যাকে শ্রদ্ধা ক'রেছি, তাকে জয় করার মাঝে আনন্দ আছে, নূতনত্ব আছে—বেশ আমিই আসবো।

—হ্যাঁ, এসো।

চন্দনা যেমন তাড়াতাড়ি উত্তেজিতভাবে আসিয়াছিল, সে তেমন করিয়াই চলিয়া যাইতেছিল, মানবেন্দ্র ডাকিয়া ফিরাইয়া কহিল—একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে ভুলে গেছি।

—বলুন।

—তুমি ডাঃ দত্ত তথা আদিত্যবাবুর বাগান বাড়িতে কোন দিন বেড়াতে গিয়েছিলে ?

—হ্যাঁ, একদিন।

—সেদিন আদিত্যবাবু কি তোমাকে মেরেছিলেন ?

চন্দনা চমকাইয়া উঠিয়া কহিল—তার মানে ?

মানবেন্দ্র মৃদু হাসিয়া কহিল—মানে ত অনেক কিছুরই পাও নি জীবনে—সত্যি করে বলো।

হ্যাঁ, হঠাৎ তিনি চারটা চড় মেরেছিলেন। চন্দনার কণ্ঠ অকস্মাৎ ভারী হইয়া উঠিল। সে চোখ মুছিয়া কহিল—সেই জন্যেই তোমার জবাব চাই রবিবার—জীবনে আজ বুঝেছি আমি সত্যিই অসহায়, সত্যিই পরাধীন, নইলে এর প্রতিবিধান ক'রতে পারতুম—কিন্তু আদিত্যবাবুর মত বড়লোকের কাছে আমি নিরুপায়—চন্দনা কাঁদিয়া ফেলিল।

মানবেন্দ্র কহিল—জানি—রবিবার এসো। আদিত্যবাবু হয়ত তার আগেই আসবেন। দুঃখ ক'রে লাভ নেই, মানুষ মানুষই, দেবতা নয়, কাজেই তাকে মার্জনা ক'রতে শেখাই দরকার।

চন্দনা রুমালে চোখ মুছিয়া বাহির হইয়া গেল—মোটরে চড়িয়া সে ভাবিল যে ঘটনা কেবল আদিত্যবাবু আর সেই জানে তাহা মানবেন্দ্র জানিল কেমন করিয়া—মানবেন্দ্র কি সত্যই অতিমানব !

সন্ধ্যার পূর্বে মানবেন্দ্র একাকী আপনার ইজিচেয়ারখানায় বসিয়া কি ভাবিতেছিল, ভাবিতে ভাবিতে বিষণ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। নিজের জন্যেও নহে—চন্দনা, তপতী, তপন, রেণুকা, আদিত্যবাবুর জন্যেও নহে। সে ভাবিতেছিল পৃথিবীর কথা আর তাহার উপরে জীবন্ত মানুষগুলির কথা—লোকগুলি কক্ষচ্যুত উল্কার মত চলিয়াছে, অন্যের অক্ষ ভেদ করিয়া, বায়ুস্তর ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া, অন্যকে আহত করিয়া অবশেষে আপনি ভস্মে পরিণত হইতেছে। আকাশের অগণ্য তারকায় পথের সন্ধান যেমন মানুষের অগোচর—অগণ্য মানুষের মনের পথও তেমনি অজানা। পৃথিবীতে তাই শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই, একটা তপ্ত মরুভূমির মত দুর্বিষহ, অথচ মানুষ তবুও আছে, সংঘাতে সংঘাতে আপনাকে নিঃশেষে ধ্বংস করিয়া দিতেছে।

তপতী চা লইয়া আসিয়া স্মিতহাস্যে প্রশ্ন করিল—কি—বিয়ে ঠিক হ'ল?

—প্রায় ঠিক হ'ল বলা যায়!

—প্রায় কেন?

—ক'নে দেখা হয় নি এখনও।

—এখনও হয় নি আর কতদিন দেখবেন? চন্দনার সঙ্গে পরিচয় ত পুরোনো হতে চললো।

—ও চন্দনা ত বিবাহযোগ্যা ক'নে নয় যে দেখ্‌বো। তবে তার সঙ্গে সম্বন্ধ হ'য়েছে, কথাবার্তা চ'ল্‌ছে।

—বিলম্ব কেন আর তবে?

—বিলম্বের প্রয়োজন নেই, শুভকর্মের একটা দিন ত স্থির করা লাগে।

—পাঁজিতে ত বহু দিনই লেখে, এবছরে—

—কিন্তু তবুও আমার দিন আর হ'ল কই?

—অমন চমৎকার ক'নে, রূপ যৌবন অর্থ সবই আছে।

—আছে বলেই ত ভয়, নইলে ভয় ছিল না; কিন্তু তাকে বিয়ে ক'রলে আপনাদের আশ্রয় ছেড়ে চ'লে যাবো। এই কি আপনাদের কাছে একটুকুও দুঃখের হবে না?

তপতী ক্লান্ত কণ্ঠে কহিল—তাতে আপনার কি? এখানে কে থাকবে, দুঃখ ক'রবে কি চোখের জল ফেল্‌বে, সে ভেবে আপনার কি হবে?

—হবে না কিছু, তবুও জান্‌তে ইচ্ছে হয়, যেমন আপনার জান্‌তে ইচ্ছে হ'চ্ছে আমার বিবাহের দিনটা এমনি—

—সত্যিই? তপতী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—একটা কথা ব'লবেন? চন্দনা যাবার সময় চোখে রুমাল দিয়ে গেল কেন? মনে হয় যেন কাঁদতে কাঁদতে গেল।

—হয়ত তাই, তবে আনন্দে মানুষ কাঁদে না বড় একটা, এ বোধ হয় জানো।

—তাঁকেও কাঁদাচ্ছেন?

—আর কাকে কাঁদিয়েছি—কেন কাঁদিয়েছি তা কি অনুমান করা যায়?

—আর কে কেঁদেছে তা জেনে আপনার লাভ নেই, তবে তাঁকে কাঁদালেন কেন? আপনি চলে গেলে আমাদের দিন কেমন ভাবে যাবে এই ভেবেই কি আকুল হ'লেন?

—কিছুটা ত হ'য়েছি।

—যদি তাই হয়, তবে এ বাড়িটা কেন ছাড়ছেন?

—এখানে থাকতে হলে একটা দাবী চাই, সে দাবী ত আমার নেই।

—তৈরি করে নিলেই দাবী হবে।

—তা কি হয়! আমি যদি বলি আপনি আমাকে বিয়ে ক'রে এবাড়িতে রাখুন; আপনি কি সে দাবী স্বীকার ক'রে নেবেন? কিন্তু অবাঞ্ছিত হ'য়ে মানুষ চিরদিন কি থাক্‌তে পারে—আশ্রিত হ'য়ে কি বহুদিন থাকা চলে?

মানবেন্দ্র তপতীর দিকে চাহে নাই—বাহিরে অদূরের ত্রিতল বাড়িখানার উপরে যে আকাশখানি ধূসর পাংশু ছিল, তাহা অকস্মাৎ অস্তমিত সূর্যের রক্তিম আলোর সমারোহে সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। মানবেন্দ্র অনৈচ্ছিক দৃষ্টিতে তাহাই দেখিতে দেখিতে চুপ করিয়া গেল। রক্তিম আকাশ ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া আসিল, তাহার ম্লান আভা জানালার ফাঁকে তপতীর গণ্ডে কণ্ঠে আসিয়া পড়িয়াছে—মানবেন্দ্র অকস্মাৎ দেখিল, তপতীর আরক্তিম গণ্ডের উপর দুই ফোঁটা অশ্রু ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে। মানবেন্দ্র কহিল—একি তপতী, তুমি কাঁদছো কেন?

তপতী মুখ লুকাইবার পূর্বেই দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সে জড়িত কণ্ঠে কেবল কহিল—আপনি অবাঞ্ছিত, আপনি জানেন না—তপতীর কণ্ঠ তাহাকে প্রতারণা করিল, সে আর কহিতে পারিল না।

মানবেন্দ্রের পায়ে হঠাৎ যেন খুব বেদনা বাড়িয়াছে এমনি ভাবে পা খানিকে হাত দিয়া টানিয়া সরাইয়া লইয়া কহিল—আমি জানি, কিন্তু না জানাই বোধহয় ভাল ছিল। তোমার এ বাড়ির মোহ আমার একেবারেই থাকতে পারে না তা নয় কিন্তু তার চেয়ে বড় মোহ থাকা উচিত ছিল তোমার পরে, কিন্তু তোমার কেন এই মোহ? পথের মানুষকে ডেকে এনে লাভ নেই, হরিচরণকে ডাকতে গিয়ে তাকে হত্যা ক'রেছ, আমাকে আহত ক'রে তোমার লাভ নেই। নিজেও আহত হ'য়ো না, মানুষের মনের উপর অধিকার নেই জানি কিন্তু মোহ মোহই, সেটা শাশ্বত চিরন্তন নয়। তাকে এখন না হ'লেও পরে ত্যাগ করা যাবে।

তপতী মুখ তুলিয়া কহিল—অর্থ বিত্ত শিক্ষা সব থাকতেও কি আমি নিঃস্ব হবো? শোক মোহ, মোহই মানুষকে মধুর করেছে, মোহই পৃথিবীকে সুন্দর করেছে। সেই মোহ যদি ক্ষণিকের জন্য পৃথিবীকে সুন্দর করে তবে তার মূল্যই যথেষ্ট। তার মূল্য নেই?

—আছে; কিন্তু মোহকে যে মোহ বলে চিনেছে তার পক্ষে পৃথিবীকে সুন্দর করে পাওয়া সম্ভব নয়, ভালবাসা সম্ভব নয়, অর্থ বিত্ত নিয়ে থাকাও সম্ভব নয়। অন্যের অন্তর যে বোঝে সে সত্যিই অত্যন্ত অ-মানব। ভুল বোঝা, ভুলের উপর গৃহ নির্মাণ করাই মানবত্ব, তাকে ভেঙে ফেলে দেওয়াও তেমনি তার অঙ্গ। যে অ-মানব তার মানুষের সমাজে থাকা চলে না, এটা তুমি বুঝতে পারবে নিশ্চয়ই।

তপতী দৃঢ় কণ্ঠে কহিল—বুঝতে চাই না, বুঝে লাভ নেই, মানুষের পৃথিবীতে অ-মানব হয়েও লাভ নেই। মানুষরূপেই মানুষের মত ভুল ক'রতে চাই, মানুষের মত দুঃখ পেতে চাই, তার সঙ্গে যদি দু'দিনের আনন্দ আসে, সেই সুদের পাওনা, তাকেই লাভ বলে মনে ক'রবো।

—তা হলে কি জানতে চাও?

—যা জানতে এসেছি তাই জানতে চাই। মণিকাকে নিয়ে দার্জিলিং যাওয়া যদি দাদার পক্ষে প্রয়োজন হয় তবে আজ একথা জানাও আমার প্রয়োজন এবং তারই মত না জেনে উপায় নেই।

—আমাকে সময় দেওয়া উচিত।

—বহুদিনের সময় আপনি নিয়েছেন। আর না নিলেও চলতে পারে।

মানবেন্দ্র হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল—আজকার দিনটাই খারাপ গেল। সকালে চন্দনা এসে কেঁদে গেল, এখন তুমি চোখের জল ফেল্‌লে; আমি কত পাপই করেছিলাম! আরও কি আছে কে জানে।

—আরও অনেকেই ফেল্‌বে, যেমন জগতে বহুলোকই নিত্য ফেলে, কিন্তু আপনি ইচ্ছে ক'রলে নিজেকে সে চোখের জলের অভিশাপ থেকে মুক্ত ক'রতে পারেন এবং আজই তার শেষ হ'তে পারে।

মানবেন্দ্র অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল। ঘরের মাঝে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিয়াছে, সে ধীরে উঠিয়া আলোর সুইসটা টিপিয়া দিল। ঘরখানা পর্যাপ্ত আলোয় সহসা যেন চমকাইয়া উঠিল—তপতীর চোখ দুইটি সে আলোয় রাত্রির শ্বাপদ চক্ষুর মত জ্বলিতেছে। মানবেন্দ্র তাহা লক্ষ্য করিল, তপতী যেমন বসিয়াছিল তেমনি বসিয়া রহিল।

মানবেন্দ্র কহিল—আমাকে একটু সময় দাও। রবিবার সকাল সাড়ে আটটায় একবার এসো, আমি তোমাকে সমস্ত ব'লবো।

তপতী নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল—মানবেন্দ্র ইজিচেয়ারটায় পা এলাইয়া বসিয়া হাতের কাছের একখানা বই টানিয়া লইল, যেন কিছুই হয় নাই।

মানবেন্দ্র পড়িয়াই যাইতেছিল—

অকস্মাৎ পদশব্দে দরজার দিকে চাহিয়া দেখে মিস্ বসু দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি ক্ষুদ্র একটু নমস্কার জানাইয়া ক'হিলেন--আজ ত আদিত্যবাবুর আড্ডায় তেমন জনসমাগম দেখছি না—ব্যাপার কি?

কথাটা মিস্ বসু এমনভাবে বলিলেন, যেন আড্ডাতেই তিনি আসিয়াছেন এবং মানবেন্দ্রের দরজায় আসাটা নেহাৎই হঠাৎ হইয়া গিয়াছে। মানবেন্দ্র হাসিয়া কহিল—আদিত্যবাবুই এখানে নেই, তাঁর আড্ডাটা চলে কার উপর ভর দিয়ে?

—তিনি কোথায়?

দার্জিলিং গেছেন, কয়েকদিনের মাঝেই ফিরে আসবেন। এমনি বেড়াতে গেছেন। আপত্তি না থাক্‌লে এখানে এসেই বস্‌তে পারেন।

মিস্ বসু শ্রীহীন মুখখানাকে স্মিতহাস্যে যথাসম্ভব উজ্জ্বল করিয়া কহিলেন—আপত্তি থাকবে কেন?

মানবেন্দ্র পরিহাস করিল—থাক্‌তে ত পারে। কাল ছিল না বলে আজ থাকবে না এমন ত নাও হ'তে পারে। যদি না থাকে তবে বসুন।

মিস্ বসু পাশের চেয়ারখানায় বসিয়া কহিলেন—ভাল। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সেদিন বলেছিলেন, যখন মানুষের প্রয়োজন হয় তখন সে অকুণ্ঠভাবে আপনাকে ব্যক্ত করে, মানুষের জীবনে এমন সময় কি সত্যিই আসে?

—এটা আমার মুখে শুনে কি বিশ্বাস ক'রবেন? যেদিন নিজেকে ব্যক্ত ক'রবেন বা আপনার নিকটে কেউ নিজেকে ব্যক্ত ক'রবে সেইদিনই বিশ্বাস ক'রবেন নইলে কিছুতেই নয়।

—কিন্তু আমি ত ব্যক্ত ক'রতে পারি না, বার বার যেন মনের কথাটাকে কণ্ঠ ফিরিয়ে দেয়।

—তার অর্থ মনের কথাটার প্রকাশের সময় এখনও হয় নি—যখন হবে তখন কণ্ঠের পক্ষে তাকে প্রত্যাখ্যান করা আর সম্ভব হবে না।

মানবেন্দ্র আপন মনেই হাসিল।

মিস্ বসু প্রশ্ন করিলেন—আপনি হাসলেন যে!

—হাসলাম কেন? ব'ললে দুঃখিত হবেন হয়ত, আপনি আদিত্যবাবুর আড্ডায় অন্তত আজ আসেন নি, আর যা এতদিন ব্যক্ত ক'রতে পারেন নি আজ তাই ব্যক্ত ক'রতে এসেছেন। তবুও শিক্ষার তথা শিক্ষাভিমানের চাকচিক্য শেষবার চেষ্টা ক'রছে যে আমার মুখ দিয়ে আপনার মনের কথাটা প্রকাশ করা যায় কিনা?

মিস্ বসু ব্যথিত কণ্ঠে কহিলেন—শিক্ষাভিমানের খোঁচাটা নিত্যই একবার ক'রে দিতে হবে এমন কোন পাপ করি নি বোধ হয়। আর সে অভিমান যদি হ'য়েই থাকে তবে তা শিক্ষার দোষ, সমাজের দোষ—আমি তার ফলস্বরূপ।

—কেন? আপনি কি ব'ল্‌তে চান আপনার মাঝে সে শিক্ষাভিমান তথা আত্মাভিমান নেই?

মিস্ বসু উত্তেজিত ভাবে কহিলেন—এতদিন ছিল, আজ নেই।

—কেন?

—আপনার কাছে এসে সব ভেঙেছে, নইলে আপনার কাছে সমস্ত লজ্জার

বাধা ভেঙে যা বলেছি তা ব'লতে পারতুম না, আর আপনি তারই সুযোগ নিয়ে আমাকে বারবার বিড়ম্বিত ক'রছেন।

মানবেন্দ্র হাসিতে চেষ্টা করিয়া কহিল—কেন? আপনি ত কিছুই বলেন নি যার সুযোগ নিয়ে আপনাকে লাঞ্ছিত করা সম্ভব।

—যা বলেছি, তার বেশি আর কি মানুষ বল্‌তে পারে—আপনার মাঝে আমার মনের আকাঙ্ক্ষাকে পেতে চাই—এই সংবাদটা সংগ্রহ করার পর থেকেই যেন আপনার অনাগ্রহ এবং ঔদাসীন্যটা বেড়ে চলেছে।

—হ্যাঁ, আপনার কাছে এমন মনে হ'তে পারে বটে। পথের মানুষের কাছে আমরা যা চাই আপনার জনের কাছে তার চেয়ে অনেক বেশি চাই, তাই তার ঔদাসীন্যটাই বড় হ'য়ে ওঠে আর পথের মানুষের ক্ষুদ্র করুণাই বৃহত্তর হ'য়ে থাকে। আমার অনাগ্রহটা বোধ হয় সেই জন্যেই বড় হ'য়ে উঠেছে আপনার কাছে—আগ্রহটা ছোট হ'য়ে বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে—যদি তাই হয়, তবে আপনার কাছে ত তা অজানা নয়, কিন্তু তবুও আপনি—

মিস্ বসু চুপ করিয়া গেলেন—ইহার পরে যেন আর কিছু বলা যায় না। এ অভিযোগ প্রকাশ করিবার চেয়ে না করাটাই শোভন।

ক্ষণিক চুপ করিয়া থাকিয়া মিস্ বসু আবার বলিলেন—সত্যিই মিসেস্ সেনের পরাধীন স্বাধীন জীবনটা যেন পদে পদে আমাকে ব্যঙ্গ করে। ডাঃ সেনের স্তুতি আমার গায়ে কাঁটার মত বেঁধে—কিন্তু আপনি কি কোন আশ্রয় দিতে পারেন না?

মানবেন্দ্র একটু হাসিয়া কহিল—যে নিজেই নিরাশ্রয় সে আপনাকে কেমন করে আশ্রয় দেবে বলুন—মিসেস্ সেনের নিশ্চিন্ততা স্বাধীনতা দেওয়া ত আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ আমার উপজীবিকা শিক্ষা। আমাকে আশ্রয় নিতে হবে—আমি হবো আশ্রিত আর আপনি হবেন আশ্রয়দাত্রী। সেখানে ঐ নিশ্চিন্ততা গড়ে উঠবে না।

—আর্থিক বা বাহ্যিক জগতে না হয় নাই হ'ল, মনের জগতে কি সে নিশ্চিন্ততা মিল্‌বে না?

—সেটা আরও অসম্ভব। ডাঃ হালদার যেমন করে তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করেছেন, আপনিও তেমন করে আশ্রিতকে হত্যা ক'রবেন। যখন যে অবস্থায় তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারতেন, সে অবস্থা, সে মন আর বেঁচে নেই। নিজের

বঞ্চিত জীবনের বোঝা অন্যের মাথায় চাপানো চলে না—তাতে আপনার কষ্টের লাঘব হবে না—মাঝের থেকে বোঝাটা তার জীবন সংশয় ক'রে ছাড়বে। যেমন ঘোড়ার সওয়ার মাথায় বোঝা চাপালে তার বোঝা বওয়াই সার হয়, ঘোড়ার ভারের কোন লাঘব হয় না।

—তবুও এর কি কোন প্রতিকার নেই?

—সাধারণত নেই। মানুষের মন যখন স্বভাবের পথ ছেড়ে একবার অস্বাভাবিক পথ গ্রহণ করে তখন ফিরে আসবার পথ প্রায়ই বন্ধ হয়ে যায়। আমরা যাকে শিক্ষা ও সভ্যতা বলি সেটা আর কিছুই নয় মানুষের স্বভাবসুলভ বন্য-প্রকৃতিকে রুদ্ধ ক'রে তাকে অস্বাভাবিক ক'রে সমাজের মত করে তোলা। সেখানে রুচি, সংস্কার, শিক্ষা তা'র মনকে পঙ্গু ক'রে জীবনকে অস্বাভাবিক ক'রে তোলে। মন রুগ্ন, তার উপরে রাজত্ব করে শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি—কাজেই পৃথিবীকে আমরা দেখি রোগীর চোখে, যা বলি তা হয় স্বভাবত প্রলাপ—যা বাস্তবের কথা নয়, যা কল্পনার কথা মাত্র। প্রলাপের দুর্লভ বস্তুকে পেলে কি জ্বরের বা রোগের প্রকোপ কমে?

—জীবনই যদি প্রলাপ হয় তবে তাতেই বা ক্ষতি কি? প্রলাপলব্ধ বস্তু ক্ষণিকের শান্তি তৃপ্তি ত দেবে, না হয় রোগীর ব্যাধি নাই কমলো। মানুষ মানুষকে বেদনা দেয়, ব্যঙ্গ করে, তাকে বোঝে না এর চেয়ে গভীর দুঃখের আর কি আছে?

—এইটাই চিরন্তন সত্য, মানুষ মানুষ ছাড়া আর সবকে কিছু কিছু বোঝে। আর মানুষকে সে বোঝে না সে মানুষ বলেই—যন্ত্র হ'লে হয়ত বুঝতো। মানুষ মানুষকে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়ার রঙীন কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখে, তাই সর্বদাই ভুল দেখে। মানুষ যখন কাছে আসে তখন রঙীন কাঁচের ব্যবধান দূর হ'য়ে যায়, তাই মানুষের চেহারা বদলে যায়, আমরা চমকে উঠি।

মিস্ বসু অধৈর্য হইয়া কহিলেন—চমকে যদি উঠতেই হয় তাতে দুঃখ নেই, সারাজীবন না হয় রঙীন কাঁচ দিয়ে নাই দেখলাম। খাঁটি মানুষকেই একবার না হয় দেখি।

—সে কি আমাকেই দেখতে চান?

—হ্যাঁ। রঙীন কাঁচের মধ্যে যাকে দেখেছি, তাকে কাছে পেয়ে দেখতে চাই।

মানবেন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—রবিবার সাড়ে আটটায় আসবেন, জবাব পাবেন। আমি জানি, আমার জবাবদিহি ক'রবার সময় এসেছে।

রবিবার।

সাড়ে আটটা।

তপতী নীচে নামিয়া আসিতেছিল—দূর হইতে সে লক্ষ্য করিয়াছে মানবেন্দ্রের ঘরের দরজা উন্মুক্ত। কিছুদূর নামিয়া আসিতেই দেখে মিস্ বসু আসিতেছেন, সে একটু অপ্রসন্ন ভাবেই কহিল—নমস্কার।

—নমস্কার। মানবেন্দ্রবাবুর চা-পান হ'য়েছে নিশ্চয়ই।

—হ্যাঁ, এতক্ষণে হবার কথা। আপনার কুশল ত? হঠাৎ এত সকালে?

—একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, রবিবার, তাই ভাবলুম একটু আড্ডা দিয়ে ফিরি।

—ও, তা বেশ, আসুন।

একখানা মোটর প্রাঙ্গণে আসিয়া থামিল। মোটর দেখিয়াই তপতী চিনিল, এ চন্দনার গাড়ি। চন্দনা বাহির হইয়া আসিয়া নমস্কার জানাইয়া কহিল—ও আপনাদেরও ত রবিবারই। বেশ হ'ল আড্ডাটা জমবে মন্দ নয়—চলুন মানবেন্দ্রবাবুর ওখানে।

তিনজনে একসঙ্গে মানবেন্দ্রের ঘরে প্রবেশ করিয়া অবাক হইয়া গেল—ঘরখানি ধূলা, ছেঁড়া কাগজ, বইএর ছেঁড়া মলাটের আবর্জনায় অপরিচ্ছন্ন। ঘরে মানবেন্দ্র নাই—তাহার পুস্তক ও অন্যান্য দ্রব্যের কিছুই নাই। বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে মানবেন্দ্র বিদায় লইয়াছে—এবং সেটা সম্ভবত চিরদিনের মতই।

তিনজনে পরস্পর মুখের দিকে চাহিয়া নির্বাক হইয়া গিয়াছিল এবং কি বলিবে কি করিবে তাহাই ভাবিতেছিল—অকস্মাৎ টেবিলের উপর একখানা কাগজের দিকে তাহাদের দৃষ্টি পড়িল। সেখানা সম্ভবত মানবেন্দ্রের শেষ বক্তব্য। তপতী সেখানাকে তুলিয়া লইয়া দেখিল, চিঠি তাহাদেরই উদ্দেশ্যে। সে লিখিয়াছে—

তপতী,

তুমি আমাকে ভালবেসেছিলে আমি খোঁড়া বলে কিন্তু আমি সত্যিই খোঁড়া নই, আর খোঁড়া বলেই যদি কেউ কাউকে ভালবাসে তবে জেনেশুনে সেটাকে ভালবাসা বলে গ্রহণ করা চলে না। কাজেই আমাকে যেতে হ'ল। অপরাধ ত্রুটি যা কিছু ক'রেছি তা মার্জনা ক'রে নিও। দুদিন পরে দেখবে মোহটা চিরস্থায়ী নয়, কাজেই পরিতাপের কিছু নেই। আমার থাকা চলে না বলেই যেতে হ'ল— নতুন করে আশ্রয় সংগ্রহ ক'রতে হবে।

মিস্ বসু,

আপনার খুঁড়িয়ে চলা জীবনপথে যষ্টির কাজ ক'রতে পারলাম না বলে দুঃখ করতে পারি। আপনি আমাকে চান নি, চেয়েছেন এমন একজনকে যাকে আপনি নির্ভর বলে গ্রহণ ক'রতে পারেন। আপনাকে নির্ভরতা দিতে পারি এমন শক্তি আমার নেই, তা ছাড়াও—আমার চেয়ে আমার উপর নির্ভরতার মূল্য যখন বেশি তখন আমাকে যেতেই হবে। জগৎটাকে রঙীন কাঁচের মাঝে দিয়ে দেখি নি বলেই, মানুষকে চিনি। যার আশা-আকাঙ্ক্ষার রঙীন কাঁচ হারিয়ে গেছে, সে কেমন ক'রে ভালবাসবে? অতএব নমস্কার—আমার পলায়নকে ক্ষমা করবেন।

চন্দনা,

তুমি আমাকে চাও নি, চেয়েছিলে নিজের অভিযান-স্পৃহাকে পূর্ণ করতে। বনের বাঘকে আদিত্যবাবুর মত খাঁচায় পুরে দেখতে চেয়েছিলে, তাকে নিয়ে খেলা দেখিয়ে দর্শকের হাততালি চেয়েছিলে। তাতে তোমার কৃতিত্ব যতই থাক, বাঘের বাঘত্ব থাকে না। বাঘের পরাজয়কে লোকে তারিফ করে না, করে খেলোয়াড়ের বাঘত্ব নষ্ট করার শক্তিকে। বাঘ যদি খাঁচায় না থাকে তবে তাকে অবাধ্য বলা চলে কিন্তু তিরস্কার করা চলে না।

তুমি পৃথিবীর বৃক্ষচূড়া ছেড়ে আকাশে উড়ন্ত; আমি পৃথিবীর মানুষ, আমার পক্ষে তোমার সঙ্গে ওড়া সম্ভব নয়। তাই ক্ষান্ত দিয়ে ডানা বন্ধ করে পৃথিবীর উপরেই রইলাম। মহানভঃ অঙ্গন পরিক্রমা ক'রে ক্লান্ত ডানা নিয়ে যেদিন ফিরে আসবে বৃক্ষচূড়ায় সেদিন আবার দেখা হবে।

মিস্ বসু গৃহের বাহিরে আসিয়া মনে মনে কহিলেন—এই ত পুরুষমানুষ! এরা ত পৃথিবীতে এসেছে কেবল পীড়ন ক'রতে, তাদের ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কার দিয়ে অসম্মান ক'রতে···তিনি কোনদিকে না চাহিয়া দ্রুত রাস্তায় আসিয়া নামিলেন।

চন্দনা চঞ্চল পদক্ষেপে মোটরে উঠিয়া নিজেই মোটর চালাইয়া দিল, মনে মনে কহিল—এই মহানন্তঃ অঙ্গন পরিক্রমাই ক'রতে হবে যতদিন না ডানা ক্লান্ত হয়—বাঘকে খাঁচায় পুরে দেখার মত দুঃসাহসিক কাণ্ডের মাঝেও একটা মোহ আছে। সে দ্রুত মোটর চালাইয়া দিল।

তপতী চিঠির টুকরা কা'গজখানি হাতে করিয়া বসিয়া রহিল—যেন পৃথিবীর যাহা কিছু সব আজ নিঃশেষে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, সে তাহার ভস্মস্তূপের উপর বসিয়া আছে—একান্ত একাকী। ঘরের আবর্জনা ও শূন্যতার দিকে চাহিয়া তাহার চোখ দুইটি জলে ভরিয়া আসিল—মানবেন্দ্র সত্যই চলিয়া গিয়াছে।

বাহিরের পানে চাহিয়া দেখে দ্বিতলের ঝুলবারান্দায় রেণুকাও তাহারই মত অশ্রুসজল দৃষ্টিতে দূরের পানে চাহিয়া আছে।

সমাপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬